সৈয়দ মুজতবা আলী

শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা

সৈয়দ মুজতবা আলী

মিত্র ও ঘোষ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

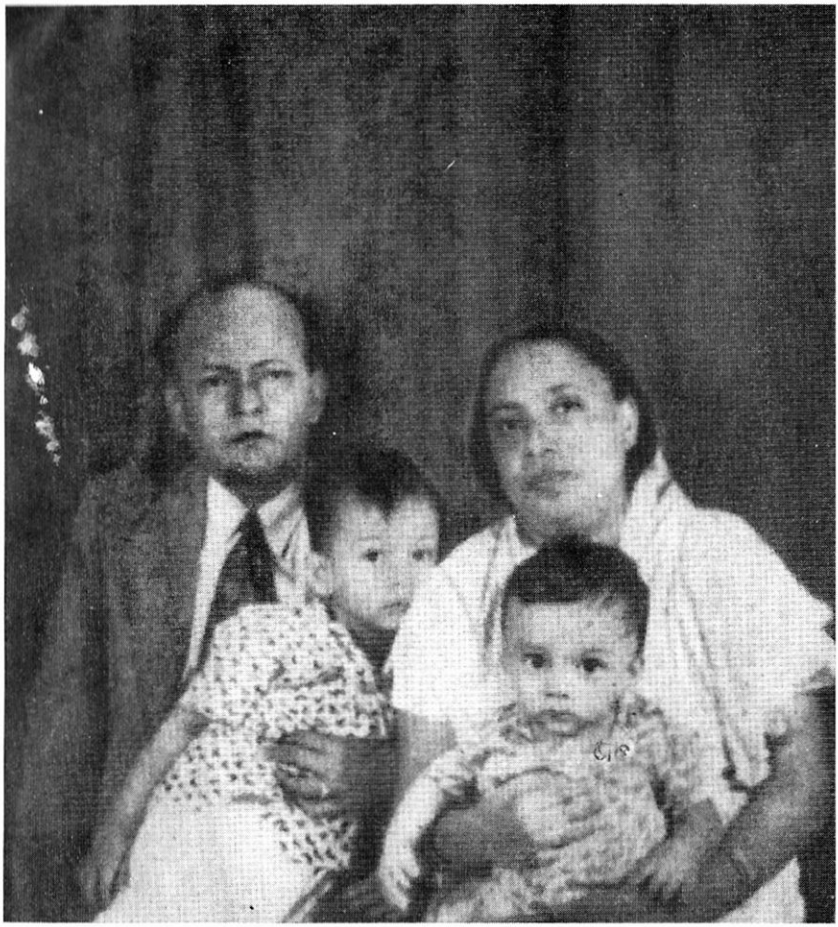

সৈয়দ মুজতবা আলী, স্ত্রী ও দুই পুত্রসহ

সৈয়দ মুজতবা আলী

শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা

সূচি

রবি-পুরাণ—৩

পুষ্পধনু—৭

ফুটবল—৯

'নেভা'র রাধা—১২

কই সে?—১৫

আহারাদি—২৩

সুখী হবার পন্থা—২৬

প্রিন্স গ্রাবিয়েলে দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো—৩০

নস্‌রুদ্দীন্ খোজা (হোকা)—৩৪

তোতা কাহিনী—৪৪

রম্য কবিতা—৪৬

বইকেনা—৫১

চার্লি চ্যাপলিন—৫৬

সিনিয়র-মোস্ট এপ্রেন্‌টিস্—৬১

বড়দিন—৬৩

শমীম—৬৬

কালো মেয়ে—৬৮

দাম্পত্য জীবন—৭০

গাঁজা—৭৩

অনুকরণ না হনুকরণ?—৮১

কিসের সন্ধানে?—৮৬

চরিত্র পরিচয়—৯২

'বাঁশবনে—'—৯৪

বেদে—৯৯

ধূপছায়া—১০২

রসগোল্লা—১০৪

নেকি—১১২

আর্ট না অ্যাক্‌সিডেন্ট—১১৪

কাইরো—১১৮

আড্ডা—১২১

ইঙ্গ-ভারতীয় কথোপকথন—১৩১

বেজো না চরণে চরণে—১৩৪

খোশগল্প—১৩৮

নিরলঙ্কার—১৪৪

সম্পাদক লেখক পাঠক—১৫৩

"ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার সম্মুখে
ঘন আঁধার—"—১৫৯

মৃত্যু—১৬৪

শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা

রবি-পুরাণ

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্রচুর বক্তৃতা, প্রচুরতর প্রবন্ধ এবং অল্প-বিস্তর বেতার কার্যকলাপের ব্যবস্থা এদেশের গুণী-জ্ঞানীরা করে থাকেন। সেই অবসরে কেউ কেউ আমাকেও স্মরণ করেন। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে এঁরা আমার কল্যাণ কামনা করেন; সরল জনের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে এই করে হয়তো দেশে আমার নামটা কিঞ্চিৎ ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু আসলে যাঁরা আমাকে স্মরণ করেন তাঁরা আমার প্রাণের বৈরী। এঁরা আমাকে সর্বজনসমক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতে চান, 'দেখো, এ লোকটা কতবড় গণ্ডমূর্খ; কবিগুরুর সংস্পর্শে এসেও এর কিছু হল না। সাধে কি আর তুলসীদাস রামচরিতমানসে বলেছেন,

"মুরখ হৃদয় ন চেৎ যদপি মিলয়ে
গুরু বিরিঞ্চি শত"
"শত ব্রহ্মা গুরুপদ নিলেও মূর্খের
হৃদয়ে চেতনা হয় না"

আমি মূর্খ হতে পারি কিন্তু এতখানি মূর্খ নই যে তাঁদের দুষ্টুবুদ্ধিজাত নষ্টামির চিন্তা ধরতে পারবো না।

তাই ঐ সময়টায় আমি গা-ঢাকা দিয়ে থাকি। নিতান্ত কারো সঙ্গে দেখা হলে বলি, এন্‌জাইনা থ্রম্‌বোসিস হয়েছে। এন্‌জাইনা পিক্‌টরিস কিংবা করোনারি থ্রম্‌বোসিস-এর যে-কোনো একটার নাম শুনলেই সুস্থ মানুষের হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম করে—আমার ঐ দ্বন্দ্ব সমাস শুনে আমাকে তখন আর কেউ বড় একটা ঘাঁটায় না।

অথচ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলবার সাধ যে আমার হয় না, তাও নয়। অবশ্য তাঁর কাব্য, নাট্য কিম্বা জীবনদর্শন সম্বন্ধে নয়। অতখানি কাণ্ডজ্ঞান বা কমনসেন্‌স্ আমার আছে। আমার বলতে ইচ্ছে করে সেই জিনিস, ইংরিজিতে যাকে বলে লাইটার সাইড। এই যেমন মনে করুন, তিনি গল্পগুজোব করতে ভালোবাসতেন কি না, প্রিয়জনের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করতেন কি না, ডাইনিঙরুমে বসে চেয়ার টেবিলে ছুরিকাঁটা দিয়ে ছিমছাম ভাবে সায়েবি কায়দায় খেতেন, না রান্নাঘরের বারান্দায় হাপুস-হুপুস শব্দে মাদ্রাজী স্টাইলে পাড়া সচকিত করে পর্বটি সমাধান করে সর্বশেষে কাবুলী কায়দায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঢেকুর তুলতে তুলতে বাঙালী কায়দায় চটি ফটফটিয়ে খড়কের সন্ধানে বেরতেন? কেউ তাঁকে প্রেমপত্র লিখলে তিনি কি করতেন? কিম্বা ডিহি শ্রীরামপুর দুই নম্বর বাই লেন তাদের কম্বল-বিতরণী সভায়

তাঁকে প্রধান অতিথি করার জন্য ঝুলোঝুলি লাগালে তিনি সেটা এড়াবার জন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতেন? কিম্বা কেউ টাকা ধার চাইলে?

ভালোই হ'ল টাকা ধারের কথা মনে পড়ল।

'দেহলী'র উপরে থাকতেন তিনি, নিচের তলায় তাঁর নাতী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওরফে দিনুবাবু।

তাঁরই বারান্দায় বসে আশ-কথা পাশ-কথা নানা কথা হচ্ছে। হতে হতে টাকা ধার নেওয়ার কথা উঠলো। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ বললেন, বুঝলি দিনু আমার কাছ থেকে একবার একজন লোক দশটাকা ধার নেয়ে গদগদ কণ্ঠে বললে, "আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলুম"। সভায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা পয়েন্টটা ঠিক কি বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলেন। আফ্‌টার অল্ গুরুদেবের পক্ষেও কালে-কস্মিনে কাঁচা রসিকতা করা অসম্ভব নাও হতে পারে।

খানিকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গুরুদেব বললেন, 'লোকটার শতদোষ থাকলেও একটা গুণ ছিল। লোকটা সত্যভাষী। কথা ঠিক রেখেছিল। চিরঋণী হয়েই রইল।'

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্র রায় ইত্যাদি মুরব্বিরা অট্টহাস্য করেছিলেন। আমরা, অর্থাৎ চ্যাংড়ারা, থামের আড়ালে ফিক্‌ফিক্ করেছিলুম।

এ গল্পটি আমি একাধিক লোকের মারফৎ পরেও শুনেছি। হয়তো তিনি গল্পটি একাধিক সভা-মজলিসে বলেছেন। এবং গল্পটি আদৌ তাঁর নিজের বানানো না অন্যের কাছ থেকে নেওয়া সে-কথাও হলফ করে বলতে পারবো না। কারণ কাব্যানুশাসনের টীকা লিখতে গিয়ে আলঙ্কারিক হেমচন্দ্র বলেছেন, 'নাস্ত্য চৌরঃ কবিজনঃ নাস্ত্য চৌরো বণিক্‌জনঃ—অর্থাৎ 'বড় বিদ্যা'টি বিলক্ষণ রপ্ত আছে স্যাকরার এবং কবি মাত্রেই।

তা হক। মহাকবি হাইনরিষ্ হাইনে তাতে কণামাত্র আপত্তি না তুলে বলেছেন, 'যারা কবির রচনাতে 'নির্ভেজাল' অরিজিনালিটি খোঁজে তারা চিবাক মাকড়ের জাল, কারণ একমাত্র মাকড়ই তার জালটি তৈরি করে আপন পেটের মাল দিয়ে, ষোল আনা অরিজিনাল, আমি কিন্তু খেতে ভালোবাসি মধু, যদিও বেশ ভালোভাবেই জানি মধুভাণ্ডের প্রতিটি ফোঁটা ফুলের কাছ থেকে চোরাই করা মাল।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পের ভিতর আমার সবচেয়ে ভালো লাগে 'গুরুদেব-ভাণ্ডারে' কাহিনী। অবশ্য আমার মনে হয়, গল্পটির নাম 'ভাণ্ডারে-গুরুদেব' কাহিনী দিলে ভালো হয়, কারণ কাহিনীটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, ভাণ্ডারের একটি সৎকর্মের উপর। তুলনা দিয়ে বলতে পারি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু যখন তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জগজ্জন সম্মুখে প্রকাশ করলেন তখন কালা আদমির কেরদানী বরদাস্ত না করতে পেরে ইংরেজ আবিষ্কারটার নামকরণ করলে 'আইনস্টাইন-বোস

থিয়রি'। স্বয়ং আইনস্টাইন তখন নাকি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন ওটার নাম হবে শুধুমাত্র 'বোস থিয়রি' নয় হবে 'বোস-আইনস্টাইন থিয়রি'। এ-সব অবশ্য আমার শোনা কথা। ভুল হলে পুজোর বাজারের বিলাস বলে ধরে নেবেন।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ইংরেজ পছন্দ করতো না বলে শান্তিনিকেতন আশ্রমটিকে নষ্ট করার জন্য ইংরেজ একটি সূক্ষ্ম গুজোব বাজারে ছড়ায়—শান্তিনিকেতনের ইস্কুল আসলে রিফরমেটরি। অন্তত এই আমার বিশ্বাস।

খুব সম্ভব তারই ফলে আশ্রমে মারাঠি ছেলে ভাণ্ডারের উদয়।

ইস্কুলের মধ্য-বিভাগে বীথিকা-ঘরে ভাণ্ডারে সীট পেল। এ ঘরটি এখন আর নেই তবে ভিতটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তারই সমুখ দিয়ে গেছে শালবীথি। তারই এক প্রান্তে লাইব্রেরি, অন্য প্রান্তে দেহলী। গুরুদেব তখন থাকতেন দেহলীতে।

দেহলী থেকে বেরিয়ে শালবীথি হয়ে গুরুদেব চলেছেন লাইব্রেরির দিকে। পরনে লম্বা জোব্বা, মাথায় কালো টুপি। ভাণ্ডারে দেখামাত্রই ছুটলো তাঁর দিকে। আর সব ছেলেরা অবাক। ছোকরা আশ্রমে এসেছে দশ মিনিট হয় কি না হয়। এরই মধ্যে কাউকে কিছু ভালোমন্দ না শুধিয়ে ছুটলো গুরুদেবের দিকে।

আড়াল থেকে সবাই দেখল ভাণ্ডারে গুরুদেবকে কি যেন একটা বললে। গুরুদেব মৃদুহাস্য করলেন। মনে হল যেন অল্প অল্প আপত্তি জানাচ্ছেন। ভাণ্ডারে চাপ দিচ্ছে। শেষটায় ভাণ্ডারে গুরুদেবের হাতে কি একটা গুঁজে দিলে। গুরুদেব আবার মৃদুহাস্য করে জোব্বার নিচে হাত চালিয়ে ভিতরের জেবে সেটি রেখে দিলেন। ভাণ্ডারে এক গাল হেসে ডরমিটরিতে ফিরে এল। প্রণাম না, নমস্কার পর্যন্ত না।

সবাই শুধালো, গুরুদেবকে কি দিলি?

ভাণ্ডারে তার মারাঠি-হিন্দিতে বললে, 'গুরুদেব কৌন্? ওহ্ তো দরবেশ হৈ।'

'বলিস কিরে, ও তো গুরুদেব হায়।'

'ক্যা "গুরুদেব" "গুরুদেব" করতা হৈ। হম উসকো এক অঠন্নী দিয়া।'

বলে কি? মাথা খারাপ না বদ্ধ পাগল? গুরুদেবকে আধুলি দিয়েছে।

জিজ্ঞেসবাদ করে জানা গেল, দেশ ছাড়ার সময় ভাণ্ডারের ঠাকুরমা তাকে নাকি উপদেশ দিয়েছেন, সন্ন্যাসী দরবেশকে দানদক্ষিণা করতে। ভাণ্ডারে তাঁরই কথামত দরবেশকে একটি আধুলি দিয়েছে। তবে, হ্যাঁ, দরবেশ বাবাজী প্রথমটায় একটু আপত্তি জানিয়েছিল বটে কিন্তু ভাণ্ডারে চালাক ছেলে, সহজে দমে না, চালাকি নয়, বাবা, একটি পুরী অঠন্নী!

চল্লিশ বছরের কথা। অঠন্নী সামান্য পয়সা, এ-কথা কেউ বলেনি। কিন্তু ভাণ্ডারেকে এটা কিছুতেই বোঝানো গেল না যে তার দানের পাত্র দরবেশ নয়, স্বয়ং গুরুদেব।

ভাণ্ডারের ভুল ভাঙতে কতদিন লেগেছিল আশ্রম পুরাণ এ-বিষয়ে নীরব। কিন্তু

সেটা এ-স্থলে অবান্তর।

ইতিমধ্যে ভাণ্ডারে তার স্বরূপ প্রকাশ করছে। ছেলেরা অস্থির, মাস্টাররা জ্বালাতন, চতুর্দিকে পরিত্রাহি আর্তরব।

হেড মাস্টার জগদানন্দবাবু এককালে রবীন্দ্রনাথের জমিদারী-সেরেস্তায় কাজ করেছিলেন। লেঠেল ঠ্যাঙানো ছিল তাঁর প্রধান কর্ম। তিনি পর্যন্ত এই দুঁদে ছেলের সামনে হার মেনে গুরুদেবকে জানালেন।

আশ্রম-স্মৃতি বলেন, গুরুদেব ভাণ্ডারেকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে ভাণ্ডারে, এ কি কথা শুনি?'

ভাণ্ডারে চুপ।

গুরুদেব নাকি কাতর নয়নে বললেন, 'হ্যাঁরে ভাণ্ডারে, শেষ পর্যন্ত তুই এসব আরম্ভ করলি? তোর মত ভালো ছেলে আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। আর তুই এখন আরম্ভ করলি এমন সব জিনিস যার জন্য সক্কলের সামনে আমাকে মাথা নিচু করতে হচ্ছে! মনে আছে, তুই যখন প্রথম এলি তখন কি রকম ভালো ছেলে ছিলি? মনে নেই, তুই দান-খয়রাত পর্যন্ত করতিস? আমাকে পর্যন্ত তুই একটি পুরো আধুলি দিয়েছিলি। আজ পর্যন্ত কত ছাত্র এল গেল কেউ আমাকে একটি পয়সা পর্যন্ত দেয় নি। সেই আধুলিটি আমি কত যত্নে তুলে রেখেছি। দেখবি?'

* * *

তার দু' এক বৎসরের পর আমি শান্তিনিকেতনে আসি। মারাঠি সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গীয় ভীমরাও শাস্ত্রী তখন সকালবেলার বৈতালিক লীড করতেন। তার কিছুদিন পর শ্রীযুক্ত অনাদি দস্তিদার। তার পর ভাণ্ডারে।

চল্লিশ বছর হয়ে গিয়েছে। এখনো যেন দেখতে পাই ছোকরা ভাণ্ডারে বৈতালিক গাইছে,

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার।
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার॥

পুষ্পধনু

রস কি?

অর্থাৎ যখন কোনো উত্তম ছবি দেখি, কিম্বা সরেস সঙ্গীত শুনি অথবা ভালো কবিতা পড়ি, কিম্বা নটরাজের মূর্তি দেখি, তখন যে রসানুভূতি হয় সে রস কি, এবং সৃষ্টি হয় কি প্রকারে?

এ রসের কাছাকাছি একাধিক রস আছে। গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে ধাঁধার উত্তর বের করে, মনোরম সূর্যোদয় দেখে, প্রিয়াকে আলিঙ্গন করে যে সব রসের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে যে পূর্বোল্লিখিত রসের কোনোই মিল নেই সে কথা জোর করে বলা চলে না। এমন কি—শোনা কথা—বার্ট্রান্ড রাস্‌ল্‌ নাকি বলেছেন গণিতের কঠিন সমস্যা সমাধান করে তিনি যে আনন্দ অনুভব করেন সেটি হুবহু কলারসের মতই। কিন্তু এ-সব রসে এবং অন্যান্য রসে পার্থক্য কি সে আলোচনায় এবেলা মেতে উঠলে ওপারে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমার জ্ঞানও অতিশয় সীমাবদ্ধ, প্রকাশশক্তি ততোধিক সীমাবদ্ধ। (তা হলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, আমি আদৌ লিখতে যাচ্ছি কেন? উত্তরে সবিনয় নিবেদন, বহুদিন সাহিত্য রচনা করার ফলে আমার একটি নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী জমায়েৎ হয়েছেন; এঁদের কেউই পণ্ডিত নন—আমিও নই—অথচ মাঝে মধ্যে এঁরা কঠিন বস্তুও সহজে বুঝে নিতে চান এবং সে কর্ম আমার মত বে-পেশাদারী—নন-প্রফেশনালই—করতে পারে ভালো। রচনার গোড়াতেই এতখানি ব্যক্তিগত সাফাই হয়তো ঠিক মানানসই হল না তবু পণ্ডিতজন পাছে আমার উপর অহমিকা দোষ আরোপণ করেন তাই সভয়ে একটি কথা কইতে হল)।

রস কি, সে আলোচনা অল্প লোকই করে থাকেন। আলঙ্কারিকের অভাব প্রায় সর্বত্রই। কারণ রসের প্রধান কার্যকারণ আলোচনা করতে হলে অন্ততঃ দুটি জিনিসের প্রয়োজন। একদিক দিয়ে রসবোধ, অন্যদিক দিয়ে রসকষহীন বিচার বিবেচনা যুক্তিতর্ক করার ক্ষমতা। তাই এর ভিতর একটা দ্বন্দ্ব লুকনো রয়েছে। যারা রসগ্রহণে তৎপর তারা তর্কের কিচিরমিচির পছন্দ করে না, আর যারা সর্বক্ষণ তর্ক করতে ভালোবাসে তারা যে 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে' হয়ে রসিকজনের ভীতির সঞ্চার করে সে তো জানা কথা।

সৌভাগ্যক্রমে এদেশে কিন্তু কখনো আলঙ্কারিকের অনটন হয় নি। ভরত থেকে আরম্ভ করে দণ্ডিন মম্মট ভামহ হেমচন্দ্র অভিনব গুপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তহীন নির্ঘণ্ট বিশ্বজনের প্রচুর সৃষ্টি করেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি, তাঁকে যখন রাস্‌ল্‌ প্রশ্ন শোধান, রস কি, হোয়াট্‌ ইজ আর্ট, তখন তিনি এঁদের স্মরণে রাস্‌ল্‌কে

প্রচুর নূতন তত্ত্ব শোনান। অন্য লোকের মুখে শুনেছি রাস্‌ল্‌ রীতিমত হকচকিয়ে যান।

বিদেশী আলঙ্কারিকদের ভিতর জর্মন কবি হাইনরিষ হাইনের নাম কেউ বড়ো একটা করে না। কারণ তিনি অমিশ্র অলঙ্কার নিয়ে আলোচনা করেন নি। জর্মন কবিদের নিয়ে আলোচনা করার সময় মাঝে মাঝে রস কি তাই নিয়ে তিনি চিন্তা করেছেন এবং রস কি তার সংজ্ঞা না দিয়ে তুলনার মারফৎ, গল্পছলে সব কিছু অতি মনোরম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে-রকম কোনো কিছু বলতে গেলে সংজ্ঞা নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি না করে গল্প বলে জিনিসটা সরল করে দিতেন অনেকটা সেইরকম।

বাগদাদের শাহ্‌ইন-শাহ্‌ দীনদুনিয়ার মালিক খলীফা হারুন-অল-রশীদের হারেমের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী, খলিফার জিগরের টুকরো, চোখের রোশনী রাজকুমারীটি ছিলেন 'স্বপ্নচারিণী', অর্থাৎ ঘুমের ঘোরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতেন!

গভীর নিশীথে একদা তিনি নিদ্রার আবেশে মৃদু পদসঞ্চারণে চলে গিয়েছেন প্রাসাদ উদ্যানে। সখীরা গেছেন পিছনে। রাজকুমারী নিদ্রার ঘোরে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে সম্পূর্ণ মোহাবস্থায় ফুল আর লতাপাতা কুড়োতে আরম্ভ করলেন আর মোহাবস্থায়ই সেগুলো অপূর্ব সমাবেশে সাজিয়ে বানালেন একটি তোড়া আর সে সামঞ্জস্যে প্রকাশিত হয়ে গেল একটি নবীন বাণী, নূতন ভাষা। মোহাবস্থায়ই রাজকুমারী তোড়াটি পালঙ্কের সিথানে রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙতে রাজকুমারী দেখেন একটি তোড়া যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। সখীরা বললেন, ইটি তাঁরই হাতে তৈরী। কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস হয় না। এমন কি ফুলপাতার সামঞ্জস্যে যে ভাষা বাণী প্রকাশ পেয়েছে সেটিও তিনি সম্পূর্ণ বুঝতে পারছেন না—আবছা আবছা ঠেকছে।

কিন্তু অপূর্ব সেই পুষ্পস্তবক! এটি তা হলে কাকে দেওয়া যায়? যাঁকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। খলীফা হারুন-অল রশীদ। খোজাকে ডেকে বললেন, 'বৎস, এটি তুমি আর্যপুত্রকে (খলীফাকে) দিয়ে এসো।'

খোজা তোড়াটি হাতে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, 'ও হো হো, কী অপূর্ব কুসুমগুচ্ছ! কী সুন্দর গন্ধ, কী সুন্দর রঙ! হয় না, হয় না, এ রকম সঞ্চয়ন সমাবেশ আর কোনো হাতে হতে পারে না।'

কিন্তু সে সামঞ্জস্যে যে বাণী প্রকাশিত হয়েছিল সে সেটি বুঝতে পারল না। সখীরাও বুঝতে পারেন নি।

খলীফা কিন্তু দেখা মাত্রই বাণীটি বুঝে গেলেন। তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে গেল। দেহ শিহরিত হল। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। অভূতপূর্ব পুলকে দীর্ঘ দাড়ি বেয়ে দরদর ধারে আনন্দাশ্রু বইতে লাগল।

এতখানি গল্প বলার পর কবি হাইনরিষ হাইনে বলছেন, 'হায় আমি বাগদাদের খলীফা নই, আমি মহাপুরুষ মুহম্মদের বংশধরই নই, আমার হাতে রাজা সলমনের আঙটি নেই, যেটি আঙুলে থাকলে সর্বভাষা, এমন কি পশুপক্ষীর কথাও বোঝা যায়, আমার লম্বা দাড়িও নেই, কিন্তু পেরেছি, আমিও সে ভাষা সে বাণী বুঝতে পেরেছি।'

এ স্থলে গল্পটির দীর্ঘ টীকার প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বেই নিবেদন করেছি সে শক্তি আমার নেই। তাই টাপেটোপে ঠারেঠোর কই।

রাজকুমারী = কবি; ফুলের তোড়া = কবিতা; ফুলের রঙ পাতার বাহার = তুলনা অনুপ্রাস; খোজা = প্রকাশ-সম্পাদক-ফিলিমডিস্ট্রিব্যুটর (তাঁরা সুগন্ধ সুবর্ণের রসাস্বাদ করতে পারেন, কিন্তু 'বাণী'টি বোঝেন না); এবং খলীফা = সহৃদয় পাঠক।

ফুটবল

পরশুরামের কেদার চাটুজ্জে মশাই দূর থেকে বিস্তর মেমসাহেব দেখেছিলেন, আমিও দূর থেকে বিস্তর সিনেমা-স্টার, পলিটিশিয়ান আর ফুটবল খেলোয়াড় দেখেছি। দেখে ওঁদের প্রতি ভক্তি হয়েছে এবং গদ গদ হয়ে মনে মনে ওঁদের পেন্নাম জানিয়েছি।

তাই কি করে যে 'ঈস্ট বেঙ্গল' ক্লাবের কয়েকজন খেলোয়াড় এবং ম্যানেজার মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল তার সঠিক ব্যাখ্যা আমি এখনো সমঝে উঠতে পারি নি। তবে শুনেছি আমরা যে-রকম খাঁচার ভিতর সিংহ দেখে খুশি হই সিংহটাও নাকি আমাদের দিকে কৌতূহলের সঙ্গে তাকায়—তার বিশ্বাস মানুষকে নাকি জড়ো করা হয় নিছক তাকে আনন্দ দেবার জন্য। যে-দিন লোকের সংখ্যা কম হয় সেদিন নাকি সিংহ রীতিমত মন-মরা হয়ে যায়। (আরো শুনেছি, একটা খাঁচার গোটাকয়েক শিক ভেঙে যাওয়াতে গরিলা নাকি দস্তুর মত ভয় পেয়ে গিয়ে পেছন-ফিরে দাঁড়িয়েছিল—তার বিশ্বাস ছিল খাঁচাটার উদ্দেশ্য তাকে মানুষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য)।

তাই যখন 'ঈস্ট বেঙ্গলে'র গুটিকয়েক রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমার দিকে তাকালেন তখন আমি খুশি হলুম বইকি। তারপর তাঁদের মাধ্যমে আর সক্কলের সঙ্গেও মোলাকাত হয়ে গেল। সবকটি চমৎকার ভদ্রসন্তান, বিনয়ী এবং নম্র। আমি বরঞ্চ সদম্ভে তাঁদের শুনিয়ে দিলুম ছেলেবেলায় 'বী' টীমের খেলাতে কি রকম কায়দাসে একখানা গোল লাগিয়ে দিয়েছিলুম, অবশ্য সেটা সুইসাইড্ গোল ছিল।

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন আমি তাঁদের খেলা দেখতে যাব কি না? বললুম, ফাইনালের দিন নিশ্চয়ই দেখতে যাব। ম্যানেজার বললেন, তা হ'লে তো যে-করেই

হোক ফাইনাল পর্যন্ত উঠতে হবে—বিবেচনা করুন, একমাত্র নিতান্ত আমাকে খুশি করার জন্যই তাঁদের কী বিপুল আগ্রহ!

ফাইনালের দিন ম্যানেজার আমাকে আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

* * *

দিল্লীতে ফুটবলের কদর কম। খেলা আরম্ভ হওয়ার পনরো মিনিট পূর্বে গিয়েও দিব্য সীট পাওয়া গেল। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম আমার এক চ্যালাকে—শিটিফিটি দেওয়ার জন্য। পরে দেখলুম, ও ওসব পারে না, সে জন্মেছে পশ্চিমে। বললুম, 'আরে বাপু, মুখে আঙুল পুরে যদি হুইসিলই না দিতে পারিস তবে ফুটবল খেলা দেখতে এসেছিস কেন? রবিঠাকুরের "ডাকঘর" দেখতে গেলেই পারিস।'

খেলা দেখতে এসেছে বাঙালী—তাদের অধিকাংশ আবার পদ্মার ও-পারের—আর মিলিটারি; এই দুই সম্প্রদায়। মিলিটারি এসেছে গোর্খা টীমকে সাহস দেবার জন্য, আর আমরা কি করতে গিয়েছি সে-কথা তো আর খুলে বলতে হবে না। অবশ্য আমাদের ভিতর যে 'মোহনবাগান' কিংবা 'কালিঘাট' ফ্যান ছিলেন না সে-কথা বলব না, তবে কলকাতা থেকে এত দূরে বিদেশে তাঁরা তো আর গোর্খাদের পক্ষ নিতে পারেন না। 'দোস্ত নীস্ত, লেকিন দুশমন-ই-দুশমন হস্ত' অর্থাৎ 'মিত্র নয়, তবে শত্রু' এই ফার্সী প্রবাদ সর্বত্র ঘটে না।

পিছনে দুই সর্দারজীর বড্ড ভ্যাচর ভ্যাচর করতে লাগল। ঈস্ট বেঙ্গল নাকি ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছে নিতান্ত লাক্‌সে (কপাল জোরে), ওরা নাকি বড্ড রাফ্ খেলে (সবুট গোর্খার সঙ্গে রাফ্ খেলবে ঈস্ট বেঙ্গল!) আর পদে পদে নাকি অফসাইড্। ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটকে দু-ঘা বসিয়ে দি কিন্তু তার বপুটা দেখে সাহস হল না।

* * *

খেলার পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই আমার মনে দৃঢ়প্রত্যয় হল ঈস্ট বেঙ্গল নিশ্চয় জিতবে। দশ মিনিটের ভিতর গোর্খারা গোটা চারেক ফাউল করে আর ঈস্ট বেঙ্গল গোটা তিনেক গোল দেবার মোকা নির্মমভাবে মিস করলে। একবার তো বলটা গোল-বারের ভিতর লেগে দুম করে পড়ে গেল গোল লাইনের উপর। গোলি সে তড়িঘড়ি সরিয়ে ফেললে। আমি দু-হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে বললুম 'হে মা কালী, বাবা মৌলা আলি, তোমাদের জোড়া পাঁঠা দেব, কিন্তু এ-রকম আস্কারা দিয়ে মস্কোরা কোরো না, মাইরি।' বলেই মনে পড়ল 'মাইরি' কথাটা এসেছে 'মেরি' থেকে! থুড়ি থুড়ি বলে 'দুর্গা, দুর্গতি-নাশিনী'কে স্মরণ করলুম।

হাফ-টাইম হতে চলল গোল আর হয় না—এ কী গব্বযন্তনা রে, বাবা! ওদিকে অবশ্য ফাউলের সংখ্যা কমে গিয়েছে—রেফারি দেখলুম বেজায় দড় লোক। কেউ ফাউল করলে তার কাছে ছুটে গিয়ে বেশ দু-কথা শুনিয়েও দেয়। জীতা রহো বেটা! ফাউলগুলো সামলাও, তারপর ঈস্ট বেঙ্গলকে ঠ্যাকাবে কেডা।

নাঃ হাফ টাইম হয়ে গেল। খেলা তখনো আঁটকুড়ি—গোল হয় নি।

ওহে চানাচুর-বাদাম-ভাজা, এদিকে এসো তো, বাবা। না থাক, শরবতই খাই। চেঁচাতে চেঁচাতে গলাটা শুকিয়ে। চ্যালাই পয়সাটা দিলে; তা দেবে না?—যখন হুইসিল দিতে জানে না। রেফারি আর কবার হুইসিল বাজালে? সমস্তক্ষণ তো বাজালুম আমিই।

* * *

হাফ টাইমের পর খেলাটা যদি দেখতেন! গপাগপ আরম্ভ হল পোলো দিয়ে রুই ধরার মত গোল মারা।

আমি তো খেলার রিপোর্টার নই, তাই কে যে কাকে পাস করলে, কে কতখানি প্যাটার্ন উইড করলে, কে কজন দুশমনকে নাচালে লক্ষ্য করি নি, তবে এটা স্পষ্ট দেখলুম, বলটাই যেন মনস্থির করে ফেলেছে, সবাইকে এড়িয়ে গোর্খার গোলে ঢুকবেই ঢুকবে। এক পাশ কাটিয়ে, ওর মাথার উপর দিয়ে, কখনো বা তিন কদম পেছিয়ে গিয়ে, কখনো বা কারো দু পায়ের মধ্যিখানের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ দেখি বলটা ধাঁই করে হাওয়ায় চড়ে গোর্খা গোলের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডটা এক লম্ফ দিয়ে টনসিলে এসে আটকে গিয়েছে—বিকৃতস্বরে বেরল 'গো—অ—অ—ল!' (রূপদর্শী দ্রষ্টব্য)।

ফুটবলী ভাষায় একটি তীব্র 'সট'-এর ('Sot' Shot নয়) ফলে গোলটি হল।

পিছনে সর্দারজী বললেন, 'ইয়ে গোল বচানা মুশকিল নহী থা'।

আমি মনে মনে বললুম সাহিত্যে একে আমরা বলি "মুখবন্ধ"। এরপর আরো গোটা দুই হলে তোমার মুখ বন্ধ হবে। লোকটা জোরালো না হলে—।

* * *

এসব ভাবাভাবির পূর্বেই আরেকখানা সরেস গোল হয়ে গিয়েছে। কেউ দেখল, কেউ না। একদম বেমালুম। তারই ধকল কাটাতে কাটাতে আরেকখানা, তিসরা অতিশয় মান-মনোহর গোল। সেটি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। ও গোল কেউ বাঁচাতে পারত না। দশটা গোলি লাগিয়ে দিলেও না।

এবার ম্যানেজারকে অভিনন্দন জানানো যেতে পারে। উঠে গিয়ে তাকে জোর শ্যাকহ্যান্ড করলুম। ভারী খুশি। আমায় বললে, প্রত্যেক গোলে আপনার রিএকশন লক্ষ্য করছিলুম। আমরা আমাদের কথা রেখেছি (অর্থাৎ ফাইনালে উঠেছি) আর আপনিও আপনার কথা রেখেছেন (আমি কথা দিয়েছিলুম ওরা ফাইনাল জিতবেই)। তার সঙ্গী তো আমার হাতখানা কপালে ঠেকালে।

মোরগ যে রকম গটগট করে গোবরের ঢিপিতে ওঠে আমি তেমনি আমার চেয়ারে ফিরে এলুম। ভাবখানা, তিনটে গোলই যেন নিতান্ত আমিই দিয়েছি।

তারপর শাঁ করে আরো একখানা।

দশ-বারো মিনিটের ভিতর ধনাধন চারখানা আদি ও অকৃত্রিম, খাঁটি, নির্ভেজাল

গোল!

পিছনের সর্দারজী চুপ।

চ্যালাকে বললুম, 'চলো বাড়ি যাই। খেলা কি করে জিততে হয়, হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলুম তো।'

রাত্রে সব খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানাতে গেলুম। গিয়ে দেখি এক ঢাউস ট্রফি। সঙ্গে আরেকটা বাচ্চা। বললুম, 'বাচ্চাটাই ভাল। বড়টা রাখা শক্ত (উভয়ার্থে)।'

ওদের-ই বিস্তর নাইন-নাইন্টি-নাইন পুড়িয়ে বাড়ি ফিরলুম॥

'নেভার'রাধা

অনেক প্রেমের কাহিনী পড়েছি, এমন সব দেশে বহু বৎসর কাটিয়েছি যেখানে প্রেমে না পড়াটাই ব্যত্যয়—তাই চোখের সামনে দেখেছি প্রেমের নিত্য নব প্যাটার্ন—কিন্তু একটা গল্প আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনে। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে গল্পটি বলেছেন ওস্তাদ তুর্গেনিয়েফ। এবং শুধু তাই নয়—ঘটনাটি তাঁর নিজের জীবনে সত্য সত্যই ঘটেছিল।

দস্তয়েফস্কি-তলস্তয়ের সৃজনীশক্তি তুর্গেনিয়েফের চেয়ে অনেক উঁচু দরের কিন্তু তুর্গেনিয়েফ যে স্বচ্ছ সলিল ভঙ্গীতে গল্প করতে পারতেন, সে রকম কৃতিত্ব বিশ্বসাহিত্যে দেখাতে পেরেছেন অতি অল্প ওস্তাদই। তুর্গেনিয়েফের শৈলীর প্রশংসা করতে গিয়ে এক রুশ সমঝদার বলেছেন, 'তাঁর শৈলী যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে—ইট্ ফ্লোজ্ লাইক অয়েল।'

তুর্গেনিয়েফ ছিলেন খানদানি ঘরের ছেলে—তলস্তয়েরই মত। ওরকম সুপুরুষও নাকি মস্কো, পিটাসবুর্গে কম জন্মেছেন। কৈশোরে তাঁর একবার শক্ত অসুখ হয়! সেরে ওঠবার পর ডাক্তার তাঁকে হুকুম দেন, নেভা নদীর পারে কোনো জায়গায় কিছুদিন নির্জনে থাকতে। নেভার পারে এক জেলেদের গ্রামে তুর্গেনিয়েফ পরিবারের জমিদারি ছিল। গ্রামের এক প্রান্তে জমিদারের একখানি ছোট্ট বাঙলো—চাকর-বাকর নিয়ে ছোকরা তুর্গেনিয়েফ বাঙলোয় গিয়ে উঠলেন।

সেই ছবিটি আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। জমিদারের ছেলে, চেহারাটি চমৎকার আর অসুখ থেকে উঠে সে চেহারাটি দেখাচ্ছে করুণ, উদাস-উদাস, বেদনাতুর। তার উপর তুর্গেনিয়েফ ছিলেন মুখচোরা এবং লাজুক, আচরণে অতিশয় ভদ্র এবং নম্র। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, গ্রামে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে—জেলে-মেয়েরা দূর থেকে আড়নয়নে দেখছে তুর্গেনিয়েফ মাথা নিচু ক'রে

দুহাত পিছনে এক-জোড় করে নদীর পারে পায়চারি করছেন। জরাজীর্ণ গ্রামে হঠাৎ যেন দেবদূত নেমে এসেছে।

মেয়েরা জানে এরকম খানদানি ঘরের ছেলে তাদের কারো দিকে ফিরেও তাকাবে না, কিন্তু তা হলে কি হয়, তরুণ হৃদয় অসম্ভব বলে কোনো জিনিস বিশ্বাস করে না। সে রবিবারে জেলে-তরুণীরা গির্জায় গেল দুরুদুর বুক নিয়ে—বড়দিনের ফ্রক ব্লাউজ পরে।

তরুণীদের হৃদয় ভুল বলে নি। অসম্ভব সম্ভব হল। তুর্গেনিয়েফ মেয়েদের দিকে তাকালেন। তাঁর মনও চঞ্চল হল।

তুর্গেনিয়েফ পষ্টপষ্টি বলেন নি, কিন্তু আমার মনে হয় মস্কো পিটার্সবুর্গের রঙ-মাখানো গয়না-চাপানো লোক-দেখানো সুন্দরীদের নখরাককেট্‌রিতে তাঁর মন বিতৃষ্ণায় ভরে গিয়েছিল বলে তিনি জেলে গ্রামের অনাড়ম্বর সরল সৌন্দর্যের সামনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমার মনে হয়, তুর্গেনিয়েফের কবি-হৃদয় অতি সহজেই হীরার ফুল অনাদর করে বুনো ফুল আপনার বুকে গুঁজে নিয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, গ্রামের সুন্দরীদের পয়লানম্বরী কাউকে তিনি বেছে নিলেন না। এই স্বয়ম্বরে যাকে তিনি হৃদয় দিলেন সে স্বপ্নেও আশা করতে পারে নি, এই প্রিয়দর্শন তরুণটি সুন্দরীদের অবহেলা করে তাকেই নেবে বেছে। সত্য বটে, মেয়েটি কুৎসিত ছিল না, এবং তাঁর স্বাস্থ্যও ছিল ভালো; তাই দিয়ে প্রেমের প্রহেলিকার সমাধান হয় না।

মেয়েটির মনে যে কী আনন্দ, কী গর্ব হয়েছিল সেটা কল্পনা করতে আমার বড় ভালো লাগে। তুর্গেনিয়েফ তার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন—নিজের জীবনে ঘটেছিল বলে হয়তো তিনি এ ঘটনাটিকে বিনা অলঙ্কারে বর্ণনা করেছেন। আমার কিন্তু ভারি ইচ্ছে হয়, মেয়েটির লজ্জা-মেশানো গর্ব যদি আরো ভালো করে জানতে পারতুম—তুর্গেনিয়েফ যদি আরো একটুখানি ভালো করে তার হৃদয়ের খবরটি আমাদের দিতেন।

শুধু এইটুকু জানি মেয়েটি দেমাক করে নি। ইভানকে পেয়ে সে যে-লোকে উঠে গিয়েছিল সেখানে তো দেমাক-দম্ভের কথাই উঠতে পারে না। আর তুর্গেনিয়েফ হিংসা, ঈর্ষা থেকে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অন্য মেয়েদের সঙ্গে অতি ভদ্র মিষ্ট আচরণ দিয়ে—কোনো জমিদারের ছেলে নাকি ওরকমধারা মাথা থেকে হ্যাট তুলে নিচু হয়ে জেলেনীদের কখনো নমস্কার করে নি।

কৈশোরের সেই অনাবিল প্রেম কিরূপে আস্তে আস্তে তার বিকাশ পেয়েছিল, তুর্গেনিয়েফ তার সবিস্তর বর্ণনা দেন নি—তাই নিয়ে আমার শোকের অন্ত নেই।

দুজনে দেখা হত। হাতে হাত রেখে তারা নদীর ওপারের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকত। চাঁদ উঠত। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করলে

তুর্গেনিয়েফই তাঁর ওভারকোট দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে দিতেন, সে হয়তো মৃদু আপত্তি করত—কিন্তু নিশ্চয়ই জানি ইভানের কোনো ইচ্ছায় সে বেশীক্ষণ বাধা দিতে পারতো না।

তুর্গেনিয়েফ সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন। বাড়ি থেকে হুকুম এসেছে প্যারিস যেতে।

বিদায়ের শেষ সন্ধ্যা এল। কাজ সেরে মেয়েটি যখন ছুটে এল ইভানের কাছ থেকে বিদায় নিতে, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

অঝোরে নীরবে কেঁদেছিল শুধু মেয়েটি। তুর্গেনিয়েফ বার বার সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি এরকম ধারা কাঁদছ কেন? আমি তো আবার ফিরে আসব—শিগ্‌গিরই। তোমার কান্না দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ভাবছ, আমি আর কখনো ফিরে আসব না।'

কিন্তু হায়, এসব কথায় ভাঙা বুক সান্ত্বনা মানে? জানি, তুর্গেনিয়েফের তখনো বিশ্বাস ছিল তিনি ফিরে আসবেন, কিন্তু যে ভালোবেসেছেন সমস্ত সত্তা সর্বৈব অস্তিত্ব দিয়ে, তার হৃদয় তো তখন ভবিষ্যৎ দেখতে পায়—বিধাতা-পুরুষেরই মত।

তুর্গেনিয়েফ বললেন, 'তোমার জন্য প্যারিস থেকে কি নিয়ে আসব?'

কোনো উত্তর নেই।

'বল কি নিয়ে আসব?'

'কিচ্ছু না—শুধু তুমি ফিরে এসো—।'

'কিছু না? সে কি কথা? আর সবাই তো এটা, ওটা, সেটা চেয়েছে। দেখো, আমি নোটবুকে সব কিছু টুকে নিয়েছি। কিন্তু তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে দামী জিনিস আনতে চাই। বলো কি আনব?'

'কিচ্ছু না।'

তুর্গেনিয়েফকে অনেকক্ষণ ধরে পীড়াপীড়ি করতে হয়েছিল মেয়েটির কাছ থেকে কোন একটা কিছু ফরমাশই বের করতে। শেষটায় সে বললে, 'তবে আমার জন্য সুগন্ধি সাবান নিয়ে এসো।'

তুর্গেনিয়েফ তো অবাক। 'এই সামান্য জিনিস!' কিন্তু কেন বলো তো, তোমার আজ সাবানের শখ গেল? কই, তুমি তো কখনো পাউডার সাবানের জন্য এতটুকু মায়া দেখাও নি—তুমি তো সাজগোজ পছন্দ কর না।

নিরুত্তর।

'বলো।'

'তা হলে আনার দরকার নেই।' তার পর ইভানের কোলে মাথা রেখে কেঁদে বলল, 'ওগো, শুধু তুমি ফিরে এসো।'

'আমি নিশ্চয় সাবান নিয়ে আসব। কিন্তু বল, তুমি কেন সুগন্ধি সাবান চাইলে?'

কোলে মাথা গুঁজে মেয়েটি বলল, 'তুমি আমার হাতে চুমো খেতে ভালোবাসো আমি জানি। আর আমার হাতে লেগে থাকে সবসময় আঁশটে গন্ধ। কিছুতেই ছাড়াতে পারি নে। প্যারিসের সুগন্ধি সাবানে শুনেছি সব কেটে যায়। তখন চুমো খেতে তোমার গন্ধ লাগবে না।'

অদৃষ্ট তুর্গেনিয়েফকে সে গ্রামে ফেরবার অনুমতি দেন নি।

সে দুঃখ তুর্গেনিয়েফও বুড়ো বয়স পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি।।

কই সে?

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মাবোধ, গ্যোটের ভূয়োদর্শন, শেক্‌স্‌পিয়ারের মানবচরিত্রজ্ঞতা সামান্য জনও কিছু না কিছু উপলব্ধি করতে পারে। সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীকে দিয়েছেন মাত্র একটি হিমালয়; আমাদের মানসলোকে এই তিনজনই তিনটি হিমালয়। সাধারণ জন দূর থেকেও এঁদের গাম্ভীর্য-মাধুর্য দেখে বিস্ময় বোধ করে—চূড়ান্তে অধিরোহণ করেন অল্প মহাত্মাই। আরো হয়তো একাধিক হিমালয় এ-ভূমিতে, অন্যান্য ভূমিতে আছেন—ভাষা ও দূরত্বের কুহেলিকায় আজও তাঁরা লুক্কায়িত।

এছাড়া প্রত্যেক পাঠকেরই আপন-আপন অতি আপন প্রিয় কবি আছেন। তাঁদের কেউ কেউ হয়তো বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি,—হয়তো তাঁদের সে মেধা নেই; এঁদের স্বীকার করে নিয়েও আমরা এঁদের নাম বিশ্বকবিদের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে বলি না।

আমি দুজন কবিকে বড় প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। আমারই সৌভাগ্য, এঁদের একজন বাঙালী—চণ্ডীদাস, অন্য জন জর্মন, নাম হাইনে। প্রশ্ন উঠতে পারে, বড় বড় কবিদের ছেড়ে এঁদের প্রিয় বরণ করেছি কেন? কারণটা তুলনা দিয়ে বোঝালে সরল হয়। রাজবাড়ির ঐশ্বর্য দেখে বিমোহিত হই, বিনোবাজীর ব্যক্তিত্ব দেখে বাক্যস্ফূর্তি হয় না, কিন্তু রাজবাড়িতে তথা বিনোবাজীর সাহচর্যে থাকবার মত কৌতূহল যদি বা দু'একদিনের জন্য হয়, তাঁদের সঙ্গে অহরহ বাস করতে হলে আমার মত সাধারণ জনের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসবে।

চণ্ডীদাসকে নিয়ে ষোল, আর হাইনেকে নিয়ে সতের বছর বয়েস থেকে ঘর করছি। একদিনের তরে কোনো প্রকার অস্বস্তি বোধ করি নি। আমি জানি, এ, বিষয়টি আরো সরল করে বুঝিয়ে বলা যায়, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। কারণ প্রত্যেকেরই আপন-আপন প্রাণপ্রিয় ঘরোয়া কবি আছেন—শেক্‌স্‌পিয়ার গ্যোটে নিয়ে ঘর করেন অল্প লোকই, তাঁরা এতক্ষণে আমার বক্তব্যটি পরিষ্কার বুঝে গিয়েছেন। নিজের পিঠ

নিজে কখনো দেখি নি, কিন্তু সেটা যে আছে সে-কথা অন্য লোককে যুক্তিতর্ক দিয়ে সপ্রমাণ করতে হয় না।

চণ্ডীদাস ও হাইনের মত সরল ভাষায় হৃদয়ের গভীরতম বেদনা কেউ বলতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ আর গ্যোটেও অতি সরল ভাষায় কথা বলতে জানতেন কিন্তু তাঁরা সৃষ্টি-রহস্যের এমন সব কঠিন জিনিস নিয়ে আপন আপন কাব্যলোক রচনা করেছেন যে সেখানে তাঁদের ভাষা বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দুর্জ্ঞেয় হতে বাধ্য। চণ্ডীদাস, হাইনে তাঁদের, আমাদের হৃদয়বেদনালোকের বাইরে কখনো যেতে চান নি। তাঁরা গান গেয়েছেন, আমাদের আঙ্গিনায় তেঁতুলের ছায়ায় বসে—তারা-ঝরা-নির্ঝরের ছায়াপথ ধরে ধরে তাঁরা সপ্তর্ষির গগনাঙ্গন পৌঁছে সেখানকার অমর্ত্য গান গান নি।

চণ্ডীদাসকেই সব বাঙালী চেনে, হাইনের পরিচয় দি।

আমাদের পরিচিত জনের মাধ্যমেই আরম্ভ করি।

যাঁরা গত শতাব্দীতে ইয়োরোপে সংস্কৃতচর্চা নিয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করেছেন তাঁরাই আউগুস্টুস্ ভিল্‌হেল্‌ম্ ফন্ শ্লেগেলের সঙ্গে পরিচিত।

জর্মনির বন্ বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম সংস্কৃত চর্চার জন্য আসন প্রস্তুত করা হয়! ১৮১৮ খৃস্টাব্দে তিনি এই আসনে অধ্যাপকরূপে বিরাজ করতেন। এক দিকে তিনি সংস্কৃতের নাট্যকাব্যের সঙ্গে পরিচিত, অন্য দিক দিয়ে তখনকার গৌরবভাস্কর ফরাসী সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন বিখ্যাত সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী মাদাম দ্য স্তালের সখা ও উপদেষ্টারূপে। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ছাড়াও পড়াতেন নন্দনশাস্ত্র বা অলঙ্কার। এক বৎসর যেতে না যেতে হাইনে বন্ এলেন আইন পড়তে। শ্লেগেলের বক্তৃতা শুনে তিনি এমনই অভিভূত হয়ে গেলেন যে আইনকে তিনি সনির্বাসনে পাঠালেন।

শ্লেগেল অলঙ্কার পড়াবার সময় নিজেকে গ্রীক লাতিন ফরাসী জর্মনের ভিতর সীমাবদ্ধ করে রাখতেন না। ঘনঘন সংস্কৃত কাব্যোপবনে প্রবেশ করে গুচ্ছগুচ্ছ গীতাঞ্জলি সঞ্চয়িতা তাঁর শিষ্যদের সামনে তুলে ধরতেন। হাইনের বয়স তখন একুশ বাইশ ঃ সেই সর্বজনমান্য প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধ রসিকজননমস্য শ্লেগেলের কাছে হাইনে একদিন নিয়ে গেলেন তাঁর একগুচ্ছ কবিতা।

'উত্তম, উত্তম কবিতা, কিন্তু তোমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। বড্ডবেশী পুরনো অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, নিজের কথার আড় কবিতাকে কৃত্রিম করে ফেলেছে।' দুরুদুরু বুকে হাইনে মৃদু আপত্তি জানালেন। শ্লেগেল নির্দয় সমালোচক। বললেন 'বুঝেছি, বুঝেছি। কিন্তু তোমার কাব্যরাণী এখনো পরে আছেন জবরজঙ্গ জামাকাপড়, তাঁর মুখে বড্ডবেশী কালো তিল, তাঁর ক্ষীণ কটী আর কত ক্ষীণ করবে, তাঁর খোঁপা যে আকাশে উঠে গেছে। একে ভালোবাসার যুগ তোমার পেরিয়ে গিয়েছে।

'কিন্তু বন্ধু তোমার ভাস্বর কাব্যলক্ষ্মী ঘুমিয়ে আছেন কে জানে কোন ইন্দ্রজালের মোহাচ্ছন্ন মায়ায় উত্তর দেশে নিভৃতে নির্জনে। প্রেমাতুর, বিরহবেদনায় বিবর্ণ কত না তরুণ রাজপুত্র বেরিয়েছেন তাঁর সন্ধানে হয়তো তুমিই,—তুমিই বন্ধু। সেই ভানুমতী মন্ত্র পড়ে তাঁকে দীর্ঘ শর্বরীর দীর্ঘতর নিদ্রা থেকে জাগরিত করবে। ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠবে চতুর্দিকে, বনস্পতি গান গেয়ে উঠবে, প্রকৃতিও জেগে উঠবে আপন জড়নিদ্রা থেকে। জর্মন কাব্যলক্ষ্মীর চতুর্দিকের প্রাকার ধ্বংসাবশেষ রূপান্তরিত হবে স্বর্ণোজ্জ্বল রাজপ্রাসাদে। গ্রীসের সুরপুত্রগণ আবার এসে অবতীর্ণ হবেন তাদের চিরনবীন দেবসজ্জার মহিমায়...প্রার্থনা করি আপোল্লো দেব তোমার প্রতি পদক্ষেপের দিকে অবিচল দৃষ্টি রাখুন।

হাইনের জীবনীকার বলেন, কোনো সুরাই তরুণ হাইনেকে এতখানি উত্তেজিত করতে পারে নি—সে যুগের আলঙ্কারিক শ্রেষ্ঠের কয়েকটি কথায় তাঁকে যতখানি সমাচ্ছন্ন করেছিল। রসরাজ শ্লেগেল স্বহস্তে হাইনের মস্তকে কবির রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছেন!

এর কিছুদিন পরে—হাইনে তখনো কলেজের ছাত্র,—বেরল তাঁর কবিতার বই, 'বুখ ড্যার লীডার,' 'গানের বই' কিন্তু এর অনুবাদ 'গীতাঞ্জলি' করলেই ঠিক হয়। আমরা 'অঞ্জলি' বলতে যা বুঝি সেটা ইউরোপেও আছে, কিন্তু ঠিক শব্দটি নেই! গানের বইখানা পড়ার পর স্পষ্টই বোঝা যায়, 'অঞ্জলি' শব্দটি ইউরোপে থাকলে হাইনে অতি নিশ্চয় ঐটেই ব্যবহার করতেন—কারণ এর অনেকগুলিই তাঁর প্রথমা প্রিয়ার পদপঙ্কজে অর্পিত প্রণয়প্রসূনাঞ্জলি।

সমস্ত জর্মনি সাত দিনের ভিতর এই কলেজের ছোকরার জয়ধ্বনি গেয়ে উঠল। হাইনে জর্মন কাব্যে আনলেন এক নূতন সুর। অথচ সত্য বলতে কি, এ সুরে কিছুমাত্র নূতনত্ব নেই, কারণ গীতিগুলি সরলতম ভাষায় রচিত। সরল ভাষা ব্যবহার করা তো আর বিশ্ব সাহিত্যে কিছু নূতন নয়। কিন্তু জর্মন কাব্যে ঐটেই হল এক সম্পূর্ণ নবীন সুর—কারণ জর্মনদের বিশ্বাস তাদের ঐতিহ্য তাদের সংস্কৃতি এমনই এক অবর্ণনীয় কুহেলিকাঘন আত্মোপলব্ধি-প্রচেষ্টা এবং অর্ধসফলতা-অর্ধনৈরাশ্যে আচ্ছাদিত যে সেটা সরল ভাষায় কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না। হাইনে দেখিয়ে দিলেন সেটা যায়। যে রকম সবাই যখন বলেছিল, অসম্ভব, তখন মধুসূদন দেখিয়ে দিয়েছিলেন, অমিত্রাক্ষরে বাঙলা কাব্য সৃষ্টি করা যায়।

হাইনের কবিতা সরল। সকলেই জানেন সরল ভাষায় লেখা কঠিন। সেটাও আয়ত্ত করা যায়। আয়ত্ত করা যায় না—সরল কিন্তু অসাধারণ হওয়া। 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল'—সরল অথচ বিরল লেখা।

ইংরিজিতে হাউসমানের সঙ্গে হাইনের তুলনা করা হয়। শুনতে পাই হাউসমানের 'শ্রপ শা ল্যাডের' মত কোনো ইংরিজি কবিতার বই এত বেশী বিক্রয় হয়নি—প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। সাধারণ জন পড়েছে বইখানা সরল বলে, গুণীরা

কিনেছেন বিরল বলে। পাঠককে অনুরোধ করি, দুজনারই লেখা তলিয়ে পড়তে। হাইনে অনেক উঁচুতে।[১]

হাইনের কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করেছেন প্রধানত সত্যেন্দ্র দত্ত। তীর্থ সলিল ও তীর্থরেণুতে—এবং হয়তো অন্যান্য পুস্তকেও কিছু কিছু আছে। আর করেছেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

এঁর বই জোগাড় করতে পারি নি, আমি ১৩১৭ সনের প্রবাসীতে পড়েছি। 'ডী রোজে, ডী লীলিয়ে, ডী টাউবে'—'দি রোজ, দি লিলি দি ডাভের' অনুবাদ করেছেন :

গোলাপ, কমল, কপোত, প্রভাত রবি—
ভালবাসিতাম কত যে এসবে আগে,
সে সব গিয়েছে, এখন কেবল তুমি,
তোমারি মূর্তি পরাণে কেবল জাগে!
নিখিল প্রেমের নির্ঝর—তুমি সে সবি—
তুমিই গোলাপ, কমল, কপোত, রবি।

(বাগচী, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৭)

এবার সত্যেন দত্তের একটি ঃ

জাগিনু যখন উষা হাসে নাই,
শুধানু "সে আসিবে কি?"
চলে যায় সাঁঝ আর আশা নাই,
সে ত' আসিল না, হায়, সখি?
নিশীথে রাতে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে
জাগিয়া লুটাই বিছানায়;
আপন রচনা ব্যর্থ স্বপন
দুখ ভারে নুয়ে ডুবে যায়।

ভারতবর্ষের প্রভাব হাইনের কবিতায় খুব বেশী আছে বলা যায় না। তাঁর পূর্ববর্তী হিমালয় গ্যোটেই যখন হাইনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি—চণ্ডীদাসের উপর কার প্রভাব!—তখন সে আশা দুরাশা। তবু একটি কবিতার উল্লেখ করি—

---

১ Edmund Willson মার্কিন সমালোচক। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি তার প্রধান কারণ তিনি এলিয়েটকে অপ্রিয় সত্য বলতে জানেন। হাইনে-হাউসমান সম্বন্ধে তিনি বলেন, There is immediate emotional experience in Housman of the same kind that there is in Heine, whom he imitated and to whom he has been compared. But Heine, for all his misfortunes, moves at ease in a large world. There is in his work an exhilaration of adventures, in travel, in love etc. Doleful accents may sometimes be, he always lets in air and light to the mind. But Housman is closed from the begining. His world has no opening horizons etc. "The Triple Thinkers," p. 71

গঙ্গার পার—মধুর গন্ধ ত্রিভুবন
আলো ভরা—
কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে
পুরুষ রমণী সুন্দর আর শান্ত প্রকৃতি-ধরা
নতজানু হয়ে শতদলে পূজা করে।

(লেখকের অনুবাদ)

একদিক দিয়ে হাইনে গীতিকাব্য রচয়িতা, অন্যদিক দিয়ে তিনি সমস্ত জীবন লড়েছেন জর্মনির সাধারণ জনের ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য। সেই 'দোষে' তাঁকে যৌবনেই নির্বাসন বরণ করতে হয়। জীবনের বেশীর ভাগ তিনি কাটান প্যারিসে। সেখানে তিনি কী রাজার সম্মান পেয়েছিলেন, সে কথা লিখেছেন ভিক্টর হ্যুগোর গুরু ফরাসী সাহিত্যের তখনকার দিনের গ্র্যান্ড মাস্টার গোতিয়ের। আর হাইনের সখা ও সহচর ছিলেন সঙ্গীতের গ্র্যান্ড মাস্টার রস্‌সীনি। যদিও পরের কথা, তবু এই সুবাদে একটি মধুর গল্প মনে পড়ল।

জীবনের শেষ আট বছর হাইনের কাটে ঐ প্যারিসেই, রোগশয্যায়, অবশ অথর্ব হয়ে—অসহ্য যন্ত্রণায়। কার্ল মার্কস্ যখন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন তখন হাইনের চোখের পাতা আঙুল দিয়ে তুলে ধরতে হয়েছিল—যাতে করে তিনি মার্কসকে দেখতে পান। এর কিছু দিন পর হাইনের বাড়িতে আগুন লাগে। বিরাট বপু দরওয়ান রোগজীর্ণ হাইনেকে কোলে করে নিয়ে গেল নিরাপদ জায়গায়। আগুন নেভানোর পর যখন তাঁকে দরওয়ান আবার কোলে তুলে নিয়ে এল তখন হাইনে মৃদুহাসি হেসে তাঁর এক সখাকে বললেন, 'হামবুর্গে মাকে লিখে দাও, প্যারিসের লোক আমাকে এত ভালবাসে যে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

সেই সরল দরওয়ান কথাটির অর্থ বুঝেছিল কি না জানিনে। শুনতে পেয়ে সে বলেছিল, 'হ্যাঁ, মসিয়ো, তাই লিখে দিন।'

ঘটনাটির ভিতর অনেকখানি বেদনা লুকনো আছে। নির্বাসিত হাইনে যতদিন পারেন মায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন যে তিনি আর নড়া-চড়া করতে পারেন না।

পাশ্চাত্ত্য কবিরা মায়ের উদ্দেশে বা স্মরণে বড় একটা কবিতা লেখেন না। ইহুদি হাইনের গায়ে প্রাচ্য দেশীয় রক্ত ছিল বলে তিনি ব্যত্যয়। অল্প লোকই হাইনের মত মাকে ভালোবেসেছে। প্যারিসে থাকাকালীন মাত্র দু'বার তিনি গোপনে জর্মনি যান। দু'বারই মাকে দেখবার জন্য এবং আমার নিজের মনে সন্দেহ আছে, পুলিস জানতে পেরেও বোধ হয় সাধারণের কবি হাইনেকে ধরিয়ে দেয় নি। পুলিস কবিতা না লিখতে পারে, কিন্তু পুলিসেরও তো মা থাকে।

মাতার উদ্দেশে লেখা হাইনের কবিতা অদ্বিতীয় বলার সাহস আমি না পেলেও

বলবো অতুলনীয়। এবং আশ্চর্য, কবিতাটি করুণ এবং মধুর সুরে রচা নয়। ভাষা অবশ্য অত্যন্ত সরল, কিন্তু মূল সুরে আছে দার্ঢ্য এবং দম্ভ। কাইজারের সঙ্গে প্রজা-মিত্র হাইনের ছিল কলহ—আমার মনে প্রশ্ন জাগে হাইনের সখা রজকিনী-সাধক চণ্ডীদাসকে কি মুকুটহীন কাইজার ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয় নি—এবং তাই তিনি কবিতা আরম্ভ করেছেন,

উচ্চশির উচ্চে রাখা অভ্যাস আমার
আমার প্রকৃতি জেনো অতীব কঠোর
রাজারো অবজ্ঞা দৃটি পারে না তো মোর
দৃষ্টি কভু নত করে। কিন্তু মাগো—

আর তার পর কী আকুলি-বিকুলি! তোমার সামনে, মা, আপনার থেকে মাথা নিচু হয়ে আসে। স্মরণে আসে, কত না অপরাধ করেছি, কত কিছু না করে তোমার পুণ্য হৃদয়কে বেদনা দিয়েছি বার বার। তার স্মৃতি আমাকে যে কী পীড়া দেয়, জানো মা?

সত্যেন দত্তের অনুবাদ তুলে দিতে ইচ্ছে করছে না,—প্রত্যেক অনুতপ্ত জনের মত আমারও মন আঁকুবাঁকু করে, হাইনের মাতৃমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমিও আমার মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করে যাই।

কবিতাটির দ্বিতীয় ভাগে অন্য সুর।

তোমাকে ছেড়ে মা, মূর্খের মত আমি গিয়েছি পৃথিবীর অন্য প্রান্তে—ভালোবাসার সন্ধানে। দোরে দোরে ভিখারির মত ভালোবাসার জন্য করেছি করাঘাত। আর পেয়েছি শুধু নিদারুণ ঘৃণা। তার পর যখন ক্ষত-বিক্ষত শ্লথ চরণে বাড়ি ফিরেছি তখন দোরের সামনে তুমি মা এগিয়ে এসেছ আমার দিকে—

হার মানলুম। সত্যেন দত্তের অনুবাদটিই পড়ুন।

আশ্চর্য লাগে, এই হাইনে লোকটি সরল ভাষায় কি করে রুদ্র করুণ উভয় রসই তৈরী করতে জানতেন। আর আমার সবচেয়ে ভালো লাগে তাঁর হাসিকান্নায় মেলানো লেখাগুলো। তারই হ্রস্ব একটি শোনাবার জন্য দীর্ঘ এই ভূমিকা। আমি নিরুপায়। হায়, আমার তো সে শক্তি নেই যার কৃপায় লেখক মহাত্মাজনকেও স্বল্পে প্রকাশ করতে পারে।

সম্রাট ম্যাক্‌সিমীলীয়নের কাহিনী বলতে গিয়ে হাইনে অনুতাপ করছেন, যে কাহিনীটি তাঁর ভালো করে মনে নেই—অনেক কালের কথা কি না। আপসোস করে বলছেন এসব জিনিস মানুষ সহজেই ভুলে যায়,—বিশেষ করে যখন তাঁকে প্রতি মাসে প্রফেসরের রোক্কা মাইনে দেওয়া হয় না, আপন ক্লাস-লেকচারের নোটবই থেকে মাঝে-মধ্যে পড়ে নিয়ে স্মৃতিটা ঝালিয়ে নেবার জন্য।

ম্যাক্‌সিমীলীয়ন পাষাণ প্রাচীরের কঠিন কারাগারে। তাঁর আমীর-ওমরাহ,

উজীর-নাজীর সবাই তাঁকে বর্জন করেছে। কেউ সামান্যতম চেষ্টা করছে না, তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করার। কী ঘেন্নায়ই না ম্যাক্‌সিমীলীয়ন তাঁর গৌরব-দিনের সে পা-চাটা দলের কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করেছিলেন।

এমন সময় সর্বাঙ্গ কম্বলে ঢেকে এসে ঢুকলো কারাগারের নির্জন কক্ষে একটা লোক। কে এ? এক ঝটকায় কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিতেই সম্রাট দেখেন, এ যে রাজসভার ভাঁড়, সং, বিশ্বাসী কুন্‌ৎস্‌ ফন্‌ ড্যার রোজেন। আশার বাণী, আত্মবিশ্বাসের মন্ত্র নিয়ে এল শেষটায় রাজসভার মূর্খ—সং কুন্‌ৎস্‌!

'ওঠো মহারাজ, তোমার শৃঙ্খল ভাঙবার দিন এল। কারামুক্তির সময় এসেছে। নব-জীবন আরম্ভ হল। অমানিশি অতীত—ঐ হেরো বাইরে প্রথম ঊষার উদয়!'

'ওরে মূর্খ, ওরে আমার হাবা কুন্‌ৎস্‌! ভুল করেছিস রে ভুল করেছিস। উজ্জ্বল খড়্গ দেখে তুই ভেবেছিস সূর্য, আর যেটাকে তুই ঊষার লালিমা মনে করেছিস সে রক্ত।'

'না, মহারাজ, ওটা সূর্যই বটে, যদিও অসম্ভব সম্ভব হয়েছে—ওটা উদয় হচ্ছে পশ্চিমাকাশে—দু হাজার বছর ধরে মানুষ ওটাকে পূর্ব দিকেই উঠতে দেখেছে—এখনো কি ওর সময় হয় নি যে একবার রাস্তা বদলে পশ্চিম দিকে উঠে দেখে কি রকম লাগে!'

'কুন্‌ৎস্‌ ফন্‌ ড্যার রোজেন্‌, বল দেখি তো হাবা আমার, তোর টুপিতে যে ছোট ছোট ঘুঙুর বাঁধা থাকতো সেগুলো গেল কোথায়?'

'দুঃখের কথা তোলেন কেন, মহারাজ! দুর্দিনের কথা ভেবে মাথা নাড়তে নাড়তে ঘুঙুরগুলো খসে গেল; কিন্তু তাতে টুপির কোনো ক্ষতি হয় নি।'

'কুন্‌ৎস্‌ ফন্‌ ড্যার রোজেন, ওরে মূর্খ, বল তো, রে, বাইরে ও কিসের শব্দ?'

'আস্তে, মহারাজ। কামার কারাগারের দরজা ভাঙছে। শীঘ্রই আপনি আবার মুক্ত স্বাধীন হবেন—সম্রাট।'

'আমি কি সত্যই সম্রাট? হায়, শুধু রাজসভার মূর্খের মুখেই আমি এ কথা শুনলাম।'

'ও রকম করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবেন না, প্রভু! কারাগারের বিষের হাওয়া আপনাকে নির্জীব করে ফেলেছে। আপনি যখন আবার সম্রাট হবেন তখন ধমনীতে ধমনীতে অনুভব করবেন সেই বীর রাজ-রক্ত, আপনি আবার হবেন গর্বিত সম্রাট, দম্ভী সম্রাট। আবার হবেন দাক্ষিণ্যময় এবং আবার করবেন অন্যায়, অবিচার হাসিমুখে, এবং আবার হবেন নেমকহারাম—রাজাবাদশাদের যা স্বভাব।'

'কুন্‌ৎস্‌ ফন ড্যার রোজেন, বল তো হাবা, আমি যখন আবার স্বাধীন হব, তখন তুই কি করবি?'

'আমি আমার টুপিতে ফের ঘুঙুর সেলাই করবো।'

'আর তোর বিশ্বস্ততা প্রভুভক্তির বদলে তোকে কি প্রতিদান, কি পুরস্কার দেব?'

'আঃ, আমার দিলের বাদশাকে কি বলবো! দয়া করে আমার ফাঁসির হুকুমটা দেবেন না।'

এইখানে হাইনে তাঁর গল্পটি শেষ করেছেন।

আমরা বলি, 'হা হতোস্মি, হা হতোস্মি! রাজসভার ভাঁড়ই হোক আর সঙই হোক, সভা-মূর্খ হোক আর পুণ্যশ্লোক গর্দভই হোক, কুন্‌ৎস্‌ বিলক্ষণ জানতো, রাজারাজড়ার কৃতজ্ঞতাবোধ কতখানি!

কিন্তু কাহিনীটির তাৎপর্য কি?

হাইনে সেটি গল্পের মাঝখানেই বুনে দিয়েছেন। সে যুগের গল্পে দুটো ক্লাইমেক্‌স্‌ চলতো না বলে আমি সেটি শেষের-কবিতা রূপে রেখে দিয়েছি।

'হে পিতৃভূমি জর্মনি! হে আমার প্রিয় জর্মন জনগণ! আমি তোমাদের কুন্‌ৎস্‌ ফন্‌ রোজেন। তার একমাত্র ধর্ম ছিল আনন্দ, যার কর্ম ছিল তোমাদের মঙ্গলদিনে তোমাদের আনন্দবর্ধন করা, তোমাদের দুর্দিনে কারাপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে তোমাদের জন্য অভয়বাণী নিয়ে আসা। এই দেখো, আমার দীর্ঘ আচ্ছাদনের ভিতর লুকিয়ে এনেছি তোমার সুদৃঢ় রাজদণ্ড তোমার সুন্দর রাজমুকুট—আমাকে স্মরণ করতে পারছো না, তুমি মহারাজ? আমি যদি তোমাকে মুক্ত না করতে পারি, সান্ত্বনা তো দিতে পারব। অন্তত তো তোমার কাছে এমন একজন আপনজন রইল যে তোমার সঙ্গে তোমার দুঃখবেদনার কথা কইবে; তোমাকে আশার বাণী শোনাবে; যে তোমাকে ভালোবাসে; যার সর্বশেষ রসের কথা সর্বশেষ রক্তবিন্দু তোমারই সেবার জন্য। হে, আমার দেশবাসিগণ, তোমরাই তো প্রকৃত সম্রাট, তোমরাই তো দেশের প্রকৃত প্রভু। তোমাদের ইচ্ছা, এমন কি তোমাদের খেয়াল-খুশীই তো দেশের প্রকৃত শক্তি—এ শক্তি 'বিধি দত্ত' 'রাজদণ্ডকে' অনায়াসে পদদলিত করে! হতে পারে আজ তোমরা পদ-শৃঙ্খলিত কারাগারে নিক্ষিপ্ত—কিন্তু আর কত দিন? ঐ হেরো, মুক্তির নব অরুণোদয়!'

* * *

হে বাঙালী, আজ তুমি দুর্দশার চরমে পৌঁচেছো।

কোথায় তোমার কুন্‌ৎস্‌ ফন্‌ ড্যার রোজেন? যে তোমাকে আশার বাণী শোনাবে॥

আহারাদি

যে লোক উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব জানে না, সে দেশী-বিদেশী যে-কোনো গাছ দেখলেই মনে করে, এও বুঝি এক সম্পূর্ণ নূতন গাছ। তখন নূতন গাছের সঙ্গে তার চেনা কোনো গাছের কিছুটা মিল সে যদি দেখতে পায় তবে অবাক হয়ে ভাবে, এই চেনা-অচেনা মেশানো গাছের কি অন্ত নেই! কিন্তু শুনেছি, উদ্ভিদবিদ্যা নাকি পৃথিবীর বেবাক গাছকে এমন কতকগুলো শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলেছে যে, নূতন কোনো গাছ দেখলে তাকে নাকি কোনো একটা শ্রেণীতে নামকরণ পর্যন্ত করা যায়। আশ্চর্য নয়, কারণ ধ্বনির বেলা তো তাই দেখতে পাচ্ছি। ইংরিজি শুনে মনে হয় যে, এই বিকট ভাষার স্বরব্যঞ্জনের বুঝি অন্ত নেই। কিন্তু ডেনিয়েল জোন্‌স্‌ এবং পূর্বাচার্যগণ এমনি উত্তম শ্রেণীবিভাগ করে ফেলেছেন যে, আজ আমার বাপ-ঠাকুরদার চেয়ে বহু কম মেহন্নতে ইংরিজি উচ্চারণ শিখতে পারি।

আহারাদির বেলাও তাই। আপনার হয়তো কোনো কাবুলীওলার সঙ্গে মিতালি হ'ল। সে আপনাকে দাওয়াত করে খাওয়াল। প্রথমটায় আপনি হয়তো ভেবেছিলেন যে, হাতুড়ি বাটালি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। গিয়ে দেখেন, খেতে দিল তোফা পোলাও আর খাসা মুর্গীর ঝোল। তবে ঠিক জাকারিয়া স্ট্রীটের মত রান্না নয়, কলকাতাবাসী পশ্চিমা মুসলমানেরা যে রকম রান্না করে ঠিক সে-রকমও নয়। কেমন যেন একটুখানি আলাদা, কিন্তু খেতে উম্‌দা।

অথবা মনে করুন আপনাকে প্যারিসের কোনো রেস্তোরাঁয় আপনার ভারতীয় বন্ধু 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ' খেতে দিলেন। হয়তো আপনি ইয়োরোপে এসেছেন মাত্র কয়েকমাস হল—নানা প্রকার যাবনিক খাদ্য খেয়ে খেয়ে আপনার পিত্তি (উভয়ার্থে) চটে আছে। তখন সেই 'গুলাশ' দেখে আপনি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করবেন। সেই রাত্রেই আপনি গিন্নীকে চিঠি লিখলেন, 'বহুকালের পর মাংসের ঝোল খেয়ে বিমলানন্দ উপভোগ করলুম।' কারণ 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ' আর সাদা-মাটা মাংসের ঝোলে কোনো তফাত নেই।

আর আপনার বন্ধু যদি ন-সিকে গুণী হন এবং সেই গুলাশের সঙ্গে খেতে দেন 'ইতালিয়ান রিসোত্তো', তাহলে আপনাকে হাতী দিয়ে বেঁধেও সেই রেস্তোরাঁ থেকে বের করা যাবে না। ইয়োরোপের বাকী কটা দিন আপনি সেই রেস্তোরাঁর টেবিল ক্লথ বেড়ালছানার মত আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে চাইবেন। কারণ বহুকাল বর্বর আহারাদির পর মাংসের ঝোল আর রুটি মুখরোচক বটে, কিন্তু তার সঙ্গে কি পোলাও আর মাংসের ঝোলের তুলনা হয়? ঘড়েল পাঠক নিশ্চয় এতক্ষণে ধরে

ফেলেছেন যে, 'ইতালিয়ান রিসোত্তো' মানে পোলাও, তবে ঠিক, ভারতীয় পোলাও নয়। কোপ্তা-পোলাওয়ের কোপ্তাগুলোকে যদি ছোট্ট ছোট্ট টুকরো করে পোলাওয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাই হবে রিসোত্তো।

অথবা মনে করুন, দেশে ফেরার সময় আপনি একদিনের তরে কাইরোতে ঢুঁ মেরে এলেন। কিছু কঠিন কর্ম নয়। পোর্ট-সাইদে জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে কাইরো, সেখানে ঘণ্টা বারো কাটিয়ে মোটরে করে সুয়েজ বন্দরে পৌঁছে ফের সেই জাহাজই ধরা যায়—কারণ জাহাজ সুয়েজ খাল পেরিয়ে অতি ধীরে ধীরে এগোয়।

কাইরোতে খেলেন মিশরী রান্না। চাক্তি চাক্তি মাংস খেতে দিল, মধ্যিখানে ছ্যাঁদা। দাঁতের তলায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে বটে, কিন্তু সোওয়াদ খাসা। খাচ্ছেন আর ভাববেন বস্তুটা কি, কিন্তু কোনো হদিস পাচ্ছেন না। হঠাৎ মনে পড়ে যাবে, খেয়েছি বটে আমজাদিয়ায় এইরকম ধারা জিনিস—শিককাবাব তার নাম। তবে মশলা দেবার বেলা কঞ্জুসী করেছে বলে ঠিক শিককাবাবের সুখটা পেলেন না।

এতক্ষণে আপনার শাস্ত্রাধিকার হল। এই যে মশলার তত্ত্বটা আবিষ্কার করতে পেরেছেন, এরই খেই ধরে আপনি রান্নার শ্রেণী বিভাগ নিজেই করে ফেলতে পারবেন।

পৃথিবীতে কুল্লে দুইরকমের রান্না হয়। মশলাযুক্ত এবং মশলা-বর্জিত। মশলা জন্মে প্রধানত ভারতবর্ষে, জাভায়, মালয়ে। ইয়োরোপে মশলা হয় না। তাই ইয়োরোপীয় রান্না সাধারণতঃ মশলা-বর্জিত।

এবার ঈষৎ ইতিহাসের প্রয়োজন। তুর্ক পাঠানরা যখন এদেশে আসে তখন পশ্চিম এবং উত্তর ভারত নিরামিষ খেত। তুর্ক পাঠানরা মাংস খেত বটে, কিন্তু সে রান্নায় মশলা থাকত না। তুর্ক-পাঠান-মোগলরা যে রকম ভারতবর্ষের অলঙ্কার কারুকার্যের সঙ্গে তুর্কিস্থানী ইরানী স্থাপত্য মিলিয়ে তাজমহল বানাল, ঠিক সেইরকম ভারতীয় মশলার সঙ্গে তাদের মাংস রান্নার কায়দা মিলিয়ে এক অপূর্ব রান্নার সৃষ্টি করল। আপনারা তাজমহল দেখে 'আহা আহা' করেন, আমি করি না। কারণ তাজমহল চিবিয়ে খাওয়া যায় না আর খাস মোগলাই রান্না পেলেই আমি খাই এবং খেয়ে 'জিন্দাবাদ বাবুর-আকবর' বলি—যদিও তাঁরা বহুকাল হল এ-জিন্দেগীর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চলে গিয়েছেন।

এই 'মোগলাই' রান্না ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের তাবৎ মাংস খেকোদের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। (বাঙালী আর দ্রাবিড়ের কথা আলাদা; এরা মাংস খায় কম, আর খাস মোগল-পাঠানের সংস্পর্শে এসেছে তারও কম। পিরালী ঠাকুরবাড়ি ব্যত্যয়, তাঁরা মোগলের সঙ্গে খানিকটা মিশেছিলেন বলে তাঁদের রান্নায় বেশ মোগলাই খুশবাই পাওয়া যায়।) এমন কি মোগলের দুশমন রাজপুত মারাঠারা পর্যন্ত মোগলাই খেতে আরম্ভ করল। এখনো রাজপুতনা, বরোদা, কোল্‌হাপুর রাজ্যের সরকারী

অতিথিশালায় উঠলে বাবুর্চি প্রথম দিনই শুধায় 'মোগলাই' না নিরামিষ খাবেন। আমার উপদশ—মোগালাইটাই খাবেন—তাতে করে পরজন্মে অজ শিশু হয়ে জন্মালেও আপত্তি নেই।

মোগল-পাঠানরা এই রান্না আফগানিস্থানে-তুর্কীস্থানে প্রচলিত করল। আস্তে আস্তে সেই রান্নাই তাবৎ মধ্যপ্রাচ্য ছেয়ে ফেলল। তবে যত পশ্চিম পানে যাবেন, ততই মশলার মেকদার কমে আসবে। অর্থনীতিতে নিশ্চয়ই পড়েছেন, উৎপত্তিস্থল থেকে কোনো বস্তু যত দূরে যাবে ততই তার দাম বেড়ে যায়। আফগানিস্তানের রান্নায় যে হলুদ (কাবুলীরা বলে 'জর্‌দ্‌-চোপ' অর্থাৎ হলদে কাঠ) পাবেন, ইস্তাম্বুল পর্যন্ত সে হলুদ পৌঁছয় নি।

তুর্করা বল্কান জয় করে, হাঙ্গেরি পেরিয়ে ভিয়েনার দরজায় হানা দেয়। হাঙ্গেরিতে মোগলাই মাংসের ঝোল 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশে' পরিবর্তিত হল এবং মিশরী এবং তুর্কদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভেনিসের কারবারীরা 'মিন্‌স্‌মীটের' পোলাও বা রিসোত্তো বানাতে শিখল। গ্রীস সেদিন পর্যন্ত তুর্কীর তাঁবেতে ছিল, তাই গ্রীসের পোশাকী রান্না আজও চোগা-চাপকান পরে থাকে।

পৃথিবীতে দ্বিতীয় উচ্চাঙ্গের রান্না হয় প্যারিসে কিন্তু মশলা অতি কম, যদিও ইংরিজি রান্নার চেয়ে ঢের ঢের বেশী। এককালে তামাম ইয়োরোপ ফ্রান্সের নকল করত, তাই বল্কান গ্রীসেও প্যারিসী রান্না পাবেন। গ্রীস উভয় রান্নার সঙ্গমস্থল। বাকি জীবনটা যদি উত্তম আহারাদি করে কাটাতে চান, তবে আস্তানা গাড়ুন গ্রীসে। দেশটাও বেজায় সস্তা। লঞ্চ, ডিনার, সাপার খাবেন ফরাসী, মোগলাই এবং ঘরোয়া গ্রীক কায়দায়। ভুঁড়ি কমাবার কোমরবন্দ্‌ সঙ্গে নিয়ে যাবেন—গ্রীসে এ জিনিসের বড্ড বেশী চাহিদা বলে বস্তুটা বেজায় আক্রা।

সুশীল পাঠক, স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। আপনার মনে আঁকুবাঁকু প্রশ্ন, রান্না-জগতে বাঙালীর অবদান কি?

আছে, আছে। মাছ, ছানা এবং বাঙালী বিধবার নিরামিষ রান্না।

কিন্তু তার আগে তো চীনা রান্নার বয়ান দিতে হয়। মোগলাই, ফরাসী, চীনা এই ত্রিমূর্তির বর্ণনা না করে আমি 'প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা'র প্রশ্রয় দিতে চাই নে।

আরেকদিন হবে। বৈদ্যরাজ বলেছেন, দীর্ঘজীবী হয়ে যদি বহুকাল ধরে উদরমার্গের সাধনা করতে চাও, তবে বীজমন্ত্র হচ্ছে, 'জীর্ণে ভোজনং।' অর্থাৎ হজম না করা পর্যন্ত পুনরায় আহারে বসবে না। তাও যদি না মানেন, তবে চটে গিয়ে সুকুমার রায়ের ভাষায় বলব (দোষটা তাঁর, কটুবাক্যটা তিনিই করেছেন)—

এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা
খাও তবে কচু পোড়া, খাও তবে ঘণ্টা।।

সুখী হবার পন্থা

সুখী হবার পন্থা? সর্বনাশ! সে পন্থাটা এ অধমের যদি জানাই থাকতো তবে—যাক্‌গে। ইতিমধ্যে একটা গল্প মনে পড়লো। এক ছোকরার বিয়ে করার বড় শখ। কিন্তু কিছুতেই হয়ে উঠছে না। ওদের পরিবারে একমাত্র শ্রীহনুমানের পুজো হয়—অন্য কোনো দেবতা সেখানে কল্কে পান না—তাই ত্রিসন্ধ্যা তাঁরই পুজো করে আর কাকুতি-মিনতি করে, 'হে ঠাকুর, আমার একটি বউ জুটিয়ে দাও।' ওদিকে এরকম ঘ্যানর ঘ্যানর শুনে হনুমানের পিত্তি চটে গিয়েছে। শেষটায় একদিন স্বপ্নে দর্শন দিয়ে হুঙ্কার দিলেন, 'ওরে বুদ্ধু, বউ যদি জোটাতে পারতুম, তবে আমি নিজে বিয়ে না করে confirmed bachelor হয়ে রইলুম কেন?'

তাই বলছিলুম, সুখী হবার পন্থাটা যদি আমার জানাই থাকতো তবে আমি এই টক্ দিতে যাব কেন? স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে আমি যে টক্ দিচ্ছি সেটা হয় আপনাদের আনন্দ দেবার জন্য, নয় অর্থাগমের জন্য, কিংবা উভয়ত। আপনাদের আনন্দ দেবার ইচ্ছাটা তৃষ্ণা বিশেষ এবং বুদ্ধদেব সেটাকে তন্‌হা অর্থাৎ তৃষ্ণা বলেছেন, এবং সেই তন্‌হা থেকেই সর্ব দুখের উৎপত্তি। এই তন্‌হাজনিত দুঃখ নিবারণই সুখ। আমাদের শাস্ত্রেও আছে, ভারাদ্যপগমে সুখী সংবৃতোঽহমিতিবৎ, দুঃখাভাবেন সুখিত্বপ্রত্যয়াৎ। বাঙলা কথায়, আমার ঘাড়ে বোঝা ছিল, সেটা নেবে যেতেই বললুম, আহা কি আরাম, এসো ক্ষুদিরাম ঃ আহা কী সুখ, ঘুচে গেছে দুখ। অর্থাৎ দুঃখের অভাবই সুখ বলে প্রতীয়মান হয়। তাই পরদুঃখকাতর ফরাসী গুণী ভল্‌তের এক অন্ধ মহিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লেখেন, 'Nous avons un grand subject a traiter : it sagit de bonheur on du moins d'etre le moins malheureux qu'on peut dans ce monde'.

আমাদের আলোচনার বস্তু বিপুলাকার এবং মহত্ত্বপূর্ণ ঃ প্রশ্ন এই, "সুখী হওয়া যায় কিসে, কিংবা অন্ততঃপক্ষে এ সংসারে অল্পতর দুঃখী হওয়া যায় কি প্রকারে?"

এটাকে আরো সোজা করে বলি। এক ক্ষ্যাপা ক্রমাগত মাথায় হাতুড়ি ঠুকছে। আমি শুধালাম, 'ওরে পাগল, মাথায় হাতুড়ি ঠুকছিস কেন?' এক গাল হেসে বললে, 'যখন ঠুকি না তখন কী আরাম।' সেই সংস্কৃত প্রবচনেই ফিরে এলুম, 'ঘাড়ের বোঝা নেবে যাওয়াতে কী আরাম।' মহাকবি হাইনেকে আমি বড়ই শ্রদ্ধা করি, কিন্তু এস্থলে তিনি যেটা বলেছেন সেটা আমাদের পাগলার হাতুড়ি পেটার চেয়ে অনেক ফিকে। তিনি বলেছেন, 'কড়া ঠাণ্ডায় রাত-দুপুরে লেপের তলা থেকে পা বের করাতে বেজায় শীত লাগলো। ফের পা দুখানা ভিতরে টেনে নিয়ে বলুন, আঃ কী সুখ!'

কিন্তু এরকম নেতিবাচক সুখ—অর্থাৎ দুঃখের অভাবে সুখ—এটাতে সবাই

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ!

অর্থাৎ ঋণ করেও ঘি খাও। ফেরৎ তো দিতে হবে না কারণ এ দেহ ভস্মীভূত হবে, পুনর্জন্ম তাই হতে পারে না, পুনরাগমনং কুতঃ? এখানে কিন্তু খৈয়ামের সঙ্গে তাঁর তফাৎ। খৈয়াম বার বার বলেছেন, পরের মনে কষ্ট দিয়ে সুখী হওয়া যায় না।

কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলবেন—যদিও আমি আদপেই চিন্তাশীল নই এবং আমি খৈয়ামের ফিরিস্তিতেই সুখী—কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলবেন, এ আবার কি সুখ? লোক-ব্যবহারেও দেখা যায়, 'আমি যে-সে সুখ চাইনে।'

সামান্য একটি মেয়েছেলে। বহু যুগ পূর্বে তাঁর স্বামী যখন তাঁকে বিস্তর ধন-দৌলত দিয়ে বনে যেতে চাইলেন তখন তিনি তাচ্ছিল্য করে বলেছেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম।' যা দিয়ে আমি অমৃত হব না, পাব না, সে দিয়ে আমার কি হবে?

দেখুন দিকি, মেয়েছেলের কি বায়নাক্কা! সুখ পেয়েও সুখী হতে চায় না—অথচ দেখুন চীনারা কী সুবুদ্ধিমান। লিন য়ুটাঙ বলেছেন, রাত্রের অন্ধকারে ঘরের ভিতর ঘুমিয়ে আছি। চতুর্দিকে আমার মহামূল্যবান প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। হঠাৎ শুনি একটা ইঁদুর কুট্ কুট্ করে সেগুলো কাটছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন সময় শুনি, আমার বেড়ালটা হুঙ্কার দিয়ে ম্যাও করে উঠেছে—আহ্—কি সুখ।'

কিন্তু না...ভারতবর্ষ অমৃত চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, সুখের খেলায় বেলা গেছে, পাইনি তো আনন্দ। আনন্দটা তবে কি? অমৃত। চণ্ডীদাসও বলেছেন, 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল!' এবং সুখের পরও শ্রীরাধা চেয়েছিলেন অমৃত, অমিয়া, তাই, 'অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।'

অমৃতের অত্যুত্তম বর্ণনা পেয়েছি আমি একটি শ্লোকে।

কেচিদ্ বদন্তি, অমৃতন্তি সুরালয়েসু,
কেচিদ্ বদন্তি বণিতাধরপল্লবেষু,
ব্রুমো বয়ং সকল শাস্ত্র বিচারদক্ষা
জম্বীরনীরপূরিত মৎস্যখণ্ডে॥

আহা হা! 'কেউ কেউ বলেন অমৃত আছে সুরালয়ে—মদের দোকানে। কেউ কেউ বা বলেন, না, অমৃত বণিতার অধর-পল্লবে। আর আমরা আসলে 'আমি' এখানে সম্মানার্থে বহুবচন আমরা, কারণ আমি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি—সকল শাস্ত্র বিচারদক্ষা—আমরা বলি জম্বিরনীরপূরিত—অর্থাৎ নেবু জম্বীর জামীর—সিলেটিতে—নেবু—নেবুর রসে পূরিত—ভর্তি—মৎস্যখণ্ডে! সোজা বাংলায় মাছের উপর কষে ঠেসে নেবুর রস—সেই অমৃত।

এ কবি শুধু কবি নন্—মহর্ষি, দিব্যদ্রষ্টা—কী করে সেই যুগেই জানলেন,

বাঙালদেশে এমন দিন আসবে যেদিন শুধু লক্ষপতিরাই জামাই শ্বশুরবাড়ী এলে মাছ কিনবেন। অরে ইতরজনা—আমরা কাঁটাটি পর্যন্ত পাবো না, সধবার একাদশী ভাঙবার জন্যে!

আরেকটি কথা। কালিদাস ভবভূতি পড়ে আমেজ করতে পারিনে, এঁরা কোন প্রদেশের লোক। কিন্তু যে গুণী জম্বীরনীরপূরিত মৎস্যখণ্ডকে অমৃত বলে সে নিশ্চয়ই বাঙালী। মাছের তত্ত্ব কি বিহারী, মারওয়াড়ী, গুজরাতি ব্রাদাররা জানেন?

সুখ বলুন, আনন্দ বলুন, অমৃত বলুন সেটা পাবো কোথায়। একটি মাত্র পথ নির্দেশ করি।

মহাকবি গ্যোটে বলেছেন,

দূরে দূরে তুমি কেন খুঁজে মরো?
সুখ তো আছে হাতের কাছে,
শিখে নাও শুধু তারে ধরিবারে,
সুখ সে তো রয় সদা কাছে কাছে!

Wilst du immer weiter schweifen?
Sieh, das Gute liegt so nab.
Lerne nur das Gluck ergreifen,
Denn das Gluck ist immer da?

আর আমাদের প্রতিবেশী বাঙালী লালন ফকীর বলেছেন,

হাতের কাছে পাইনে খবর
খুঁজতে গেলাম দিল্লী শহর! *

---

* আকাশবাণীর বেতার কথিকা

গ্রীকের উত্তরাধিকারী লাতিন। লাতিন তার অনুপ্রেরণা, প্রাণরস, কলা সৃষ্টির আদর্শ ও তাকে মৃন্ময় করার পদ্ধতি সব কিছুই নিয়েছে গ্রীক থেকে। বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যও সংস্কৃতের এতখানি পদাঙ্ক অনুগমন করেনি। বরঞ্চ বলবো উর্দুর সঙ্গে ফার্সীর যে সম্পর্ক লাতিনের সঙ্গে গ্রীকের তাই। অহমিয়ারা যদি রাগ না করেন তবে বলবো, বাঙলা ও অহমিয়ার মধ্যে ঐ সম্পর্ক বিদ্যমান, যদিও বাঙলার মৃত্যু হওয়ার পর অহমিয়া তার উত্তরাধিকারী হয়নি—বাঙলা তার উৎকর্ষের এক বিশেষ চরম স্তরে পৌঁছনর পর অহমিয়া রসসৃষ্টিতে বাঙলা সাহিত্যকে তার আদর্শরূপে ধরে নেয় (এখানে বুরুঞ্জী বা দলিলদস্তাবেজের গদ্যের কথা হচ্ছে না)।

বহুশত বৎসর ধরে লাতিন পাশ্চাত্ত্য ভূমির সর্ব চিন্তা সর্ব অনুভূতির মাধ্যম ছিল। এমন কি লাতিনের উত্তরাধিকারী ইতালীয়, ফরাসী, স্প্যানিশ ইত্যাদি ভাষা পূর্ণ সমৃদ্ধি পাওয়ার পরও—এমন কি গত শতাব্দীতেও ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা যখনই চেয়েছেন যে তাবৎ ইয়োরোপ তাঁদের রচনার ফললাভ করুক তখনই তাঁরা আপন আপন মাতৃভাষা—জর্মন, ফরাসী ইত্যাদিতে না লিখে লিখেছেন লাতিনে। ইবন খলদূনের (ইনি মার্কসের বহু পূর্বে ইতিহাসের অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন) আরবী পুস্তকের অনুবাদক মাতৃভাষা ব্যবহার না করে খলদূনের 'মোকদ্দমা'—'প্রলেগমেনন' অনুবাদ করেছেন লাতিনে। এ শতাব্দীতেও জালালউদ্দীন রুমীর ফার্সী থেকে ইংরিজিতে তর্জমা করার সময় ইংরেজ তথাকথিত অশ্লীল অংশগুলো অনুবাদ করেছেন লাতিনে—উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল অপ্রাপ্তবয়স্কের হাতে এ-বই পড়লে তারা যেন বুঝতে না পারে।

খাস লাতিনের জন্মভূমি ও লীলাস্থল যদিও ইতালীতে এবং ইতালীয় সাহিত্যের অতি শৈশবস্থায়ই দান্তের মত অতুলনীয় মহাকবির আবির্ভাব, তবু কার্যত দেখা গেল লাতিনের অন্য উত্তরাধিকারী ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য যেন তাকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। তার অন্যতম কারণ অবশ্য এই হতে পারে যে, ইতালীয়রা তখন শুধু সাহিত্য নয়, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারুশিল্পেও আপন সৃজনী শক্তির বিকাশ করছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্যারিস ক্রমে ইয়োরোপের কলাকারদের মক্কা হয়ে দাঁড়ায়। ঐ সময় রুশের তুর্গেনিয়েফ, জর্মনির হাইনে, পোলাণ্ডের শপাঁ, এমন কি ইতালীর রস্‌সিনি এঁরা সকলেই প্যারিসে বসবাস করতেন।

এর পর ফরাসীতে বলা হয় ফ্যাঁ দ্য লিয়েক্‌ল্‌—'শতাব্দীর সূর্যাস্ত'।

দা'নুন্‌দ্‌জিয়ো খ্যাতিলাভ করেন ঐ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে—কবি,

ঔপন্যাসিক, নাট্যকার রূপে এবং কর্মযোগী ফিউমের 'রাজা' রূপে তিনি খ্যাতির চূড়ান্তে ওঠেন ১৯১৯-এ, অর্থাৎ আমাদের শতাব্দীতে। আরবী ভাষায় এঁদের বলা হয় 'জু অল্ করনেন'—'দুই শতাব্দীর অধিপতি'।

বহু রাগরঙ্গে রঞ্জিত বৈচিত্র্যপূর্ণ এর জীবন। ইস্কুলে থাকাকালীনই তিনি তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে রোমে এসে ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্য তিন ক্ষেত্রেই তিনি অতুলনীয় বলে স্বীকৃত হলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি পদাতিক নৌবাহিনী ও বিমানবহরে সর্বদাই সমান খ্যাতি অর্জন করেন। বিশেষ করে বিমান চলাচল। আজ যেটাকে স্টান্ট্ ফ্লাইং বলা হয়, তার প্রধান পথপ্রদর্শক দা'নুন্দ্জিয়ো। অমর খ্যাতির জন্য তাঁর এমনই অদম্য প্রলোভন ছিল যে, তার জন্য তিনি সর্বদাই প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তারপর মিত্রশক্তি যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফিউমে বন্দরকে ইতালী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইলেন, তখন কবি দা'নুন্দ্জিয়ো তাঁর ক্ষুদ্রতম রূপ ধারণ করলেন। ফিউমে বন্দর দখল করে তিনি সেখানে এক রাজ্য স্থাপনা করে নিজেকে 'অধিপতি' রূপে ঘোষণা করলেন। কবি, শ্রমিক, নেতা তিন রূপেই তিনি স্বপ্রকাশ হলেন। মাত্র ১৫ মাস তিনি সেখানে 'রাজত্ব' করেছিলেন বটে, কিন্তু ইতালীর লোক আজও তাঁকে 'ফিউমের বীর', জাতির গর্বরূপে স্বীকার করে।

প্রেমের জগতেও দা'নুন্দ্জিয়ো অভূতপূর্ব কীর্তি রেখে গেছেন। লোকে বলে, তিনি নাকি একসঙ্গে পাঁচটি রমণীর সঙ্গে প্রেম করতে পারতেন। একই সঙ্গে পাঁচসেট প্রেমপত্র লিখেছেন (কু-লোক বলে, সেক্রেটারীকে ডিক্টেট করতেন) এবং প্রত্যেক সেটই একেবারে অরিজিনল, অন্যান্য সেট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'লে ভের্জীনি দেল্লে রক্কে' 'গিরি-কুমারীত্রয়'-এ। সেখানে উপন্যাসের নায়ক কিছুতেই মনস্থির করতে পারছেন না, তিন নায়িকা, আনাতোলিয়া, ভিয়োলান্তে, মাস্সিমিল্লা, কাকে তিনি বরণ করবেন। এ উপন্যাসটি পড়ে আমার মনে হয়েছিল, তাঁর পক্ষে একই সময়ে এই তিনজনকে তিন ধরনের প্রেমপত্র লেখা মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ এই তিন বোনের চরিত্র তিনি এমনই অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন, দৃঢ় রেখায় অঙ্কন করেছেন যে, প্রত্যেকটি চরিত্র আপন মহিমায় স্ব-প্রকাশ। তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তিন ধরনের প্রেমপত্র লেখা চারুশিল্পী দা'নুন্দ্জিয়োর পক্ষে অসম্ভব তো নয়ই, খুবই সহজ বলতে হবে।

দা'নুন্দ্জিয়ো চরিত্র বুঝতে ভারতবাসীর খুব অসুবিধা হয় না। কিছুদিন পূর্বেও আমরা পরাধীন ছিলুম। আমরা যদি হটেনটট বা বণ্টুর মত ঐতিহ্য সভ্যতা সংস্কৃতিহীন জাত হতুম, তা হলে আমাদের অপমানবোধের বেদনা এতখানি নির্মম হত না। ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্লে ইতালী স্বাধীন বটে, কিন্তু সে তখন তার গৌরবময় নেতার আসন ছেড়ে দিয়েছে ফ্রান্স, জর্মনি, ইংলন্ডকে। এমন কি যে অন্নবস্ত্র সমস্যা তাকে

তখনো (এখনো) কাতর করে রেখেছে, ঐতিহ্যহীন সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ততদিনে সমাধান করে ফেলেছে। জাত্যাভিমানী স্পর্শকাতর ইতালীয় মাত্রই যখন দেখত প্রতি বৎসর হাজার হাজার ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন তার প্রাচীন কীর্তিকলা দেখবার জন্য রোম, নেপল্‌স্‌ ভেনিস পরিক্রমা করে, গ্যোটে বায়রন কেউই বাদ যান না[১] এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখে ছিন্নবস্ত্র, নগ্নপদ আপন ইতালীয় ভ্রাতা এঁদের কাছে ভিক্ষা, চাইছে, তখন ঐতিহ্যচেতন ইতালিয়ার মরমে মরাটা হৃদয়ঙ্গম করা কি আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন? দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো তাঁর দেশকে ভালোবাসতেন শুধু তার পূর্বগৌরব, প্রাচীন ঐতিহ্যের জন্যই নয়, তাঁর সদাজাগ্রত পঞ্চেন্দ্রিয় অহরহ তাঁকে সচেতন রাখতো দেশের অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে। ভেনিস দেখে বহু দেশের বহু কবি আপন মাতৃভাষায় তার প্রশস্তি গেয়েছেন, কিন্তু দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়োর উপন্যাস 'ইল্‌ ফুয়োকো'—'অগ্নিশিখা', 'ফ্লেম অব লাইফ'-এ—তাঁর যে বর্ণনা এবং দরদবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, সে জিনিস ইতালীয় সাহিত্যে অতুলনীয় তো বটেই, অন্য সাহিত্যেও আছে কি না সন্দেহ—অন্তত আমার চোখে পড়েনি।

ইয়োরোপে রেনেসাঁস যাঁরা আনয়ন করেন, তাঁদের শেষ প্রতিভূ দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো। মাঝখানে কত শত বৎসরের ব্যবধান তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়—এবং যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, তাঁরা বলেছেন তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হত—তিনি কি স্বচ্ছন্দে রেনেসাঁস সৃষ্টিকর্তা অতিমানবদের মধ্যে বিচরণ করেছেন। ওদিকে তিনি নিজেও মনে করতেন যে, তিনি প্রাচীন গ্রীক ক্লাসিকসের পরবর্তী পুরুষমাত্র। একটি ফোয়ারার বর্ণনা দিতে গিয়ে দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো সে ফোয়ারার পাথরে খোদাই কতকগুলি লাতিন প্রবাদ তুলে দিয়েছেন। লাতিন অনেকখানি পড়া না থাকলে এরকম একটি

---

১ এবং এ যুগে—

ইটালিয়া

কহিলাম, "ওগো রাণী,
কত কবি এল চরণে তোমার উপহার দিল আনি।
এসেছি শুনিয়া তাই,
ঊষার দুয়ারে পাখির মতন গান গেয়ে চলে যাই।

রবীন্দ্রনাথ, পূরবী॥

পক্ষান্তরে ইতালীয় কবি ফিলিকাজা গেয়েছেন—

ইতালি, ইতালি! এত রূপ তুমি
কেন ধরেছিলে, হায়!
অনন্তক্লেশ লেখা ও-ললাটে
নিরাশার কালিমায়।

সত্যেন দত্তের অনুবাদ।

(Italia, Italia, o tu cui feo la sorte)

অনবদ্য সঙ্কলন অসম্ভব।

কর্ ত্বরা, ওগো,
তোল্ ফুলগুলো
ভরা মধু গন্ধে।
পলাতকা ঐ
মুহূর্তগুলির
পরা নীবিবন্ধে॥

PRAECIPTATE MORAS.,
VOLUCRES GINGATIS,
UT HORAS NECTITE FORMOSAS, MOLLIA SERTA, ROTAS.

Hasten, hasten ! Weave garland of fair roses to girdle the passing hours.

সেই ফোয়ারার জল নিচের আধারে জমেছে; সে বলছে ঃ—

জীবন সলিল
পান করিবে কি?
এ যে বড় মধুভরা—
আঁখিজলে করো
লবণসিক্ত
তবে হবে তৃষা-হরা॥

FLETE HIC OPTANTES, NIMIS EST ACQUA DULCIS, AMANTES SHLSUS, UT APTA VEHAM, TEMPERE HUMOR EAM.

Weep here, ye lovers who come to slake your thirst. Too sweet is the water. Season it with the salt of your tears.

গ্রীক এবং লাতিন থেকে তিনি নিয়েছিলেন তাঁর ভাষার অলঙ্কার। আজ যদি বাঙলাতে কেউ পদে পদে কালিদাস আর শূদ্রকের মত উপমা ব্যবহার করতে পারেন এবং সে তুলনাগুলো এযুগের বাতাবরণেরই—কারণ দা'ন্নুন্দ্জিয়ো ক্লাসিক্সে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও নিঃশ্বাস নিতেন বর্তমান যুগের আবহাওয়া থেকে—তা হলে তাঁর সঙ্গে দা'ন্নুন্দ্জিয়োর তুলনা করা যাবে। এ যুগের লেখকদের মধ্যে প্রধানত নীচ্শে, শোপেনহাওয়ার, দস্তয়েফস্কি এবং সুরকারদের মধ্যে ভাক্নার তাঁর উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

তাই একদিক দিয়ে দেখতে গেলে 'অতিমানব', 'সুপারম্যান' বা 'য়্যুবারমেনশের' যে ধারণা ফিষটে দিয়ে আরম্ভ হয় এবং কার্লাইল মাদ্জীনি হয়ে নীচ্শেতে পৌঁছয়—যার সাহায্যকারী ছিলেন ট্রাইশকে, কিপলিং, হাউস্টন, চেম্বারলেন

এবং বের্গসোঁ—দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো এঁদেরই একজন। এঁরা সকলেই যে সুপারম্যান চেয়েছেন তা নয়, কেউ কেউ চেয়েছেন, সুপাররেস—শ্রেষ্ঠ জাতি, যেমন হিটলার চেয়েছিলেন 'হেরেন-ফল্‌ক্‌', 'প্রভুর জাত'—কেউ কেউ চেয়েছেন সুপারস্টেট।

রাসল্‌ বলেন, 'তবু ফিষটে, কার্লাইল, মাদ্‌জীনিতে মুখের মিষ্টি কথায় কিছুটা নীতির দোহাই আছে, কিন্তু নীচ্‌শেতে এসে তাও নেই।'[২] সেখানে উলঙ্গ রুদ্ররূপে 'সুপারম্যানে'র আপন শক্তি সঞ্চয়ই সর্বপ্রধান কর্তব্য, স্বধর্ম'। হিটলারের গ্যাস চেম্বার তারই এক কদম পরে।

আমার মনে হয়, দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো এসব কট্টরের সমধর্মী নন। তাঁর ভিতরকার আর্টিস্টই বোধ হয় তাঁকে সে বর্বরতা, নৃশংসতা থেকে বাঁচিয়েছে। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যে রসিক প্রতি মুহূর্তে পঞ্চভূতকে নিঃশেষে শোষণ করেছে, যার রচনার প্রতিটি ছত্রে প্রতিটি শব্দে রূপরসগন্ধস্পর্শধ্বনির সমাবেশ, তুলনাব্যঞ্জনা মধুরতম সামঞ্জস্য যার অব্রণ-নিটোল-সুডৌল নির্মাণ পদ্ধতিতে—সে সৃষ্টিকর্তাকে কোনো বিশেষ পর্যায়ে ফেলা যায় না।

দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়োর সৃষ্টিতে আমি যদি কোনো ত্রুটি লক্ষ্য করে থাকি, তবে সেটা মাধুর্যের অতিরিক্ততায়—'কাদম্বরীতে' যে-রকম।।[৩]

নস্‌রুদ্দীন খোজা (হোকা)

ইস্তাম্বুল থেকে রয়টারের খবরে প্রকাশ, রসিক এবং মূর্খ-চূড়ামণি নস্‌রুদ্দীন খোজার সপ্তশত জন্মদিবস মহা-আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

ইংরিজি বর্ণমালার কল্যাণে খোজা কিন্তু বাঙলায় 'হোকা' রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অধুনা তুর্কী ভাষা ইংরিজি (লাতিন) হরফে লেখা হয় বলে তার রূপ hoca; কিন্তু তুর্করা 'এচ' অক্ষরের নিচে একটি অর্ধচন্দ্র বা উল্টো প্রথম বন্ধনী দেয় এবং তার উচ্চারণ অনেকটা স্কচ 'লখ্‌', জর্মন 'বাখ্‌' বা ফার্সী' 'খবরের' মত,—কিন্তু 'হ' ভাগটা বেশী এবং 'সি' অক্ষরের উপরে একটি হুক্‌ দেয়—এবং তার উচ্চারণ হয় পরিষ্কার 'জ'। ঠিক সেই রকম বাঙলা শব্দ (আসলে আরবী) 'খারিজ' তুর্কী ভাষায়

২ বার্ট্রান্ড রাসল্‌—দি এনসেস্ট্রী অব ফ্যাসিজ্‌ম্‌।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, 'দেবপ্রিয়', 'বিধিদত্ত', 'সকলের সেরা জাতের' ধারণা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ইহুদিরাই সৃষ্টি করে। সে ধারণার দলিলে বাইবেল ভর্তি। খৃষ্ট তার প্রতিবাদ করেন।

৩ প্রিন্স গ্রাবিয়েলে দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়ো—১২ই মার্চ, ১৮৬৩—১লা মার্চ, ১৯৩৮।

haric লেখা হয়,—অবশ্য 'হ'-এর নিচে পূর্বোল্লিখিত অর্ধচন্দ্র এবং 'সি'-র উপরে হুক্ দেয়। 'পররাষ্ট্রনীতি' তাই তুর্কীতে সিয়াসত খারিজ।'

রয়টারের টেলিগ্রামে এই অর্ধচন্দ্র ও হুক্ বাদ পড়াতে 'খোজা' 'হোকা' হয়ে গিয়েছেন। খাজা নাজিমুদ্দিনের 'খাজা' ও আগা খানের 'খোজা' (সম্মানিত) সম্প্রদায়ের নামেও একই শব্দ—এটি আমাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়।

এই ধ্বনি পরিবর্তনে আমাদের রাগত হওয়ার কারণ নেই। ক্রিকেটার মাঁকড়ের নাম যখন আমরা হামেশাই 'মনকদ', 'মানকদ' অনেক কিছুই লিখে থাকি, এবং ফড়্কর্-কে 'ফাদকার' 'ফদকর' লিখি, এমন কি এই কলকাতা শহরেই গোখলে-কে 'গোখেল' লিখি এবং উচ্চারণ করি তখন রসিকবর খোজা যে হোকা হয়ে আমাদের ধোঁকা দেবেন তাতে আর আশ্চর্য কি?

খোজার জন্মদিন যে-বাইশ তারিখে উদ্‌যাপিত হচ্ছিল সেইদিনই ইস্তাম্বুল থেকে রয়টার আরেকটি তার পাঠিয়েছেন; তাতে খবর এসেছে যে ঐ দিন পাঁচ শ' বছর পরে তুর্কীতে এক সুপ্ত অগ্নিগিরি জেগে উঠে হা হা করে হেসে উঠেছে।[১]

তা হলে বোঝা গেল মা ধরণীর পাকা দু'শ বছর লেগেছে খোজার রসিকতা মর্ম গ্রহণ করতে; তাই বোধ হয় হাসতে তাঁর নাড়িভুড়ি এখন ভূগর্ভ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়েছে!

এদেশে আরবী এবং ফার্সীর চর্চা একদা প্রচুর হয়েছিল। আকবর বাদশাহের আমলে ইরানের এমনই দুরবস্থা যে সেখানকার পনেরো আনা কবি দিল্লী ধাওয়া করেছিলেন। আকবরের সভাকবি আব্দুর রহিম খানখানা নিজেই গণ্ডা গণ্ডা ইরানি কবি পুষেছিলেন, আর স্বয়ং আকবর যে কবি 'আমি' 'তুমি' মিল দিয়ে 'কবিতা' রচনা করতো তাঁকে পর্যন্ত নিরাশ করতে চাইতেন না।

ভারতবর্ষের ফার্সী নাম হিন্দ বা হিন্দুস্তান। 'হিন্দ' শব্দের অর্থ কালো। তাই এক কবি তাঁর দৈন্যের কালরাত্রি ইরানে ফেলে পূর্বাচল ভারতবর্ষ রওয়ানা হওয়ার সময় লিখলেন,

দুর্ভাবনার কালিমা ত্যজিয়া
চলিনু হিন্দুস্তান
কালোর দেশেতে কালো আমি কেন
করিতে যাইব দান?

---

১ VOLCANIC ERUPTION AFTER FIVE CENTURIS

Istanbul, July 22.–Mount Soutlubiyan in the Kars Province of Turkey has burst into what is believed to be Turkey's first volcanic eruption since the 15th century. A spokesman at the office of the Governor of Kars said the eruption of rock and smoke had caused anxiety and excitement among people living nearby but there had been no serious damage yet.

তাই এক ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিক ইরানের ঐ যুগকে শব্দার্থে 'ইন্ডিয়ান সামার' বলেছেন। কারণ এর পরই ইরানি সাহিত্যের পতন আরম্ভ হয়।

তুর্কী-ভাষার কিছুটা চর্চাও এদেশে হয়েছিল, কারণ বাবুর, হুমায়ুন এদের সকলেরই মাতৃভাষা তুর্কী। শেষ মোগল বাদশা-সালামৎ বাহাদুর শাহের হারেমেও কথাবার্তা তুর্কী ভাষাতেই হত এবং তুর্কী সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট না হলেও অন্যতম অত্যুৎকৃষ্ট কেতাব বাবুর বাদশার আত্মজীবনী। কিন্তু এ-তুর্কী ভাষা মুস্তফা কামালের টার্কির ওসমানালি তুর্কী নয়, বাবুরের ভাষা চুগতাই (বা জগতাই) তুর্কী। কোরমা, দোলমা এবং লড়াই-হাতিয়ারের কিছু শব্দ চুগতাই তুর্কী থেকে বাঙলাতে এসেছে। ওদিকে মোগল দরবার ফার্সীকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন বলে তাঁদের তুর্কী এদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করেনি। যদিও প্রাচীন বাঙলাতে 'তুর্ক' বলতে মুসলমান বোঝাতো এবং তামিল ভাষাতে মুসলমান বোঝাতে হলে এখনও 'তুরুক্কম্' শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাঙালী বেকার এখনো চাকরির সন্ধানে 'তুর্কী নাচন' নাচে।

আমরা ইংরিজি ফরাসী পড়ি, রাশান কথাসাহিত্যও আমাদের অজানা নয়। স্পেন পর্তুগাল দেনমার্কের লোক এদেশে এসেছিল এবং আরো অনেকেই,—কিন্তু আশ্চর্য ওসমানালি তুর্কী ভাষা এবং সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের কণামাত্র পরিচয় নেই। আমার জানামতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পাবনা জেলার কবি ইসমাঈল হুসেন শিরাজী (নজরুল ইসলাম এঁর কাছে একাধিক বিষয়ে ঋণী বলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন) তুর্কীকে সাহায্য করার জন্য একটি মেডিকেল মিশন নিয়ে সেদেশে গিয়েছিলেন এবং তুর্কী রাজনীতি, সমাজ, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বাঙলায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তুর্কীর সভাকবি হামিদ পাশার সঙ্গে সে সময়ে তাঁর হৃদ্যতা হয়, কিন্তু তুর্কী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার পরিচয় করিয়ে দেবার পূর্বেই ইংরেজের চাপে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়।[২]

তুর্কীর বাইরে ইরান আফগানিস্থান, উজবেক আজারবাইজান, তথা গ্রীস,

---

২. 'সুপ্রভাত' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রকে (ইনি 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দের মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের বড় মেয়ে) শিরাজী একটি কবিতা ও ছবি পাঠালে পর তিনি (কুমুদিনী) লেখেন, "আপনার কবিতা ও ছবি পাইয়া আমি পরম পুলকিত হইয়াছি। আপনার কবিতাটি 'সুপ্রভাতে' প্রকাশিত হইবে। তুরস্কের নারীদিগের অতীত ও বর্তমান অবস্থা, স্বদেশের কার্যে ও উন্নতিতে তাহাদের সাহায্যদান, তাহাদের শিক্ষা ও স্বদেশ-প্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখা শীঘ্রই অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল যুবক আহতদিগের সেবার জন্য তথায় গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্যের বিবরণ লিখিবেন।"

বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৫৭।

বুলগারিয়া রুমানিয়া ইত্যাদি দেশে নস্‌রুদ্দীন খোজা সুপরিচিত। ইরানের স্বর্ণযুগের একাধিক সুরসিক কবির উপর তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট। বল্কানের বাইরে ইয়োরোপে তিনি জর্মনিতে সবচেয়ে বেশী ভক্ত পাঠক পেয়েছেন। ইংরিজি এনসাইক্লোপীডিয়াতে তাঁর নাম নেই, জর্মন সাইক্লোপীডিয়া আকারে ইংরিজির অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও সেটাতে তাঁর সম্বন্ধে কয়েক ছত্র আছে। আর একাধিক অনুবাদ জর্মন ভাষাতে তো আছেই। অবশ্য আজকের দিনের রুচি দিয়ে বিচার করলে তাঁর বহু জিনিস শুধু কুট্টনীরসাশ্রিত লাতিনেই অনুবাদ করা হয়।

খোজার জীবনী নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার উপায় নেই। কারণ তাঁর জীবন ও তাঁর হরেক রকমের রসিকতা এমনই জড়িয়ে গিয়েছে যে তার জট ছাড়ানো অসম্ভব। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত দু'আনা পরিমাণ কিংবদন্তী বিশ্বাস করলে আমাদের কালিদাস সম্বন্ধে প্রচলিত সবকটাই বিশ্বাস করতে হয়। এমন কি তিনি পাঁচ শ' না সাত শ' বছর আগে জন্মেছিলেন সেই সমস্যারই চূড়ান্ত সমাধান এযাবৎ হয়নি। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে খোর্তো গ্রামে তাঁর জন্ম, সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং আক্‌শেহিরি তাঁর মক্‌বরহ্‌ বা সমাধিসৌধ দেখানো হয়। ইনি যে সুপণ্ডিত এবং সুকবি ছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কারণ ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকলে 'ইমাম' (ইংরিজিতে অন্ততপক্ষে বিশপ) হওয়া যায় না। অন্যান্য একাধিক ব্যাপারেও তিনি সমাজের অগ্রণীরূপে তুর্কী এবং তুর্কীর বাইরে সুপরিচিত ছিলেন।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাঁর নামে প্রচলিত গল্পের কটি তাঁর নিজস্ব কটি উদোর শির্‌নি বুধোর দর্গায় সে-বিচার অসম্ভব। দেশবিদেশের পণ্ডিতগণ হার মেনে বিক্রমাদিত্যের নামে প্রচলিত গল্প যে 'বিক্রমাদিত্য সাইকেল', খৈয়ামের নামে চলিত-অচলিত চতুষ্পদী 'খৈয়াম চক্র' নামে অভিহিত করেছেন ঠিক সেইরকম এখন খোজার নামে লিখিত, পঠিত, শ্রুত গল্পকে 'খোজা চক্র' নাম দিয়ে দায়মুক্ত হন। কিন্তু গল্পগুলো বিশ্লেষণ করে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে তার অনেকগুলোই আরবভূমি, প্রাচীন ইরান ও ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছে। সিরিয়াক এবং প্রাচীন বল্কানেও এর অনেকগুলো প্রচলিত ছিল। অবশ্য এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সে-সব বাদ দিলেও খোজার তহবিলে প্রচুর হাস্যরসের উপাদান উদ্বৃত্ত থেকে যায়। এবং তার চেয়েও বড় কথা—সুখে-দুঃখে, উৎসবে-ব্যসনে, মসজিদে-সরাইয়ে, বাজারে-বৈঠকখানায় খোজা যে ভাবে তাঁর গল্পে, আচরণে, ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন তারই একটি অতি সুস্পষ্ট হাস্যময় সদানন্দ, দরদী ছবি তুর্কীদের বুকের ভিতর আঁকা। আজ যদি বেহশ্‌ৎ থেকে ফিরিশ্‌তা (দেবদূত) ইস্তাম্বুলে নেমে বিশ্বজনের কাছে সপ্রমাণ করে যান যে ইমাম নস্‌রুদ্দীন্‌ খোজা নামক কোনো ব্যক্তি এ ধরায় জন্মগ্রহণ করেননি তবুও তুর্কীর লোক অচঞ্চল চিত্তে সেই তসবীরই ধারণ করবে, বিদেশীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে এবং যদি সেখানে একাধিক তুর্ক উপস্থিত

থাকে, এবং আপনি যে খোজাকে চেনেন না সে-কথা বুঝতে পারে তবে আপসে পাল্লা লেগে যাবে কে কত বেশী খোজার গল্প বলতে পারে। এদেশে যেমন বিস্তর রবীন্দ্রভক্ত আছেন যাঁরা প্রত্যেক ঋতু পরিবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপরসগন্ধস্পর্শ বিবর্তন রবীন্দ্রনাথের কোনো না কোনো গান, বা একাধিক গান দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন, ঠিক তেমনি জীবনের সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, দুর্ঘটনা, লটারি লাভ—সব কিছুই খোজার কোনো না কোনো গল্প দিয়ে রসরূপে প্রকাশ করা যায়। কারণ খোজা শুধু এলোপাথাড়ি রস সৃষ্টি করে যাননি—তার মারফত খোজার পরিপূর্ণ জীবনদর্শন বা 'ভেল্টআনশাউঙ' পাওয়া যায়।

খোজার গল্প তিন রকমের। সহজেই অনুমান করা যায়, তিনি যেখানে চালাকি করে অন্যকে বোকা বানাচ্ছেন, কিম্বা মারাত্মক উত্তর দিয়ে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র করছেন তার সংখ্যা বেশী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এস্তের গল্প আছে যেখানে তিনি একটি পয়লা নম্বরের ইডিয়েট, গাড়লস্য কুৎব্ মিনার। এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে বোঝা যায় না তিনি বোকা না আমরা বোকা।

যেমন মনে করুন, খোজাকে অমাবস্যার রাতে শুধানো হল পূর্ণিমার চাঁদ গেল কোথায়? খোজা এক গাল হেসে উত্তর দিলেন, 'তাও জানো না, পূর্ণিমার চাঁদকে প্রতি রাত্রে ফালি ফালি কেটে নেওয়ার পর এখন সেগুলা গুঁড়ো করে আকাশের তারা করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

খোজা বোকা বনতে চান, না বানাতে চান?

অবশ্য খোজার গীতিরস বা লিরিকরস অসাধারণ ছিল। এই কবিত্বময় ব্যাখ্যাটি দিয়ে তিনি যে গীতিরস সৃষ্টি করতে চাননি, বা যে-সব কবি অসম্ভব অসম্ভব তুলনা দিয়ে কাব্যরস সৃষ্টি করতে চান তাদের নিয়ে মস্করা করতে চাননি এ-কথা বলা কঠিন। কারণ আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রেও আছে,—

'প্রিয়ে, আকাশে চন্দ্রের মুখ দেখে
মনে হল তোমার মুখ,
তাই আমি চাঁদের পিছনে পিছনে ছুটছি।'

এ ধরনের তুলনাকে 'অসম্ভব তুলনা' বলে আলঙ্কারিক দণ্ডিন্ কাব্যাদর্শে নিন্দা করেছেন। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে এতে হাস্যরসের অবতারণা হওয়া বিচিত্র নয়। কথা নেই, বার্তা নেই, একটা লোক যদি চাঁদের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ খোয়াই ভাঙা মাঠ-ময়দান ভেঙে ছুটতে আরম্ভ করে বলতে থাকে, 'ঐ আমার প্রিয়া', 'ঐ আমার প্রিয়া', তাহলে পাড়ার ডন্ জোয়ানদেরও হেসে ওঠা অসম্ভব নয়।

তবু না হয় মেনে নেওয়া গেল, চাঁদকে গুঁড়ো করে খোজা ইচ্ছা করেই বোকা বনেছেন। কিন্তু এখন যেটা বলছি সেটাতে খোজা কি?

দোস্তের বাড়ির দাওয়াতে খোজা খেলেন এক নতুন ধরনের মিশরী কাবাব। অতি সযত্নে এক টুকরো কাগজে লিখে নিলেন তার রেসিপি কিংবা পাকপ্রণালী কিংবা যাই বলুন। ততোধিক সযত্নে, ব-তরীবৎ সেটি রাখলেন জোব্বার ভিতরে গালাবিয়ার বুকপকেটে। রাস্তায় বেরিয়েই গেলেন তাঁর প্যারা কসাইয়ের দোকানে। আজ সন্ধ্যায়ই গিন্নীকে শিখিয়ে দেবেন কি করে এই অমূল্যনিধি রাঁধতে হয়। আর খাবেনও পেট ভরে। বন্ধুর বড়িতে মেকদারটা একটু কম পড়েছিল। গোশ্‌ৎ কিনে খোজা রাস্তায় নামলেন।

হঠাৎ চিল এসে ছোঁ মেরে মাংস নিয়ে হাওয়া।

খোজা চিলের পিছনে ছুটতে ছুটতে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে চিলকে বলতে লাগলেন, 'আরে কোরছ কি? শুধু মাংসটা নিয়ে তোমার হবে কি? রেসিপিটা যে আমার পকেটে রয়ে গেছে। কী উৎপাত! দাঁড়াও না—'

কিন্তু এভাবে গল্পের পর গল্প বলতে থাকলে খোজার সম্পূর্ণ গ্রন্থ নকল করে দিতে হয়। সম্পাদক আপত্তি জানাবেন।

এবারে তাহলে যে ধরনের গল্পের জন্য খোজা সুপ্রসিদ্ধ তারই একটি নিবেদন করি।

কথিত আছে, একদা খোজা জন্মভূমি তুর্কীর প্রতি বিরক্ত হয়ে দেশত্যাগ করে ইরান দেশে চলে যান। এতে আশ্চর্য হবার মত কিছুই নেই! কারণ খোজা ছিলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন পরোপকারী—আমাদের বিদ্যাসাগরের মত দাগা খাওয়া বিচিত্র নয়।

তা সে যাই হোক,—লোকমুখে ইরানের রাজা সে খুশ-খবর শুনে বে-এক্তেয়ার। তড়িঘড়ি লোকলশ্‌করসহ উজীর-ই আলোকে পাঠিয়ে দিলেন খোজাকে পরম যত্ন সহকারে রাজদরবারে নিয়ে আসতে। খোজা আসামাত্র তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান ত্যাগ করে বাদশা তাঁকে আলিঙ্গন করে পাশে বসালেন। মাথায় সোনার তাজ পরিয়ে দিলেন, গায়ে কাশ্মীরী শাল জড়িয়ে দিলেন, কোমরবন্ধে দমশ্‌কী তলওয়ার ঝুলিয়ে দিলেন। চতুর্দিকে জয়জয়কার।

সভাভঙ্গের পর বাদশা নিভৃতে ইতি-উতি করে, আশ-কথা পাশ-কথা পাড়ার পর অতি সন্তর্পণে তাঁর জাগীরের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। খোজা করজোড়ে সে কি শাহ্‌-ইন-শাহ্‌, আপনার যে পূত পবিত্র...ইত্যাদি[৩] বলে তিনি নিবেদন করলেন, রাজসম্মানই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

বাদশাহ্‌ বিস্তর চাপাচাপি করার পর খোজা বললেন, 'হুজুরের যখন নিতান্তই এ হেন বাসনা তবে হুকুম জারি করে দিন, কাল সকাল থেকে যারা বউকে ডরায়

---

৩. ইরানে বাদশার সামনে কোন্‌ মন্ত্র দিয়ে নিবেদন আরম্ভ করতে হয়, তার পুরা বিবরণের জন্য 'দেশে-বিদেশে' অধ্যায় পশ্য।

তারা আমাকে একটি করে ডিম প্রতি সকালে দেবে।'

দীন-দুনিয়ার মালিক বাদশা তো তাজ্জব। 'ওতে আপনার কি হবে? আমি খবর পেয়েছি, আপনি দান-খয়রাতে দাতাকর্ণ।'

খোজা এলবুর্জ পাহাড়ের মত অচল অটল। তবে তাই সই। ইরানী ভাষায় বলতে গেলে আলোচনার কার্পেট তখন রোল্ করে গুটিয়ে ঘরের কোণে খাড়া করে রেখে দেওয়া হল।

পরদিন ফজরের নামাজের সময় থেকেই হৈ-হৈ রৈ-রৈ। এস্তেক রাজবাড়িতেও মমলেট-অমলেট নেই। কি ব্যাপার? যাদের বাড়িতে মুর্গী নেই তারা ফজরের আজানের পূর্বে ছুটেছে বাজার পানে। ডিম কিনে ধাওয়া করেছেন খোজার ডেরার দিকে।

সেখানে ডাঁই ডাঁই হুদো হুদো আন্ডার ছয়লাপ! আন্ডার নবীন ব্রহ্মাণ্ড।

পাইকিরী ব্যবসায়ীরা চতুর্দিকে বসে।

সাতদিন যেতে না যেতে খোজা ঢাউস তেতলা হাওয়া-মঞ্জিল হাঁকালেন। পক্ষাধিককাল মধ্যেই বোখারার কার্পেট, সমরকন্দের রেশমী তাকিয়া, মুরাদাবাদী আতরদান, গোলাপ-পাশ, বিদরী আলবোলা, রাজস্থানের গোলাপী মার্বেলের ফোয়ারা, সয়ন-দীপের (স্বর্ণদ্বীপ সিংহল) হাতির দাঁতের চামর, ব্যজনী!

বাদশা তো আজব তাজ্জব মানলেন।

কু-লোক বলে দু'একজন অমিতবর্ষী অসীম সাহসী শের-দিল রুস্তম নাকি ডিম নিয়ে যায়নি দেখে তাদের (অথবা তার) স্ত্রী নাকি শুধিয়েছিল, 'ওঃ! তুমি বুঝি আমাকে ডরাও না?' তারপর আর দেখতে হয়নি!

ইরানের বাদশা খুশীতে তুর্কীর খাস খলীফাকে ছাড়িয়ে গেছেন।

এমন সময় রাজার মস্তকে বজ্রঘাত। খোজা তিন মাসের ছুটি চান,—দেশ থেকে বউ-বাচ্চা নিয়ে আসবেন বলে। খোজা মারাত্মক একদারনিষ্ঠ। রাজা কি করেন, অতি অনিচ্ছায় ছুটি দিলেন, অবশ্য, তিন মাস রিট্রেঞ্চ করে দু'মাসের তরে। যাবার সময় বললেন, 'দোস্ত! দেরি করবেন না, আপনার বিরহে আমার—' বাদশার গলা জড়িয়ে এল। ততদিন তাঁদের সম্পর্ক আর রাজা-প্রজার নয়—দোস্তীতে এসে দাঁড়িয়েছে।

দুমাসের কয়েকদিন পূর্বেই খোজা রাজসভায় পুনরায় উপস্থিত। রাজা পরমানন্দে রাজোচিত ভাষায় শুধালেন, 'তবে কি পুণ্যশ্লোকা বেগম-সাহেবা স্ব-ভবনে অবতীর্ণা হয়েছেন?'

খোজা বললেন, 'হ্যাঁ হুজুর! তবে কিনা ভবনটি তাঁর উপর অবতীর্ণ হলেই হ'ত আরো ভালো।'

তদ্দণ্ডেই সভাভঙ্গের হুকুম হল। বাদশা নিয়ে গেলেন খোজাকে অন্দরমহলে।

'শতেক বছর পরে বঁধুয়া আসিল ঘরে—'

বাদশার তখন ঐ হাল। দোস্তের সঙ্গে নিভৃতে দুহুঁ দুহুঁ হয়ে কুহু কুহু করবেন।

দু-পাত্র শিরাজী খেয়ে বাদশা খোজার কাছ ঘেঁষে বললেন, 'দোস্ত, রাজ্যের আর সকলের সঙ্গে আমার রাজা-প্রজার সম্বন্ধ। তারা আমার কাছ থেকে চায়; আমি তাদের দি। কিন্তু আপনি আমার দোস্ত—আপনার সঙ্গে দোস্তীর সম্পর্কে। দোস্ত যখন দেশে ফেরে তখন দোস্তের জন্য—' বাদশা গলা সাফ করে বললেন, 'এই, ইয়ে, মানে, কোনো কিছু একটা সওগাত আনে। আপনি তো আনেন নি।'

বলে বাদশা খ্যাঁক খ্যাঁক করে বিশ্রী রকমের হাসতে লাগলেন।

না-হক্ক বেইজ্জৎ হলে মানুষ যে রকম বেদনাতুর কণ্ঠে ককিয়ে ওঠে, খোজা সেইরকম বললেন, 'জহাঁপনা কুল্লে দুনিয়ার ইমান-ইনসাফের মালিক, এ সংসারে আল্লা-তালার ছায়া (জিল্লুল্লা)—আমার উপর অবিচার করবেন না। এনেছি, আলবৎ এনেছি। দেশে পৌঁছে সকলের পয়লা হুজুরেরই সওগাত সংগ্রহ করেছি। আজ সঙ্গে আনি নি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। কাল সন্ধ্যায় নিয়ে আসবো।'

একেই বলে দোস্ত!

উদ্‌গ্রীব হয়ে রাজা শুধালেন, 'কি? কি? আমার যে তর সইছে না। আঃ, জীবনে এই প্রথম কিছু-একটা পেলুম।'

খোজা বললেন, 'নিজের আনা সওগাতের প্রশংসা করতে বাধছে, কিন্তু সত্যি হুজুর—অপূর্ব, অতুলনীয়। একটা অপরূপা সুন্দরী তুর্কী তরুণী আপনার জন্য এনেছি হুজুর।'[৪]

---

[৪] ইরানে তুর্কী রমণীর বড়ই কদর।

'হে তরুণী হে তুরস্কী, হে সুন্দরী সাকি
এমনি হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছ তুমি,
তব কপোলের ঐ কৃষ্ণ তিল লাগি
বোখারা সমরকন্দ দিতে পারি আমি।'

অনুবাদটি ভালো নয়। কিন্তু হাফিজের এই কবিতাটি এতই বিখ্যাত যে, তার একাধিক ইংরিজি অনুবাদ আছে,—

"If that unkindly Shirazi Turk
would take my heart in her Land
I'd give Bukhara for the mole upon
her cheek, and Samarkand."

কিম্বা

"Sweet maid, if thou wouldst charm my sight;
And bid these arms thy neck infold;
That rosy cheek, that lily hand
Would give thy poet more delight

তারপর খোজা উচ্ছ্বসিত হয়ে সেই তরুণীর রূপ বর্ণনা আরম্ভ করলেন, একেবারে আমাদের বিদ্যাপতি স্টাইলে, নখ থেকে শির পর্যন্ত—যাকে বলে নখ-শির বর্ণনা। 'ওহো হো হো,—একটি তন্বঙ্গী চিনার গাছ হেন। কী দোলন, কী চলন!'

বাদশা বললেন, 'আস্তে।'

কিন্তু খোজাকে তখন পায় কে, তিনি মৌজে। গলা চড়িয়ে বললেন, 'চিকুর তো নয়, যেন অমা-যামিনীর স্বপ্নজাল—আর্দ্র, স্নিগ্ধ, মৃগনাভি সম।'

উৎসাহের তোড়ে খোজা তখন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। যেন রাজকবি দরবারের সবাইকে শুনিয়ে কবিতা পাঠ করছেন।

বাদশা ব্যাকুল হয়ে খোজার জোব্বা টেনে কাতরকণ্ঠে বললেন, 'চুপ্, চুপ্, আস্তে আস্তে—পাশের ঘরে বেগম সাহেবা রয়েছেন।'

ঝুপ্ করে বসে পড়ে খোজা বিনয়নম্র কণ্ঠে বললেন, 'হুজুর, কাল সকাল থেকে একটি করে আণ্ডা পাঠিয়ে দেবেন। আমার পাওনা।'

এইখানেই খোজা-কাহিনী শেষ করলে ঠিক হত। কিন্তু তাহলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি পরলোকগমনের পূর্বে যে শেষ রসিকতাটি করে গিয়েছেন, সে বাদ পড়ে যায়। কারণ সেটি আজও প্রথম দিনের মত তাজা, অতিশয় নব—ফার্সীতে যাকে বলে 'তাজা-ব্-তাজা, নৌ-ব্-নৌ'।[৫] দ্বিতীয়ত, আণ্ডার গল্পটি আমি শুনেছি আমার সর্ব-কনিষ্ঠা ভগিনী লুৎফুন্নিসার কাছ থেকে। আমার মত তার পায়েও চক্কর আছে। সে শুনেছে, লাহোর না পেশোয়ার কোথায় যেন। এর থেকে এটাও বোঝা যায়, খোজার গল্প মুখে মুখে কতখানি ছড়িয়ে পড়েছে। এখন বাঙলা দেশেও পৌঁছল। সপ্তদশ অশ্বারোহী গাঁজা; দশ বাদ দিয়ে সপ্ত শতাব্দীতেই হয়।

এবারে শেষ গল্প। এটাতে আপনি আমি সবাই আছি।

যেমন মনে করুন দৈবযোগে আপনি পৌঁচেছেন আক্‌শেহিরে। স্বভাবতই

Than all Bokharas vaunted gold.
That all the gems to Samarkhand."

ঝঙ্কারের জন্য ফার্সীটা শুনুন ঃ

'অগরা আন্ তুর্ক্-ই-শিরাজী
বদস্ত্ আরদ্ দিল-ই মারা
ব্-খাল-ই হিন্দো ওশ্ বখ্ শম্
সমর্‌কন্দ্ ওয়া বুখারারা।'

কথিত আছে এ দোঁহা লিখে হাফিজকে তিমুর লেনের সামনে বিপদে পড়তে হয়েছিল। সেটা বারান্তরে হবে।

[৫] সত্যেন দত্তের অনুবাদ আছে।

আপনার মনে বাসনা, দিলে ইদারা জাগবে খোজার গোরস্তান দেখবার জন্য। একাই বেরিয়ে পড়ুন; কিচ্ছুটি ভাবনা নেই, সবাই রাস্তা চেনে।

সেখানে গিয়ে দেখবেন, সামনে এক বিরাট দেউড়ি—প্রবেশদ্বার। কোথায় লাগে তার কাছে ফতেহ্‌পুর-সিক্রিতে আকবর বাদশার বুলন্দ্-দর্‌ওয়াজ্। একেবারে শিশু। তা না হয় হ'ল, কিন্তু অবাক হবেন দেখে যে বন্ধ দরজায় এক বিরাট তিন মণ ওজনের তালা!

গোরস্তানে আছেই বা কি, যাবেই বা কি? এই ভারতবর্ষেই লুঠতরাজের ফলে যা কিছু ইমারত বেঁচে আছে, সেগুলো হয় কবর নয় মসজিদ—ওসবে লুঠের কিছু নেই বলে। তিন মণী তালা দিয়ে খোজার দেহরক্ষা—অন্যার্থে—করা হচ্ছে, মিশরী মমির মত? কিন্তু ইসলামে তো হেন ব্যবস্থা নেই।

নাচার হয়ে তালাটা বন্ধ দোরে বার কয়েক ঠুকলেন, এদিক ওদিক গলা বাড়িয়ে চেল্লাচেল্লি করলেন।

তখন দরাজ-দেউড়ির একপাশ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে বেরিয়ে এল পাহারাওলা। আপনাকে সবিনয় নিবেদন করবে, 'কি হবে ঐ বিরাট তালা খুলে। ওটা কখনো খোলা হয়নি। চলুন পাঁচিল ডিঙিয়ে যাই।'

মানে?

একশ' ফুট উঁচু দেউড়ি—চতুর্দিকের পাঁচিল উঁচুতে একফুট হয় কি না হয়।

মানে?

খোজার আখেরী শেষ মস্করা। উইলে এইভাবে তৈরী করবার আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

বলতে চেয়েছিলেন এ জীবনে আমরা সামনের দিকটা আগলাতেই ব্যস্ত। ইতিমধ্যে আর সব দিক দিয়ে যে বেবাক কিছু চলে যায়, তার খবর রাখিনে।'

* * *

আমি আক্‌শেহির যাইনি। কাজেই হলপ খেয়ে বলতে পারবো না খোজার দর্গা এই পদ্ধতিতে নির্মিত কি না! যদি না হয় বুঝবো খোজা আরো মোক্ষম রসিক। বিন খর্চায় আমাদের এখনো হাসাচ্ছেন আর বোকা বানাচ্ছেন।

তোতা কাহিনী

পারস্য দেশের গুণী-জ্ঞানীরা বলেন, আল্লা যদি আরবী ভাষায় কোরান প্রকাশ না করে ফার্সীতে করতেন, তবে মৌলানা জালালউদ্দীন রুমীর মসনবী কেতাবখানাকে কোরান নাম দিয়ে চালিয়ে দিতেন। এ ধরনের তারিফ আর কোনো দেশের লোক তাদের কবির জন্য করেছে বলে তো আমার জানা নেই।

মৌলানা রুমী ছিলেন ভক্ত। তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন কদম্বন-বিহারিণী শ্রীরাধা যেরকম করে গোপীজনবল্লভ শ্রীহরিকে পেয়েছিলেন, অর্থাৎ প্রেম দিয়ে রুমী তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা মসনবীতে বর্ণনা করেছেন। বেশির ভাগ গল্পচ্ছলে, তারই একটি "তোতা কাহিনী।"

ইরান দেশের এক সদাগরের ছিল একটি ভারতীয় তোতা। সে তোতা জ্ঞানে বৃহস্পতি, রসে কালিদাস, সৌন্দর্যে রুডলফ ভালেন্টিনো, পাণ্ডিত্যে ম্যাক্সম্যুলার। সদাগর তাই ফুরসৎ পেলেই সে তোতার সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ, তত্ত্বালোচনা করে নিতেন।

হঠাৎ একদিন সদাগর খবর পেলেন ভারতবর্ষে কার্পেট বিক্রি হচ্ছে আক্রা দরে। তখনই মনস্থির করে ফেললেন ভারতে যাবেন কার্পেট বেচতে। যোগাড়-যন্ত্র তদ্দণ্ডেই হয়ে গেল। সর্বশেষ গোষ্ঠীকুটুমকে জিজ্ঞেস করলেন, কার জন্য হিন্দুস্থান থেকে কি সওদা নিয়ে আসবেন। তোতাও বাদ পড়ল না—তাকেও শুধালেন সে কি সওগাত চায়। তোতা বললে, 'হুজুর, যদিও আপনার সঙ্গে আমার বেরাদরি, ইয়ারগিরি বহু বৎসরের, তবু খাঁচা থেকে মুক্তি চায় না কোন চিড়িয়া? হিন্দুস্থানে আমার জাতভাই কারোর সঙ্গে যদি দেখা হয়, তবে আমার এ অবস্থার বর্ণনা করে মুক্তির উপায়টা জেনে নেবেন কি? আর তার প্রতিকূল ব্যবস্থাও যখন আপনি করতে পারবেন, তখন এ-সওগাতটা চাওয়া তো কিছুই অন্যায় নয়।'

সদাগর ভারতবর্ষে এসে মেলা পয়সা কামালেন, সব সওগাতও কেনা হল, কিন্তু তোতার সওগাতের কথা গেলেন বেবাক ভুলে। মনে পড়ল হঠাৎ একদিন এক বনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় একঝাঁক তোতা পাখি দেখে। তখ্খুনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের এক বেরাদর ইরান দেশের খাঁচায় বন্ধ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার মুক্তির উপায় বলে দিতে পারো?' কোনো পাখিই খেয়াল করল না সদাগরের কথার দিকে। শুধু দুঃসংবাদটা একটা পাখির বুকে এমনি বাজ হানল যে, সে তৎক্ষণাৎ মরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সদাগর বিস্তর আপসোস করলেন নিরীহ একটা পাখিকে বেমক্কা বদ-খবর দিয়ে মেরে ফেলার জন্যে। স্থির করলেন, এ মূর্খামি দুবার করবেন না। মনে মনে নিজের গালে ঠাস-ঠাস করে মারলেন গণ্ডা দুই চড়।

বাড়ি ফিরে সদাগর সওগাত বিলোলেন দরাজ হাতে। সবাই খুশি, নিশ্চয়ই 'জয় হিন্দ' বলেছিল ব্যাটা-বাচ্চা সবাই। শুধু তোতা গেল ফাঁকি। সদাগর আর ও-ঘরে যান না পাছে তোতা তাঁকে পায়ে ধরে সওগাতের জন্য। উঁহু সেটি হচ্ছে না ও-খবরটা যে করেই হোক চেপে যেতে হবে।

কিন্তু হলে কি হয়—গোঁপ কামানোর পরও হাত ওঠে অজানতে চাড়া দেবার জন্য (পরশুরাম উবাচ), বে-খেয়ালে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন হঠাৎ একদিন তোতার ঘরে। আর যাবে কোথায়—'অস্-সালাম আলাই কুম ও রহমৎ উল্লাহি, ও বরকত ওহু আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞে হোক। হুজুরের আগমন শুভ হোক' ইত্যাদি ইত্যাদি, তোতা চেঁচাল।

সদাগর হেঁ হেঁ করে গেলেন। মনে মনে বললেন, খেয়েছে।

তোতা আর ঘুঘু এক জিনিস নয় জানি, কিন্তু এ তোতা ঘুঘু। বললে, 'হুজুর সওগাত?'

সদাগর কাঁটা বাঁশের মধ্যিখানে। বলতেও পারেন না, চাপতেও পারেন না। তোতা এমনভাবে সদাগরের দিকে তাকায় যেন তিনি বেইমানস্য বেইমান। সওগাতের ওয়াদা দিয়ে গড্ ড্যাম্ ফক্কিকারি! মানুষ জানোয়ারটা, এই রকমই হয় বটে! তওবা, তওবা!

কি আর করেন সদাগর। কথা রাখতেই হয়। দুম করে বলে ফেললেন।

যেই না বলা তোতাটি ধপ করে পড়ে মরে গেল। তার একটা বেরাদর সেই দূর হিন্দুস্তানে তার দুরবস্থার খবর পেয়ে হার্টফেল করে মারা গেল, এরকম একটা প্রাণঘাতী দুঃসংবাদ শুনলে কার না কলিজা ফেটে যায়?

দিলের দোস্ত তোতাটি মারা যাওয়ায় সদাগর তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। 'হায়, হায়, কী বেকুব কী বে-আক্কেল আমি। একই ভুল দু-বার করলুম।' পাগলের মত মাথা থাবড়ান সদাগর। কিন্তু তখন আর আপসোস ফায়দা নেই। ঘোড়া চুরির পর আর আস্তাবলে তালা মেরে কি লভ্য! সদাগর চোখের জল মুছতে মুছতে খাঁচা খুলে বের করে আঙ্গিনায় ছুঁড়ে ফেললেন।

তখন কী আশ্চর্য, কী কেরামতি! ফুরুৎ করে তোতা উড়ে বসল গিয়ে বাড়ির ছাদে। সদাগর তাজ্জব—হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তোতার দিকে। অনেকক্ষণ পরে সম্বিতে ফিরে শুধালেন, 'মানে?'

তোতা এবারে প্যাঁচার মত গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'হিন্দুস্তানে যে তোতা আমার বদ্‌নসিবের খবর পেয়ে মারা যায়, সে কিন্তু আসলে মরে নি। মরার ভান করে আমাকে খবর পাঠালো, আমিও যদি মরার ভান করি, তবে খাঁচা থেকে মুক্তি পাবো।'

সদাগর মাথা নিচু করে বললেন, 'বুঝেছি, কিন্তু বন্ধু যাবার আগে আমাকে শেষ তত্ত্ব বলে যাও। আর তো তোমাকে পাব না।'

তোতা বললে, 'মরার আগেই যদি মরতে পারো, তবেই মোক্ষ লাভ। মড়ার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, মান-অপমান বোধ নেই। সে তখন মুক্ত, সে নির্বাণ মোক্ষ সবই পেয়ে গিয়েছে। মরার আগে মরবার চেষ্টা করো।'

*　　*　　*

এই গল্প ভারতবর্ষে বহু পূর্বে এসেছিল কবীর বলেছেন,

'ত্যজো অভিমানা শিখো জ্ঞানা
সত্যগুরু সঙ্গত তরতা হৈ
কহেঁ কবীর কোই বিরল হংসা
জীবতহী তো মরতা হৈ।।'

(অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো, সৎগুরুর সঙ্গ নিলেই ত্রাণ। কবীর বলেন, 'জীবনেই মৃত্যু লাভ করেছেন সেরকম হংসসাধক বিরল'।)

আর বাঙলা দেশের লালন ফকিরও বলেছেন,

'মরার আগে মলে শমন জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে সে মরা কেমন, মুরশীদ ধরে জানতে হয়।'।।

রম্যকবিতা

মার্জারনিধন কাব্য বা গুরবে কুশ্‌তব শাব-ই-আওওয়ল

কোন্ দেবে পূজা করি কোন শীর্নী ধরি?
গণপতি, মৌল-আলী, ধূর্জটি, শ্রীহরি?
মুশকিল-আসন্ আর মুর্শীদ মস্তান্
কোম্পানি কি মহারানী, ইংরেজ শয়তান?
হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, যেবা আছ যথা
ইস্পাহানী, ডালমিঞা—কলির দেবতা।
সবারে স্মরণ করি সিতুমিঞা ভনে
বেদরদ বেধড়ক ভয় নাহি মনে।।

ইরান দেশের কেচ্ছা শোনো সাধুজন
বেহদ্ রঙীন কেচ্ছা, বহুৎ বরণ।

এন্তের তালিম পাবে করিলে খেয়াল
রোশনী আসিবে দিলে ভাঙিয়া দেয়াল।
পুরানা যদিও কেচ্ছা তবু হর্বকৎ
সমঝাইয়া দিবে নয়া হাল হকীকৎ॥
ইরান দেশেতে ছিল যমজ তরুণী
ইয়া রঙ, ইয়া ঢঙ, নানা গুণে গুণী।
কোথায় লায়লী লাগে কোথায় শিরীন
চোখেতে বিজলী খেলে ঠোঁটে বাজে বীণ।
ওড়না দুলায়ে যবে দুই বোন যায়
কলিজা আছাড় খায় জোড়া রাঙা পায়।
এ্যাসা পীরিতি তোলে ফকিরেরও জানে
বেহুঁশ হইয়া লোক তারীফ বাখানে।
দৌলতও আছিল বটে বিস্তরে বিস্তর
বাপ দাদা রাখি গেলা চাকর-নফর।
ধন জন ঘর বাড়ী তালাব খামার
টাকা কড়ি জওয়াহর এন্তারে এন্তার।
তাই দুই নারী চায় থাকিতে আজাদ
কলঙ্কের ভয়ে শুধু বিয়ে হৈল সাধ।
তখন করিল শর্ত সে বড় অদ্ভুত
সে শর্ত শুনিলে ডর পায় যমদূত।
বলে কিনা প্রতি ভোরে মিঞ্যার গর্দনে
পঞ্চাশ পয়জার মারি রাখিবে শাসনে!
এ বড় তাজ্জব বাৎ বেতালা বদ্‌খদ্
এ শর্ত মানিবে কেবা হয় যদি মর্দ্?
দুল্‌হা বরেতে ছিল পাড়া ছয়লাপ
শর্ত শুনে পত্রপাঠ হয়ে গেল সাফ।
সিতু মিঞা বলে সাধু এ বড় কৌতুক
মন দিয়া কেচ্ছা শোনো পাবে দিলে সুখ॥

শীত গেল বর্ষা গেল আসিল বাহার
ফুলে গুলে ইস্‌ফাহান হৈল গুলজার।
শীরাজ তব্রীজ আর আজরবৈজান
খুশীতে ভরপুর ভেল জমিন আসমান।

শুধু দুই ভাই নাম ফিরোজ মতীন
পেটের ধান্দায় মরে দুঃখে কাটে দিন।
অবশেষে ছোট ভাই বলে ফিরোজেরে
"কি করে বাঁচিবে বলো, কি হবে আখেরে।
তার চেয়ে জুতা ভালো চলো দুই জনে
শাদী করি পেট ভরি দু মেয়ের সনে।
দুআভুআ ফিরোজের মন মাঝে হয়
শাদীতে আয়েশ বটে জুতারও তো ভয়।
হদীসের লাগি ঘাঁটে কুরান পুরাণ
দীন সিতু মিঞা ভনে শুনে পুণ্যবান।।

মসলিস জৌলুস করি দুনিয়া রওশন
জোড় শাদী হয়ে গেল খুশ ত্রিভুবন।
চলি গেলা দুই ভাই ভিন্ন হাবেলিতে
মগ্ন হইলা মত্ত হইলা রসের কেলিতে।
পয়জারের ভয়ে নারি করিতে বয়ান
সিতু ভনে চুপিসারে শুনে পুণ্যবান।।

তিন মাস পরে বুঝি খুদার কুদ্রতে
আচম্বিতে দু ভায়েতে দেখা হল পথে।
কোলাকুলি গলাগলি সিনা কলিজায়
মরি মরি মেলামেলি করে দুজনায়।

"তোমার মাথায় টাক নাই কেন?"
শুধায় ফিরোজ ভাই
মানিয়া তাজ্জব উত্তর মতীন
'টাক কেন বলো তাই?"
কাঁচুমাচু হয়ে পুছিল ফিরোজ
"জোরে কি মারে না চটি?"
"আরে দুত্তোর হিম্মত কাহার
আমি কি তেমনি বটি?
বাখানিয়া বলি শোন কান পেতে

তরতিব কাহারে কয়
আজব দুনিয়া আজব চিড়িয়া
মামেলা ঝামেলা ময়।
তাই বসিলাম তলওয়ার হাতে
বীবী দিলা খানা আনি
কোর্মা পোলাও তন্দুরী মুর্গী
ঢাকাই বাখরখানী।
খানা আইল যেই বীবীর পেয়ারা
বিড়াল আসিল সাথে
যেই না করিল মরমিয়া 'ম্যাঁও'
খাপটা না তুল্যা হাতে,—
খুল্যা তলোয়ার এক কোপে কাট্যা
ফ্যালাইনু কল্লাডারে
তাজ্জব বীবী আক্কেল গুড়ুম
জবানে রা'টি না কাড়ে
গুস্‌সা কৈরা কই 'এসব না সই
মেজাজ বহুৎ কড়া
বরদাস্ত নাই বিলকুল আমার
তবিয়ৎ আগুনে গড়া।'
তার পর কার ঘাড়ে দুইডা মাথা
করিবে যে তেড়িমেড়ি?"
সিতু মিঞা কয় নিশ্চয় নিশ্চয়
বাঘিনী পরিল বেড়ি।

"ক্যাবাৎ", "ক্যাবাৎ" বলি হাওয়া করি ভর
চলিল ফিরোজ মিঞা পৌঁছে গেলা ঘর।
মিলেছে দাওয়াই আর আন্দেশা তো নাই
খুদার কুদ্রতে ছিল তালেবর ভাই।
তার পর শোনো কেচ্ছা শোনো সাধুজন
ঠাস্যা দিল সেই দাওয়া পুলকিত মন!
সে রাত্রে খানার তক্তে খুল্যা তলোয়ার
কাট্যা না ফলাইল মিঞ্যা কল্লা বিল্লিডার।
চক্ষু দুইডা রাঙ্গা কর্‌যা হুঙ্‌কারিয়া কয়

"তবিয়ৎ আমার বুরা গর্বড় না সয়।
হুশিয়ার হয়ে থেকো নয় সর্বনাশ।
সিতু মিঞা শুনে কয়, শাবাশ, শাবাশ।।

হায়রে বিধির লেখা, হায়রে কিস্মৎ
জহর হইয়া গেল যা ছিল শর্বৎ।
ভোর না হইতে বীবী লয়ে পয়জার
মিঞার বুকেতে চড়ি কানে ধরি তার।
দমাদম মারে জুতা দাড়ি ছিঁড়ে কয়
'তবিয়ৎ তোমার বুরা, বরদাস্ত না হয়?
মেজাজ চড়েছে তব হয়েছ বজ্জাৎ?
শাবুদ করিব তোমা শুনে লও বাৎ।
আজ হৈতে বেড়ে গেল রেশন তোমার
পঞ্চাশ হৈতে হৈল একশ' পয়জার।"
এত বলি মারে কিল মার কানে টান
ইয়াল্লা ফুকারে সিতু, ভাগ্যে পুণ্যবান।।
কোথায় পাগড়ী গেল কোথায় পাজামা
হোঁচট খাইয়া পড়ে কভু দেয় হামা।
খুন ঝরে সর্ব অঙ্গে ছিঁড়ে গেছে দাড়ি
ফিরোজ পৌঁছিল শেষে মতীনের বাড়ি।
কাঁদিয়া কহিল..."ভাইয়া কি দিলি দাওয়াই।
লাগাইনু কামে এবে জান যায় তাই।"
বর্ণিল তাবৎ বাৎ, মতীন শুনিল
আদর করিয়া ভায়ে কোলে তুলি নিল।
বুলাইয়া হাত মাথে বুলাইয়া দেহ
"বিড়াল মেরেছ" কয়, "নাই তো সন্দেহ।
ব্যাকরণে তবু, দাদা, কৈলা ভুল খাঁটি।
বিলকুল বরবাদ সব গুড় হৈল মাটি।
আসল এলেমে তুমি করোনি খেয়াল
শাদীর পয়লা রাতে বধিবে বিড়াল।"
বাণীরে বন্দিয়া বান্দা বান্ধিলো বয়ান
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান।।

* * *

মল্লিনাথস্য

স্বরাজ লাভের সাথে কালোবাজারীরে
মারিনি এখন তাই কর হানো শিরে।
শাদীর পয়লা রাতে মারিবে বিড়াল
না হলে বর্বাদ সব, তাবৎ পয়মাল।। *

বইকেনা

মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে-দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময় উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দু'টো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে বিস্তর চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবী দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন 'হায় আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য এক সঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি, সে-কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপসোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাত। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক একটা করে মনের চোখ ফুটতে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য-উপন্যাসের একচোখো দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি? প্রথমত—বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই

---

* ইরানে এ কাহিনী সবিস্তর বলা হয় না। শুধু বলা হয়, 'গুরবে কুশতন্ শব-ই-আওওয়ল।' অর্থাৎ গুরবে = বিড়াল, কুশতন্ = মারা, শব = রাত্রি, আওওয়ল = প্রথম। সোজা বাঙলায়, 'পয়লা রাতেই মারবে বেড়াল।'

কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোয় আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রান্ড রাসেল বলেছেন, 'সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতরে ডুব দেওয়া। যে যত বেশী ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, ভবযন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা ততই বেশি হয়।'

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল—আরো কত কি।

কিন্তু প্রশ্ন এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মত সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষপর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়তো ওমর খৈয়াম বলেছিলেন,—

Here with a loaf of bread
beneath the bough,
A flask of wine, a book of
verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশ্‌তের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী হজরৎ মুহম্মদ সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে 'আল্লামা বিল কলমি' অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন, 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই per excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক— The Book.

যে-দেবকে সকল মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার ঐ কথা 'অত কাঁচা পয়হা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনবো?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য—কনিষ্ঠাপরিমাণ—লুকনো রয়েছে। সেটুকু এই

যে, বই কিনতে পয়সা লাগে—ব্যস্। এর বেশী আর কিছু নয়।

বইয়ের দাম আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশী বই বিক্রী হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও', তবে সে বলে 'বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাংলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসী ভাষা। এ-ভাষায় বাঙলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচ সিকে দিয়ে যে-কোনো ভাল ফরাসী বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন?'

'আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোনো ভালো বই এক ঝট্‌কায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে! আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দুহাজার ছাপাতে গেলেই। বেশী ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি?'

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে, বই সস্তা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঐ ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ—দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয় নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখানে থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মত অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত একগাদা নূতন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষ সে কেনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখের সামনে সারে সার গোলাপী হাতী দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কি করি? আমি একধারে producer এবং consumer–তামাকের মিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে producer সৈয়দ মুজতবা আলি এবং সেইটে খেয়ে নিজেই consumer : আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি একখানা বই produce করেছি।—কেউ কেনে না বলে আমিই consumer অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

* * *

মার্কটুয়েনের লাইব্রেরীখানা নাকি দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে

থাকত—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন?'

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই, বলেছ ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরীটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারি নে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে, আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে। যে-মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না, সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের বেলায় সর্বপ্রকার বিবেক বিবর্জিত। তার কারণটা কি?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, 'ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবীটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর? আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষু-গোচর করতে চাই। ধনীর মেহন্নতের ফল হল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না—বই পড়তে পারে না।'

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ, ই, ডি দিয়ে, 'অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।'

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বাঙলাদেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায় সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপুত হয় না। সব কিছুই তার স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, 'তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না?' গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'

যেমন স্ত্রী তেমন স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম

মারাত্মক অপমান করতে হলে তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালোবাসা দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জৎ করতে চায়, তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়তো মনে মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদ্রে জিদে'র মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন—অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়রা তখন লাগল জিদের পিছনে—গালিগালাজ কটুবাক্য করে জিদে'র প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলল। কিন্তু আশ্চর্য, জিদে'র লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ করে সব কিছু শুনে গেলেন, জিদে'র হয়ে লড়লেন না। জিদে'র জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল, জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মুর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিত ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটল নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

যে-সব লেখক জিদে'র হয়ে লড়েন নি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদ'কে স্বাক্ষর সহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জাল বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলুম—কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন—জাহাজের টাইপ করা একশ' লাইন দৈনিক কাগজে সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন—যত কম লোকে কেনাকাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাঙলা দেশে নাকি একবার এরকম টিকি বিক্রি হয়েছিল!)

শুনতে পাই, এঁরা নাকি জি'দকে কখনো ক্ষমা করেন নি।

* * *

আর কত বলব? বাঙালীর কি চেতনা হবে?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালীর জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকত। আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালী যদি হটেনটট হত, তবে কোনো দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতে কোথাও দেখি নি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালীর পয়সার অভাব।' বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার

টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে?

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

চার্লি চ্যাপলিন

আমার ছেলেবেলায় বায়স্কোপও ছেলেমানুষ ছিল। হরেক রকম ফিলিম তখন আসত; ছোট, বড়, মাঝারি—এখনকার মত স্টান্ডার্ডাইজ্‌ড নয়। সেনসর বোর্ডফোর্ডও তখন শিশু, এখনকার মত জ্যাঠা হয়ে ওঠে নি— 'এটা অশ্লীল', 'ওটা কদর্য', সেটা 'বড় কর্তাদের নিয়ে মস্করা করেছে' বলে দেশের দশের রুচি মেরামত করার মত হরিশ মুখুজ্যে দি সেকেন্ড হয়ে ওঠে নি। কাজেই হরেক রুচির ফিলিম তখন এদেশে অক্লেশে আসত এবং আমরা সেগুলো গোগ্রাসে গিলতুম। তার ফলে আমাদের চরিত্রের সর্বনাশ হয়েছে, একথা কেউ বলে নি। এবং আজ যে সেনসর বোর্ডের এত কড়াক্কড়ি, তার ফলে এ-যুগের চ্যাংড়া-চিংড়িরা যীশুখেষ্ট কিংবা রামকেষ্ট হয়ে গিয়েছে এ মস্করাও কেউ করে নি; তবু শুনেছি সেনসর বোর্ডের বিশ্বাস, বিস্তর ছবি ব্যান্ করলে শেষটায় ভালো ছবি বেরবে। তাই যদি হয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটা সেনসর বোর্ড লাগাও না কেন? কাকা-মামা শালাদের চাকরি তো হবেই এবং সুবো-শাম হুদোহুদো বই ব্যান্ করার ফলে একদিন ইয়া দাড়ি গোঁপ সমেত আরেকটি সমুচা রবিঠাকুর বেহেশৎ থেকে টুকুস্ করে ঢস্‌কে পড়বেন—এই যে-রকম হাওড়া ইস্টিশানের কল থেকে প্ল্যাটফর্ম টিকিট মিন্‌ফর্সেপসে বেরিয়ে আসে।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এরা কার রুচি রিফর্ম করতে চায়? আমার? সাবধান! পাড়ার ছোঁড়ারা আমায় মানে (ওরাই আমাকে মাঝে মধ্যে বায়স্কোপে নিয়ে যায়), শুনলে ক্ষেপে উঠবে। বোর্ডেরও প্রাণের ভয় আছে। তবে কি টাঙাওলা বিড়িওলাদের? ওঃ! কী দম্ভ! ওদের রুচিতে ভণ্ডামি নেই। ঐটে পেলে আমি বর্তে যেতুম।

কিন্তু সে কথা থাক্। এই সেন্‌সরিং ব্যাপারটা দেশে-বিদেশে কি প্রকারে সমাধান হয় সে-সম্বন্ধে আরেকদিন সবিস্তার আলোচনা করব। ইতিমধ্যে ছোটো হিটলারদের স্মরণ করিয়ে রাখি বড়া হিটলাররা জার্মানিতে 'অল কোয়ায়েট' ফিলিম ব্যান্ করেছিল!

সেই যুগে হঠাৎ দেখা দিলেন মহাকবি চার্লি চ্যাপলিন—ভগবান তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন।

সাহিত্য বলুন, সঙ্গীত বলুন, চিত্রকলা বলুন, ভাস্কর্য বলুন এ-রকম একটি তাজমহলের-সামনে-দাঁড়িয়ে-নটরাজ পৃথিবীতে আর কখনো উদয় হয় নি। এঁর প্রতিভা অতুলনীয়। বাগ্দেবী এঁর কণ্ঠে, উর্বশী পদযুগে, এঁর দক্ষিণ হস্তে বিষ্ণুর চক্র (গ্রেট ডিক্‌টেটর), বাম হস্তে দাক্ষিণ্যের বরাভয় (সিটি লাইট)। ইনি বিশ্বকর্মা (মডার্ন টাইমস), ইনি নীলকণ্ঠ (মসিয়ো ভেরদু)! 'অতি বড় বৃদ্ধ' বলেই ইনি 'সিদ্ধিতে নিপুণ' এবং লগ্ন এলে শঙ্করের মত নবীন বেশে সজ্জিত হতে জানেন (লাইম লাইট)।

রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে শরৎচন্দ্র একদা বলেছিলেন, 'তোমার দিকে চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই।' সেই রবীন্দ্রনাথ সিন্ধুপারের হিস্পানী বিদেশিনীকে দেখে মুগ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন—

'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।'

চার্লির দিকে তাকিয়ে সর্বক্ষণ এই দোঁহাটি মনে পড়ে।

সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে জগদ্বিখ্যাত হওয়ার পর টলস্টয় একখানি প্রামাণিক অলঙ্কার-শাস্ত্রের গ্রন্থ লেখেন। পুস্তকের প্রথম এবং শেষ প্রশ্ন 'হোয়াট্ ইজ আর্ট?' অর্থাৎ 'রস কি?' মধুর সঙ্গীত শুনে, উত্তম কাব্য পাঠ করে, দেবীর মূর্তি দেখে আমরা যে আনন্দরসে নিমজ্জিত হই সে বস্তুটি কি?

তার সংজ্ঞা দেওয়ার পর টলস্টয় বলেন, 'গুটিকয়েক উন্নাসিককে যে রস আনন্দ দান করে সে রস হীন রস। আচণ্ডাল, (আ-সেনসর বোর্ড?)* জনসাধারণকে

---

* পাঠক ভাববেন না, আমি কলকাতা বা দিল্লীর বোর্ডের কথা ভাবছি। আমি সর্ববিশ্বের জীবিত ও মৃত সর্ব-বোর্ডের কথা ভাবছি। শ' যে-রকম 'কুইন্‌জ্ রীডার অব্ প্লেজ'-এর স্মরণে আপন মন্তব্য বিশ্ব-বোর্ডের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন।

যে কাব্য আনন্দ দেয় সেই কাব্যই প্রকৃত কাব্য, উত্তম কাব্য। যথা, মহাভারত। পণ্ডিত মূর্খ, বৃদ্ধ বালক, পাপী পুণ্যবান সকলেই এ কাব্য শুনে আনন্দ পায়।

অবশ্য সর্ব পাঠক যে একই কাব্যে একই বস্তুতে আনন্দ পাবে এমনটা নাও হতে পারে; বালক হয়তো কাব্যের কাহিনী বা প্লট শুনে মুগ্ধ, বলদৃপ্ত যুবা হয়তো কর্ণার্জুনের যুদ্ধবর্ণনা শুনে বীররসে লুপ্ত, বৃদ্ধ হয়তো শ্রীকৃষ্ণে অর্জুনের আত্মসমর্পণ দেখে ভক্তিরসে আপ্লুত, এবং উদারচরিত সর্বরসে রসিকজন হয়তো প্রতি ঝঙ্কারে প্রতি মীড়ে প্রকৃত কাব্যরসে নিমজ্জিত।

তা হলে প্রশ্ন, মানুষের বর্বর রুচিকে কি মার্জিত করা যায় না? হয়তো যায়, কিংবা হয়তো যায় না, কিন্তু সে চেষ্টা আলবৎ করা যায়। সে চেষ্টা ভরত, দণ্ডিন, মম্মট, আরিস্ততেল, রবীন্দ্রনাথ, ক্রোচে করেছেন, কিন্তু এঁদের গলা কেটে ফেললেও এঁরা কোনো বোর্ডের মেম্বর হতে রাজী হতেন না। মানুষের রুচি-পরিবর্তন এঁরাই করিয়েছেন— কোনো বোর্ড কখনোই কিছু পারে নি।

বর্তমান যুগে চার্লি সেই রসই সর্বজনকে উপহার দিয়েছেন। এ যুগের সাহিত্যে, কাব্যে, ভাস্কর্যে, রঙ্গমঞ্চে কুত্রাপি কেউই চার্লির বৈচিত্র্য, বিস্তার, গভীরতা সর্বজন মর্মস্পর্শদক্ষতা দেখাতে পারেন নি। এ যুগে শার্লক হোমস পৃথিবীর সর্বত্রই সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু মানুষের কোমলতম স্পর্শকাতরতাকে তিনি তার চরম মূল্য দিতে পারেন নি। ওমর খৈয়ামও প্রকৃত ধর্মভীরুকে বিচলিত করতে পারেন নি।

চার্লিকে বিশ্লেষণ করি কি প্রকারে?

তাঁর সৃষ্টি, কিংবা তিনি নিজে, এই যে 'লিট্‌ল্ ম্যান', সামান্য জন, যেন পাড়ার জগা, টম্, ডিক্, হ্যারি— কেউকেটা তো নয়ই এক্কেবারে 'কেউ না' কি করে সক্কলকে ছাড়িয়ে এক অসাধারণ জন হয়ে সকলের হৃদয়ে এমন একটি আসন গ্রহণ করল যে আসন পূর্বে শূন্য ছিল এবং যেখানে আর কেউ কখনো আসতে পারবে না?

কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি?

ভ্যাগাবন্ড চার্লি একটি শুকনো ফুল দেখতে পেয়ে সেটি তুলে নিয়ে শুঁকতে লাগল। ঝাঁট-দিয়ে-ফেলে দেওয়া ফুল—তার ফুল্ল-যৌবন গেছে, সে পথপ্রান্তে অবহেলিত, পদদলিত। সামান্য যেটুকু গন্ধ তখনো তার সঙ্গে সুষুপ্ত ছিল চার্লি তাই যেন তার 'সহৃদয়' নিঃশ্বাস দিয়ে জাগিয়ে তুলে বুক ভরে নিচ্ছে। এ ফুল কি কখনো বিশ্বাস করতে পেরেছিল যে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে—রবীন্দ্রনাথের কবি যে রকম আত্মহত্যার পূর্বমুহূর্তে রাজকন্যার বরমাল্য পেল— সে তার চরম সম্মান পাবে?

এমন সময় রাস্তার দুষ্টু ছোঁড়ারা মোকা পেয়ে পিছন থেকে চার্লির ছেঁড়া পাতলুনের ভিতর হাত ঢুকিয়ে শার্টে দিল টান। চড় চড় করে ছিঁড়ে গেল পাতলুনের অনেকখানি—এই তার শেষ পাতলুন, এটাও গেল—আর বেরিয়ে এল ছেঁড়া শার্টের শেষ টুকরো।

আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে ভ্যাগাবন্ড চার্লি ছোঁড়াদের দিকে তাকালে। তারা তখন 'শুভকর্ম' সমাধান করে ছুটে পালাচ্ছে।

তখন ভ্যাগাবন্ডের চোখে কী বেদনাতুর করুণ ভাব!

ভিয়েনা, বার্লিন, প্যারিস, প্রাগে আমি বিস্তর থিয়েটার প্রচুর অপেরা দেখেছি কাব্যে সাহিত্যে টন টন করুণ রসের বর্ণনা পড়েছি, কিন্তু ভ্যাগাবন্ডের সে করুণ চাউনি এদের সবাইকে কোথায় ফেলে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে যায়।

আর সেই নীরব চাউনিতে বলছে, 'কেন ভাই, তোরা আমাকে জ্বালাস? আমি তো তোদের সমাজের উজীর নাজির হতে চাই নে। কুকুর বেড়ালটাকে পর্যন্ত আমি পথ ছেড়ে দিয়ে কোনো গতিকে দিন গুজরান করছি। আমায় শান্তিতে ছেড়ে দে না, বাবারা!' তারপরে যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস— 'হে ভগবান'!

এখানেই কি শেষ? তাহলে চার্লি দস্তয়েফ্স্কির মত সুদ্ধ মাত্র করুণ রসের রাজা হয়ে থাকতেন!

অন্ধ ফুলওয়ালী মিষ্টি হেসে চার্লিকে একটি তাজা ফুল দিতে যাচ্ছেন। তাকে? চার্লিকে? অবিশ্বাস্য!

আইনস্টাইন একবার কোনো শহরের বড় স্টেশনে নেমে দেখেন বিস্তর লোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে— যেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে চায়। বিনয়ী আইনস্টাইন শুধু পিছনের দিকে তাকান আর ডাইনে বাঁয়ে সরে যান। নিশ্চয়ই তাঁর পিছনে কোনো ডাকসাইটে কেষ্টবিষ্টু আসছেন, সবাই এসেছে তাঁকেই বরণ করতে, আইনস্টাইন শুধু আনাড়ির মত মধ্যিখানে বাধার সৃষ্টি করছেন।

কই? কেউ তো নেই? রাস্তা একদম ভোঁ ভাঁ—কলকাতার রেশনশপের গুদোমের মত। এরা এসেছে আইনস্টানের জন্যই।

আমাদের ভ্যাগাবন্ডটিও পিছনে তাকালে। এক্স্ট্রিমস্ মীট্। আইনস্টাইন খ্যাতির সর্বোচ্চ ধাপে, চার্লি নিম্নতম মাপে।

ফুল পেয়ে চার্লির মুখের ভাব! স্মিত হাস্যে মুখের দুই প্রান্ত দুই কানে ঠেকে গিয়েছে, শুকনো গালদুটো ফুলে গিয়ে উপরের দিকে উঠে চোখ দুটো চেপে ধরেছে, চোখের কোণ থেকে রগ পর্যন্ত চামড়া কুঁচকে গিয়ে কাকের পায়ের নকশা ধরেছে, সে চোখ দুটো কিন্তু বন্ধ—আমার যেন মনে হল ভেজা-ভেজা, ঠিক বলতে পারব না, কারণ আমার চোখও তখন ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।

সর্বক্ষণ ভয় হচ্ছিল, এইবার না চার্লি ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেলে!

কে বলে সংসারে শুধু অকারণ বেদনা, নিদারুণ লাঞ্ছনা। পকড়্কে লে আও উস্কো। এলিসের রানীর হুকুম, 'অফ্ফ্ফ্ উইদ্ হিজ্ হেড্।'

মানুষের কলিজায় চার্লি পুকুর খোঁড়েন কি করে? দুঃখ, সুখ, করুণা, কৃতজ্ঞতা এসব রস আমাদের কলিজার গভীরতম প্রদেশে চার্লি সঞ্চারিত করেন কোন

পদ্ধতিতে?

এক ইরানি কবি বলেছেন, 'সব জিনিসের হদ্দ—অর্থাৎ সীমা জানাটাই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার লক্ষণ।'

অর্থাৎ তাঁর বর্ণনায়, তাঁর অভিনয়ে চার্লি বাড়াবাড়ি করেন না। কারণ কে না জানে, একঘেয়েমির চূড়ান্তে পৌঁছয় মানুষ যখন ভ্যাচর ভ্যাচর করে সব-কিছু বলতে চায়, সামান্যতম জিনিস বাদ দিতে চায় না।

তাই অভিনব গুপ্ত, আনন্দবর্ধন বলেছেন, 'ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ করবে!' ধ্বনি বলতে তাঁরা ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত, সাজেস্‌টিভ্‌নেস অনেক কিছুই বুঝেছেন।

যথা ঃ

কুলটা রমণী পথিককে বলছে, 'হে পথিক, এই ঘরে রাত্রিকালে আমার বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ী শয়ন করেন, ঐ ছোট ঘরে আমি একা থাকি, আমার স্বামী বিদেশে। তুমি এখন যাও।'

ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

অর্থাৎ চার্লি যেটুকু অভিনয় করেন, সে তো করেনই; সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই অনেকখানি অভিনয় করে নিই।

হালে চার্লি সুখবর দিয়েছেন, তিনি আবার সেই 'লিট্‌ল্ ম্যান', সেই ভ্যাগাবন্ডকে পুনর্জন্ম দেবেন। তাঁর যা বলবার তিনি তারই মারফতে শোনাবেন। শুনে আমরা উল্লসিত হয়েছি। 'মঁসিয়ো ভের্দু', 'লাইম লাইট' উৎকৃষ্ট অতুলনীয় রসসৃষ্টি কিন্তু আমরা সেই ভ্যাগাবন্ডকে বড্ড মিস্ করছি।

চার্লি ভ্যাগাবন্ডকে বর্জন করেছিলেন কেন?

হয়তো ভেবেছিলেন সব কথা ঐ একই জনের মারফতে বলা চলে না। আমাদের ভ্যাগাবন্ডের পক্ষে সবাইকে তো বিষ খাইয়ে খাইয়ে—'বিজ্‌নেস্ ইস্ বিজ্‌নেস্' বলে এলোপাতাড়ি বিধবাহনন করা যায় না—তাই ভের্দুর সৃষ্টি।

ঠিক এই কারণেই কোনান ডয়েল শার্লক হোমস্‌কে মেরে ফেলে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সৃষ্টি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও তাই গদ্য কবিতা ধরেছিলেন। এই উদাহরণটাই ভালো।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পদে পদে দেখলেন তার কবিতায় পদে পদে মিল এসে যাচ্ছে, ছন্দ এসে যাচ্ছে। যাবেন কোথায়? পঞ্চাশ বছরের অভ্যাস। নাচার হয়ে মিলগুলো লাইনের শেষে না এনে মাঝখানে ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন—শাক ঢাকা দিয়ে মাংস খাওয়ার মত।

শেষটায় বললেন, 'ধুত্তোরচ্ছাই! যাই ফিরে ফের মিল ছন্দে।' রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিকৃষ্ট নয়, রবীন্দ্রনাথের উত্তম কবিতা, এই বাঙলা দেশে একমাত্র তিনিই

সার্থক 'গবি', কিন্তু সোজা কথা—তিনি বুঝে গেলেন যে কবিতার মিল ছন্দ বজায় রেখেও তাঁর যা বক্তব্য তা তিনি বলতে পারবেন। ফিরে গেলেন কবিতায়।

চার্লি যখন ভের্দু করছেন, তখন আমরা পদে পদে দেখতে পাচ্ছি তাঁর পিছনে ভ্যাগাবন্ডকে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তাকে লুকোবার জন্যে—রবীন্দ্রনাথ যেমন মিল লুকোবার চেষ্টা করেছিলেন গবিতায়—কিন্তু আমরা তাকে বার বার দেখতে পাচ্ছি। বার বার মনে হয়েছে, 'আহা এ জায়গায় যদি আমাদের ভ্যাগাবন্ডটি থাকত তবে সে সিচুয়েশনটা কি চমৎকারই না এক্স্প্লয়েট করতে পারত!'

চার্লি সেটা বুঝেছেন। যে ভ্যাগাবন্ডকে এতদিন একটুখানি জিরিয়ে নিলেন, তাকে চার্লি আবার ঘরের ভিতর থেকে টেনে আমাদের চোখের সামনে তাকে দিয়ে বাউণ্ডুলী করাবেন।

সুসংবাদ!!

সিনিয়র-মোস্ট এপ্রেন্টিস্

কোনো কোনো ধর্মগ্রন্থ যত পুরানো হয় তাদের কদর ততই বেড়ে যায়। নূতন যুগের লোক সে সব গ্রন্থ থেকে নূতন সমস্যার অতি প্রাচীন এবং চিরন্তন সমাধান পায় বলে তারা আর সব কেতাবকে অনায়াসে হার মানায়। শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, কোনো কোনো গল্পও অজরামর হয়ে থাকে ঐ একই কারণে। তারই একটা অতি মর্মান্তিকভাবে কাল মনে পড়ে গেল। কুড়িটি টাকা জেবে নিয়ে বাজারে ঘুরে এলুম, ধুতি পেলুম না। গল্পটি হয়তো অনেকেই জানেন—তাঁরা অপরাধ নেবেন না।

গণেশ বেচারী এপ্রেন্টিস্ মাইনে পায় না। কাজ শিখছে, এর ধাঁতানি ওর গুঁতানি চাঁদপানা মুখ করে সয়। আশা, একদিন পাকাপাকি চাকরি, মাইনে সব কিছুই পাবে। চাকরি খালি পড়লও, কিন্তু বড়বাবু সেটা দিয়ে দিলেন তাঁর শালীর ছেলেকে— সে কখনো এপ্রেন্টিসি করেনি। বড়বাবু গণেশকে ডেকে বললেন, 'বাবা গণেশ কিছু মনে করো না। এ চাকরিটা নিতান্তই অন্য একজনকে দিয়ে দিতে হল। আসছেটা তোমাকে দেব নিশ্চয়ই।'

কাকস্য পরিবেদনা, আবার চাকরি খালি পড়ল, বড়বাবু ফের ফক্কিকারি মারলেন, গণেশকে ডেকে আবার মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজালেন। এমনি করে করে দেদার চাকরি গণেশের সামনে দিয়ে ভেসে গেল, তার এপ্রেন্টিসির আঁকশি দিয়ে একটাকেও ধরতে পারল না। শেষের দিকে বড়বাবু আর গণেশকে ডেকে বাপুরে, বাছারে বলে সান্ত্বনা মালিশ করার প্রয়োজনও বোধ করেন না।

গণেশের চোখ বসে গেছে, গলা ভেঙে গেছে, রগের দু'এক গছায় পাক ধরলো, পরনের ধুতি ছিঁড়ে গিয়েছে, জামাটা কোনো গতিকে গায়ে ঝুলে আছে। গণেশ এ-টুলে ও-টুলে এর কাজ, ওর ফাইফরমাশ করে দেয়—আর করে করে আপিসের বেবাক কাজ তার শেখা হয়ে গেল। চাকরি কিন্তু হল না।

এমন সময় বড়সাহেব একদিন বড়বাবুকে দোতলায় ডেকে বললেন, 'আমায় একটা জরুরী রিপোর্ট লিখে আজকেরই মেল ধরতে হবে। কেউ যেন ডিস্‌টার্ব না করে। দরজার গোড়ায় একজন পাকা লোক বসিয়ে দাও, কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়।'

দারোয়ানরা সেদিন করেছিল ধর্মঘট। বড়বাবু গণেশকে দিলেন সামনে বসিয়ে। বললেন, 'কিছু মনে করো না বাবা গণেশ, হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ' ইত্যাদি। গণেশ টুলে বসে ছেঁড়া ধুতিতে গিঁট দিতে লাগল।

এমন সময় নিচের রাস্তায় হৈহৈ রৈরৈ। এক বদ্ধ পাগল রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, পরনে কপ্পিনটুকু পর্যন্ত নেই—ইংরিজিতে যাকে বলে 'বার্থ ডে সুট'— আর পিছনে রাস্তার ছোঁড়ারা তাকে লেলিয়ে লেলিয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হবি তো হ, পাগলা করল গণেশের আপিসের দিকেই ধাওয়া। সিঁড়ি ভেঙে উপরের তলায় উঠে ঢুকতে গেল বড় সাহেবের ঘরে। গণেশ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কিন্তু পাগলকে বাধা দিল না।

মারমার কাটকাট কাণ্ড। পাগলের পিছনে পিছনে ছোঁড়াগুলিও গিয়ে ঢুকেছে বড় সাহেবের ঘরে। চীৎকার চেঁচামেচি। পাগলা আবার সাহেবকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ফেলে রিভলভিং-টিল্‌টিঙ চেয়ারে বসতে চায়।

তাই দেখে কেউ বদ্যি ডাকে
কেউ বা ডাকে পুলিস,
কেউ বা বলে কামড়ে দেবে
সাবধানেতে তুলিস!

শেষটায় পুরো লালবাজার এসে ঘর সাফ করল।

সায়েব তো রেগে কাঁই। বড়বাবুকে ধরে তো এই-মার কি তেই-মার লাগান আর কি। বলেন, 'তুমি একটা ইডিয়েট আর দোরে বসিয়েছিলে তোমার মত একটা ইম্বেসাইলকে। কোথায় সে, ডাকো তাকে।' গণেশ এসে সামনে দাঁড়াল।

সাহেব মারমুখো হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইউ প্রাইজ ইডিয়েট, পাগলকে তুমি ঠেকালে না কেন?'

গণেশ বড় বিনয়ী ছেলে। বললে, আমি ভেবেছিলুম, উনি আমাদের আপিসের সিনিয়র-মোস্ট এপ্রেন্‌টিস্‌। আমি তো জুনিয়র, ওঁকে ঠ্যাকাবো কি করে?

সাহেব তো সাত হাত পানিমেঁ। বললেন, 'হোয়াড্যু মীন বাই দ্যাট?'

গণেশ বললে, 'হুজুর আমি তিন বৎসর ধরে এ আপিসে এপ্রেন্‌টিসি করছি।

খেতে পাইনে, পরতে পাইনে। এই দেখুন ধুতি। ছিঁড়ে ছিঁড়ে পট্টি হয়ে গিয়েছে। লজ্জা ঢাকবার উপায় নেই। তাই যখন এঁকে দেখলুম, আমাদের আপিসে ঢুকছেন, একদম অবস্তর উলঙ্গ, তখন আন্দাজ করলুম, ইনি নিশ্চয়ই এ-আপিসের সিনিয়র-মোস্ট এপ্রেন্‌টিস্; তা না হলে তাঁর এ অবস্থা হবে কেন? এখানে এপ্রেন্‌টিসি করে করে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে সিনিয়র-মোস্ট এপ্রেন্‌টিস্ হয়েছেন।'

*　　*　　*

১৯৪৭ সালে স্বরাজ লাভ হয়। আমাদের এপ্রেন্‌টিসি তখন শুরু হয়। তখনো পরনে ধুতি ছিল, গায়ে জামা ছিল। আর আমাদের সিনিয়র-মোস্ট এপ্রেন্‌টিস হওয়ার বেশী বাকী নেই। সবই আল্লার কেরামতী।।

বড়দিন

বাইবেলে বলা হয়েছে পুব থেকে তিন জন ঋষি প্যালেস্টাইনের জুডেয়া প্রদেশের রাজা হেরোডের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'ইহুদীদের নবীন রাজা কোথায় জন্ম নিয়েছেন? আমরা পূর্বাকাশে তাঁর তারা দেখতে পেয়ে তাঁকে পুজো করতে এসেছি।'

সেই তারা-ই তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বেৎহেলেম—যেখানে প্রভু যীশু জন্ম নিয়েছিলেন। মা মেরী আর তাঁর বাগ্‌দত্ত যোসেফ পান্থশালায় স্থান পান নি বলে আশ্রয় নিয়েছিলেন পান্থশালার পশ্বালয়ে। তারই মাঝখানে কুমারী মেরী জন্ম দিলেন এ জগতের নব জন্মদাতা প্রভু যীশুকে।

দেবদূতেরা মাঠে গিয়ে রাখাল ছেলেদের সুসংবাদ দিলেন—প্রভু যীশু ইহুদিদের রাজা জন্ম নিয়েছেন। তারাও এসে দেখে, গাধা-খচ্চর, খড়-বিচুলির মাঝখানে মা-জননীর কোলে শুয়ে আছেন রাজাধিরাজ।

এই ছবিটি এঁকেছেন যুগ যুগ ধরে বহু শিল্পী, বহু কবি, বহু চিত্রকর। নিরাশ্রয়ের ঘরে এসে আশ্রয় নিলেন বিশ্বজনের আশ্রয়দাতা।

*　　*　　*

বাইরের থেকে গম্ভীর গুঞ্জরণ শুনে মনে হল বিদ্যালয়ের ভিতর বুঝি তরুণ সাধকেরা বিদ্যাভ্যাস করছেন। জানা ছিল, টোল-মাদ্রাসা নয়, তাই ভিতরে ঢুকে ভিরমি যাই নি।

ক'শ নারী পুরুষ ছিলেন আদম-শুমারী করে দেখি নি। পুরুষদের সবাই পরে এসেছেন ইভ্‌নিং ড্রেস। কালো বনাতের চোস্ত পাতলুন—তার দুদিকে সিল্কের

চকচকে দু ফালি পট্টি; কচ্ছপের খোলের মত শক্ত শার্ট, কোণ-ভাঙা কলার—ধবধবে সাদা; বনাতের ওয়েস্ট্ কোট আর কোটের লেপেলে সেই সিল্কের চকচকে ট্যারচা পট্টি; কালো বো ফুটে উঠেছে সাদা শার্ট কলারের উপর—যেন শ্বেত সরোবরে কৃষ্ণা কমলিনী। পায়ে কালো বার্নিশের জুতো—হাতে গেলাস।

কিংবা শার্ক-স্কিনের ধবধবে সাদা মসৃণ পাতলুন। গায়ে গলাবন্ধ প্রিন্স্কোট—সিক্স্ সিলিন্ডারী অর্থাৎ ছ-বোতামওয়ালা। কারো বোতাম হাইদ্রাবাদী চৌকো কারো বা বিদরী গোল—কালোর উপরে সাদা কাজ। একজনের বোতামগুলো দেখলুম খাস জাহাঙ্গীর-শাহী মোহরের।—হাতে গেলাস।

তার মধ্যিখানে বসে আছেন এক খাঁটি বাঙালী নটবর। সে কি মোলায়েম মিহি চুনট-করা শান্তিপুরের ধুতি, ঘি রঙের মেরিনার পাঞ্জাবি আর তার উপরে আড়করা কালো কাশ্মীরী শালে সোনালী জরির কাজ। হীরের আংটি বোতাম ম্যাচ করা, আর মাথায় যা চুল তাকে চুল না বলে কৃষ্ণমুকুট বললেই সে তাজমহলের কদর দেখানো হয়। পায়ে পাম্পসু—হাতে গেলাস।

'দেশসেবক'ও দু-একজন ছিলেন। গায়ে খদ্দর—হাতে? না, হাতে কিচ্ছু না। আমি আবার সব সময় ভালো করে দেখতে পাইনে—বয়স হয়েছে।

কিন্তু এ সব নস্যি। দেখতে হয় মেয়েদের। ব্যাটাছেলেরা যখন মনস্থির করে ফেলেছে, সাঁঝের ঝোঁকে সাদা-কালো ভিন্ন অন্য রঙ নিয়ে খেলা দেখাবে না তখন এই দুই স্বর সা আর রে দিয়ে কি ভেল্কিই বা খেলবে?

হোথায় দেখো, আহা-হা হা। দুধের উপর গোলাপী দিয়ে ময়ূরকণ্ঠ-বাঙ্গালোরী শাড়ী? জরির আঁচল। আর সেই জরির আঁচল দিয়ে ব্লাউজের হাতা। ব্লাউজের বাদ-বাকী দেখা যাচ্ছে না, আছে কি নেই বলতে পারব না। বোধ হয় নেই—না থাকাতেই সৌন্দর্য বেশি। ফরাসীরা কি এ জিনিসকেই বলে 'দেকোল্তে'? বুক-পিঠ-কাটা মেম সায়েবদের ইভ্নিং ফ্রক এর কাছে লজ্জায় জড়সড়।

ডান হাতে কনুই অবধি সোনার চুড়ি—বাঁ হাতে কবজের মত বাঁধা হোমিওপ্যাথিক রিস্টওয়াচ। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিনারের কত বাকী? কটা বেজেছে?' বলেই লজ্জা পেলেন, কারণ ভুলে গিয়েছিলেন নিজের হাতেই বাঁধা রয়েছে ঘড়ি। কিন্তু লাল হলেন না, কারণ রুজ আগে-ভাগেই এত লাল করে রেখেছে যে, আর লাল হবার 'পার্কিং-প্লেস' নেই।

হাতে? যান মশাই,—আমার অতশত মনে নেই।

হালকা সবুজ জর্জেটের সঙ্গে রক্ত-রাঙা ব্লাউজ। কপালে সবুজ টিপ। শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে বাঁ হাতে ঝুলছে ব্যাগ, কিন্তু ব্যাগের স্ট্র্যাপটার রঙ মেলানো হয়েছে রক্ত-রাঙা ব্লাউজের সঙ্গে এবং তাকে ফের মেলানো হয়েছে স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপের সঙ্গে। আর কোথায় কোথায় মিল অমিল আছে দেখবার পূর্বেই তিনি সরে পড়লেন।

ডান হাতে কিছু ছিল? কী মুশকিল!

আরে! মারোয়াড়ী ভদ্রলোকেরা কী পার্টিতে মহিলাদের আনতে শুরু করেছেন? কবে থেকে জানতুম না তো।

একদম খাঁটি মারোয়াড়ী শাড়ি। টকটকে লাল রঙ—ছোটো ছোটো বোট্টাদার। বেনারসী-র‍্যাপার। সেই কাপড় দিয়েই ব্লাউজ—জরির বোট্টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সকাল বেলা হাওড়ায় নামলে ব্রিজ পেরিয়ে হামেশাই এ রকম শাড়ি দেখতে পাই মহিলারা স্নান সেরে ফিরছেন। সেই শাড়ি এখানে? হাতে আবার লাইফ বেল্ট সাইজের কাঁকন।

মাথার দিকে চেয়ে দেখি, না, ইনি মারোয়াড়ী নন। চুলটি গুছিয়েছেন একদম পাকাপোক্ত গ্রেতা গার্বো স্টাইলে। কাঁধের উপর নেতিয়ে পড়ে ডগার দিকে একটুখানি ঢেউখেলানো। শুধু চুলটি দেখলে তামা-তুলসী স্পর্শ করে বলতুম, জীবনের শেষ স্বপ্ন সফল হল—গ্রেতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে। কিন্তু কেন হেন জঙ্গলী শাড়ির সঙ্গে মডার্ন চুল?

নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে ধ্যান করে হৃদয়ঙ্গম করলুম তত্ত্বটা। শাড়ি ব্লাউজের কন্‌ট্রাস্ট্ ম্যাচিঙের দিন গেছে। এখন নব নব কন্‌ট্রাস্ট্-এর সন্ধান চলেছে। এ হচ্ছে প্রাচীন পন্থা আর আধুনিক ফ্যাশানের দ্বন্দ্ব। গলার নীচে ত্রয়োদশ শতাব্দী—উপরে বিংশ। প্রাণভরে বাঙালী মেয়ের বুদ্ধির তারিফ করলুম। উচ্চকণ্ঠে করলেও কোনো আপত্তি ছিল না। সে হট্টগোলের ভিতর এটম বমের আওয়াজও শোনা যেত না। কি করে খানার ঘণ্টা শুনতে পেলুম, খোদায় মালুম।

হাওড়া থেকে শেয়ালদা সাইজের খানা-টেবিল। টার্কি পাখিরা রোস্ট হয়ে ঊর্ধ্বপদী হয়েছেন অন্তত শ জনা, মুরগী-মুসল্লম অগুনতি, সাদু কেঁচোর মত কিলবিল করছে ইতালির মাক্কারানি হাইৎসের লাল টমাটো সসের ভিতর, আন্ডার রাশান স্যালাড গায়ে কম্বল জড়িয়েছে ব্রিটিশ মায়োনেজের ভিতর, চকলেট রঙের শিককাবাবের উপর আঁকা হয়েছে সাদা পেঁয়াজ-মূলোর আলপনা, গরম-মশলার ক্বাথের কাদায় মুখ গুঁজে আছেন রুইমাছের ঝাঁক, ডাঁটার মত আটা আটা এসপেরেগাস টিন থেকে বেরিয়ে শ্যাম্পেনের গন্ধ পেয়ে ফুলে উঠেছে, পোলাওয়ের পিরামিডের উপর সসিজের ডজন ডজন কুতুব মিনার।

কন্‌ট্রাস্ট্, কন্‌ট্রাস্ট্ সবই কন্‌ট্রাস্ট্।

প্রভু যীশু জন্ম নিলেন খড়বিচুলির মাঝখানে—আর তার পরব হল শ্যাম্পেনে টার্কিতে!!

শমীম

আমার বন্ধু শমীম মারা গিয়েছে। শমীম এ-সংসারে কোনো কীর্তি রেখে যেতে পারেনি, যার জন্যে লোকে সভাস্থলে কিংবা কাগজে শোক প্রকাশ করবে। তার আত্মজন এবং নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া তাকে কেউ বেশীদিন স্মরণ করবে না।

তার কথা আপনাদের জোর করে শোনাবার অধিকার আমার নেই, কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি, শমীম কোনো কীর্তি রেখে যেতে পারেনি। তবু যে কেন তার সম্বন্ধে লিখছি, তার কারণ সে আমার বন্ধু, আর তাই আশা, আমার বহু সহৃদয় পাঠক সেই সূত্রে তাকে স্নেহের চোখে দেখবেন, এবং বহু দেশ দেখবার পর বলছি, ওরকম সচ্চরিত্র ছেলে আমি কোথাও দেখিনি।

শমীম আমার ছেলের বয়সী। তার জন্মের প্রায় প্রথম দিন থেকেই আমি তাকে চিনি। আর এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে সে জন্মাল, আর সে সৌন্দর্য দিন দিন এমনি বাড়তে লাগল যে যে বাড়িতে আসত, সে-ই ছেলেটির দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারত না। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল, কী বিনয়নম্র ভদ্রসংযত ব্যবহার এবং পরদুঃখকাতর হৃদয় ভগবান তাকে দিয়েছেন। আমি নিশ্চয়ই জানি বাড়ির ভিতরে বাইরে এমন কেউ ছিল না যে শমীমের উপর বিরক্ত হয়েছে কিংবা রাগ করেছে।

কিন্তু তবু বলব, শমীম মন্দ অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছিল।

ধরা পড়ল সে সন্ন্যাস রোগে ভুগছে। সন্ন্যাসের চিকিৎসা আছে কিনা জানিনে কিন্তু একথা জানি, তার পিতা (আমার অগ্রজ-প্রতিম) চিকিৎসক হিসেবে আর আমরা পাঁচজনে বন্ধুবান্ধব হিসেবে তার চিকিৎসার কোনো ত্রুটি করিনি, আর মায়ের সেবা সে কতখানি পেয়েছিল, সেকথা কি বলব? সর্বকনিষ্ঠ চিররুগ্ণ কোন্ ছেলেকে তার মা হৃদয় উজাড় করে সেবা-শুশ্রূষা করে না।

ভগবান এতেও সন্তুষ্ট হলেন না,—তাকে দিলেন মারাত্মক টাইফয়েড জ্বর। আমি দেশে ছিলুম না, ফিরে এসে দেখি জ্বর যাবার সময় শমীমের একটি চোখ নিয়ে গিয়েছে। আমি অনেক দুঃখকষ্ট অবিচার-অত্যাচার দেখেছি, সহজে কাতর হইনে, কিন্তু শমীমের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যে আঘাত পেয়েছিলুম সে আঘাত যেন আমার চেয়ে দুর্বল লোককে ভগবান না দেন।

শমীমের বাপ খুড়ো ঠাকুর্দা সকলেই গম্ভীর প্রকৃতির—শমীমও ছেলেবেলা থেকে শান্তস্বভাব ধরত, এখন সে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর হতে লাগল। পড়াশোনা তার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং কখনো যে করতে পারবে সে ভরসা ক্রমেই ক্ষীণ হতে লাগল। হয়তো তাই নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করত—আশ্চর্য কি, যে ছেলে

অল্পবয়সে লেখাপড়ায় সকলের সেরা ছিল তার সব লেখাপড়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো মর্মন্তুদ ব্যাপার কি হতে পারে?

বিশ্বাস করবেন না, ঐ গাম্ভীর্যের পিছনে কিন্তু তার ছিল প্রচুর রসবোধ। আমাকে খুশি করবার জন্য সে আমাদের বাড়ি ৫নং পার্ল রোড সম্বন্ধে একটি রচনা লেখে। তাতে আমাদের সকলের রসময় (অনেকটা আইরিশ ধরনের হিউমার) বর্ণনার পর ছিল উপরের তলায় তার দাদামশায়ের বর্ণনার ফিনিশিং টাচ। দাদামশায় আসলে কুষ্টিয়ার লোক, 'এটা' 'সেটা' না বলে বলেন 'ইডা', 'সিডা', আর বুড়োমানুষ বলে সমস্ত দিন বাড়ির এঘর ওঘর করে বেড়ান। তার বর্ণনা শমীম দিল এক লাইনে—'আর দাদামশাই তো সমস্ত দিন 'ইডা' 'সিডা' নিয়ে আছেন।'

শমীমের বড় ভাই শহীদ তখন প্রেমে পড়েছে। মেয়েটির নাম হাসি। খানার টেবিলে একদিন জল্পনাকল্পনা হচ্ছে, একটু চড়ুই-ভাত করলে হয় মা? শহীদ গম্ভীর হয়ে বসে আছে—আমি শুধালুম, 'তুমি আসছো তো?'

শহীদ বলল, 'না।'

শমীম বলল, 'ও আসবে কেন? আমরা তো 'হাসি' না।'

অর্থাৎ তার ডার্লিং 'হাসি' তো আমাদের সঙ্গে চড়ুই-ভাতে আসবে না এবং আহা, শহীদ কতই-না jolly chap—আমরাই শুধু গম্ভীর।

কিন্তু আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করত তার পরোপকার করার প্রচেষ্টা। ৪৭-এর দাঙ্গার সময় আমাদের বাড়িতে প্রায় ৭০ জন হিন্দু নরনারী আশ্রয় নেন—আমি তখন দক্ষিণে—ফিরে এসে শুনি গুণ্ডারা বাড়ি আক্রমণ করেছিল শমীম নির্ভয়ে এদের সেবা করেছে; আমি আশ্চর্য হইনি।

তার পর ৫০ সনে হোলির কয়েকদিন আগে যখন সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে বিস্তর মুসলমান নরনারী এসে আমাদের পাড়ায় আশ্রয় নিল তখন শমীম তার মা, বাবা, বোনের সঙ্গে যোগ দিয়ে ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে তাদের সেবা করল, তার বাবার ডিসপেনসারিতে বসে রুগীদের জন্য ওষুধ তৈরী করাতে, ইনজেকশন-ভেকসিনেশন দেওয়াতে সর্বপ্রকার সাহায্য করলে। পৃথিবীর সবাই শমীমকে ভুলে যাবে কিন্তু দু-একটি আর্ত হয়তো এই সুহাস, সুভাষ, প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে মনের কোণে একটুখানি ঠাঁই দেবে।

সেই সময় দিল্লীর এক হিন্দু ভদ্রলোক আমাদের এবং পাড়ার মুসলমানদের অনেক সাহায্য করেন। আমরা স্থির করলুম, দিল্লীর লোক, এঁকে নিমন্ত্রণ করে কোর্মা পোলাও খাওয়াতে হবে। সব ঠিক, এমন সময় শমীম তার মাকে গিয়ে বললে, 'এই দুর্দিনে লোকে খেতে পাচ্ছে না, আর তোমরা দাওয়াত করে খাওয়াচ্ছ কোর্মা-পোলাও, আমি তা হলে খাব না। যদি নিতান্তই খাওয়াতে হয়, তবে খাওয়াও আমরা যা রোজ খাই।'

আমরা মামুলি খানাই পরিবেশন করেছিলুম।

*　　*　　*

খবর পেলুম, শমীম ট্রেনের সামনে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। আমি কিছুই ভাবতে পারছি নে। এত সহৃদয় পরোপকারী ছেলে বুঝতে পারল না যে তার মা, বাপ, খুড়ো, ভাই, বোন, আমাকে তার বন্ধু শুকুরকে এতে কতখানি আঘাত দেবে?

কালো মেয়ে

কত করুণ দৃশ্য, কত হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখি প্রতিদিন—সত্য বলতে কি, তাই রাস্তায় বেরতে ইচ্ছে করে না—কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন সবচেয়ে মর্মন্তুদ আমার কাছে কি লেগেছে, তবে বলব, আমাদের পাড়ার কালো মেয়েটি।

সকালবেলা কখন বেরিয়ে যায় জানি নে। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফেরে—আমি তখন রকে বসে চা খাচ্ছি। মাথা নিচু করে, ক্লান্ত শ্লথগতিতে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যায়। আজ পর্যন্ত আমাদের দিকে একবারও ঘাড় তুলে তাকায় নি—আমার মনে হয়, এ জীবনের কোনোদিনই সে কোনো দিকে তাকিয়ে দেখে নি।

দেবতা ওকে দয়া করেন নি। রঙ কালো এবং সে কালোতে কোনো জৌলুস নেই—কেমন যেন ছাতা-ধরা মসনে-পড়া ছাবড়া-ছাবড়া। গলার হাড় দুটি বেরিয়ে গিয়ে গভীর দুটো গর্ত করেছে, গায়ের কোথাও যেন একরত্তি মাংস নেই, গাল ভাঙা, হাত দুখানা শরের কাঠি, পায়ে ছেঁড়া চপ্পল, চুলে কতদিন হল তেল পড়ে নি কে জানে। আর সমস্ত মুখে যে কী বিষাদ আর ক্লান্তি তার বর্ণনা দেবার মত ভাষা আমার নেই। শুধু জানি—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—দিনের পর দিন তার মুখের বিষাদ আর ক্লান্তি বেড়েই চলেছে। আরো জানি, একদিন তাকে আর দেখতে পাবো না। শুনবো, যক্ষ্মা কিংবা অন্য কোনো শক্ত ব্যামোয় পড়েছে, কিংবা মরে গিয়েছে।

শুনলুম, মাস্টারনীগিরি করে বিধবা মা আর ছোট ভাইকে পোষে। তার নাকি পয়সাওলা এক দাদাও আছে—সে থাকে অন্যত্র বউ নিয়ে, এদের দিকে তাকায় না।

বাপ দাদা করেছিলেন তাই আমিও ভগবানে বিশ্বাস করি গতানুগতিকভাবে, কিন্তু যদি এ মেয়ের কোনোদিন বর জোটে তবেই ভগবান আমার সত্যকার বিশ্বাস হবে।

জানি, জানি, জানি, এর চেয়েও অনেক বেশি নিদারুণ জিনিস সংসারে আছে। কলকাতাতেই আছে, কিন্তু আমি পাড়াগেঁয়ে ছেলে, মেয়েছেলে নিষ্ঠুর সংসারে লড়াই করে অপমান-আঘাত সহ্য করে টাকা রোজগার করে, এ জিনিস দেখা আমার

অভ্যাস নেই, কখনো হবে না। গাঁয়ের মেয়েও খাটে—আমার মাও কম খাটতেন না—কিন্তু তাঁর খাটুনি তো বাড়ির ভিতরে। সেখানেও মান-অপমান দুঃখ-কষ্ট আছে স্বীকার করি,—কিন্তু এই যে পাড়ার কালো মেয়েটি সেই সকাল হতে না হতেই নাকে-মুখে দুটি গুঁজে, এর কনুই, ওর হাঁটুর ধাক্কা খেয়ে ট্রামে-বাসে উঠবে, দুপুর বেলা কিছু খাবার জুটবে না, জুটলে হয়তো হেডমিস্ট্রেসের নির্মম ব্যবহার, ছাত্রীদের অবজ্ঞা অবহেলা— হয়তো তার শ্রীহীনতা নিয়ে দু-একটা হৃদয়হীন মন্তব্যও তাকে শুনতে হয়, ক্লাস শেষ হলে সে খাতা দেখতে আরম্ভ করবে, সন্ধ্যার আবছায়া যখন ক্ষুদে লেখা পড়বার চেষ্টায় গর্তে-ঢোকা চোখ দুটো ফেটে পড়বার উপক্রম করবে তখন উঠবে বাড়ি ফেরার জন্য। আজ হয়তো বাসের পয়সা নেই, বাড়ি ফিরতে হবে হেঁটে হেঁটে। ক মাইলের ধাক্কা আমি জানি নে।

কিন্তু জানি, আমি যে গ্রামে জন্মেছি, সেখানে এককালে সব মেয়েরই বর জুটত। ভালো হোক, মন্দ হোক, জুটত এবং ছোট হোক বড় হোক, কোনো না কোনো সংসারে গিয়ে সে আশ্রয় পেত।

আজ আর সেদিন নেই। মধ্যবিত্ত পরিবারের কটি ছেলে আজ পয়সা কামাতে পারে যে বিয়ে করবে? এককালে গ্রামে সকলেরই দু'মুঠো অন্ন জুটত—তা সে গতর খাটিয়ে, চাকরি করেই হোক, আর না করেই হোক—তাই শেষ পর্যন্ত শ্রীহীনা মেয়েরও বর জুটত। আজ যে দু-চারটি ছেলে পয়সা কামাবার সুযোগ পায়, তারা কনের বাজারে ঢুকে বেছে নেয় ডানাকাটা পরীদের। সাধারণ মেয়েরাও হয়তো বর পায়, শুধু শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকে আমাদের পাড়ার মাস্টারনী আর তারই মত মলিনারা।

এ সমস্যা যে শুধু আমাদের দেশেই দেখা দিয়েছে তা নয়। বেকার সমস্যা যেখানে থাকবে সেখানেই ছেলেরা বিয়ে করতে নারাজ। মেয়েরাও বুঝতে পারে, বর পাবার সম্ভাবনা তাদের জীবনে কম, তাই তারাও কাজের জন্য তৈরী হয়—বাপ-মা তো একদিন মারা যাবেন, দাদারা তাকে পুষতে যাবেন কেন? এই একান্ন পরিবারের দেশেই দাদারা ক্রমশঃ সরে পড়ছে, যে দেশে কখনো একান্ন পরিবার ছিল না সেখানে অরক্ষণীয়াকে পুষবে কে। কিন্তু আর আর দেশ আমাদের মত মারাত্মক গরীব নয় বলে টাইপিস্ট মেয়েটির পেট-ভরা অন্ন জোটে, মাস্টারনী যখন বাড়ি ফেরে তখন তার মুখে ক্লান্তি থাকলেও মাঝে মাঝে সিনেমা থিয়েটার যাবার মত পয়সা সে কামায়ও বটে। বর জুটবে না, মা হতে পারবে না, সে দুঃখ তার আছে; কিন্তু ইয়োরোপের মেয়েরা অনেকখানি স্বাধীনতা আছে বলে প্রেমের স্বাদ কিছুটা পায়। নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার নিন্দা বা প্রশংসা করা আমার কর্ম নয়; এ দেশের মেয়েরা পরিণয় বন্ধনের বাইরে প্রেমের সন্ধানে ফিরুক, এ কথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলতে চাই, পশ্চিমের অরক্ষণীয়া তবু কোনো গতিকে বেঁচে থাকার

আনন্দের কিছুটা অংশ পায়—আমাদের পাড়ার মেয়েটি যে এ জীবনে কোনো প্রকার আনন্দের সন্ধান পাবে সে দুরাশা আমি স্বপ্নেও করতে পারি নে।

এ মেয়ের দুরবস্থার জন্য দায়ী কে?

আমি সোজাসুজি বলব, আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক কর্তারা। পাঠক জানেন, এ অধম সপ্তাহের পর সপ্তাহ লিখে যাচ্ছে, কিন্তু কারো নিন্দে সে কখনো করতে যায় নি। সে চেষ্টা করছে আপনাদের আনন্দ দিতে—তারই ফাঁকে ফাঁকে যে সপ্তাহে সে তত্ত্ব বা তথ্য পরিবেশন করবার সুযোগ পেয়েছে, সেদিন তার আনন্দের অবধি থাকে নি; এর গলদ, ওর ত্রুটি নিয়ে সে আলোচনা বা গালাগালি করে কোনো সস্তা রুচিকে সে টক ঝাল দিয়ে খুশী করতে চায় নি। কিন্তু এখন যদি না বলি যে, আমাদের কর্তারা আজ পর্যন্ত দেশের অন্ন-সমস্যা সমাধানের জন্য কিছুই করতে পারেন নি, কোনো পরিকল্পনা পর্যন্ত করতে পারেন নি, তা হলে অধর্মাচার হবে।

বেকার সমস্যা ঘোচাতে পারুন আর নাই পারুন, মধ্যবিত্তকে অন্ন দিতে পারুন আর নাই পারুন, অন্ততঃ তাঁরা যেন তরুণ-তরুণীদের মনে একটুখানি আশার সঞ্চার করে দিতে পারেন। ভালো করে ভাত না জুটলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, যদি তার মনে আশা উদ্দীপ্ত করে দেওয়া যায়।

আমাদের কালো মেয়ের কোনো ভবিষ্যৎ নেই—এ কথা ভাবতে গেলে মন বিকল হয়ে যায়—কিন্তু এদের সংখ্যা বেড়েই চলবে, এ কথা ভাবলে কর্তাদের বিরুদ্ধে সর্বদেহমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

আশাটুকুরও সঞ্চার যদি কর্তারা না করতে পারেন, তবে তাঁরা আসন ত্যাগ করে সরে পড়েন না কেন? হায়, অরক্ষণীয়ার অভিসম্পাতকেও এঁরা আর ভয় করেন না!!

দাম্পত্য জীবন

যাঁদের ঝড়তি-পড়তি মাল কুড়িয়ে নিয়ে ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছি—অর্থাৎ 'পঞ্চতন্ত্র' তৈরী করছি তাঁদের সঙ্গে 'দেশের' পাঠক-পাঠিকার যোগসূত্র স্থাপন করার বাসনা এ-অধমের প্রায়ই হয়। তাঁদেরই একজন আমার এক চীনা বন্ধু। সত্যকার জহুরী লোক—লাওৎসে, কন-ফুৎসিয়ে টৈ-টম্বুর হয়ে আছেন। তত্বালোচনা আরম্ভ হলেই শাস্ত্র বচন ওষ্ঠাগ্রে। আমি যে পদে পদে হার মানি সে কথা আর—রঙ ফলিয়ে তুলি বুলিয়ে বলতে হবে না।

ক্লাবের সুন্দরতম প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি নিমগাছের তলায় বসে তিনি আপিস

ফাঁকি দিয়ে চা পান করেন। তাঁর কাছ থেকে আমি এস্তার এলেম হাঁসিল করেছি—তারই একটা আপিস ফাঁকি দেওয়া। কাছে পৌঁছতেই একগাল হেসে নিলেন। অর্থ সুস্পষ্ট; ছোকরা কাবেল হয়ে উঠেছে। আর ক'দিন বাদেই আপিস-যাওয়া বিলকুল বন্ধ করে পুরো তনখা টানবে।

ইতোমধ্যে এক ইংরেজও এসে উপস্থিত।

রসালাপ আরম্ভ হল। কথায় কথায় বিবাহিত জীবন নিয়ে আলোচনা। সায়েব বললে, 'লন্ডনে একবার স্বামীদের এক আড়াই মাইল লম্বা প্রসেশন হয়েছিল, স্ত্রীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য। প্রসেশনের মাথায় ছিল এক পাঁচ ফুট লম্বা টিঙটিঙে হাড্ডি-সার ছোকরা। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই ছ' ফুট লম্বা ইয়া লাশ এক ঔরৎ দুমদুম করে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, "তুমি এখানে কেন, তুমি তো আমাকে ডরাও না। চলো বাড়ি।" সুড়সুড় করে ছোকরা চলে গেল সেই খাণ্ডার বউয়ের পিছনে পিছনে।'

আমার চীনা বন্ধুটি আদব-মাফিক মিষ্টি মৌরী হাসি হাসলেন। সায়েব খুশী হয়ে চলে গেল।

গুটিকয়েক শুকনো নিমপাতা টেবিলের উপর ঝরে পড়ল। বন্ধু তাই দিয়ে টেবিলক্লথের উপর আল্পনা সাজাতে সাজাতে বললেন, 'কী গল্প! শুনে হাসির চেয়ে কান্না পায় বেশী।' তারপর চোখ বন্ধ করে বললেন—

চীনা গুণী আচার্য সূ তাঁর প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে লিখেছেন, একদা চীন দেশের পেপিং শহরে অত্যাচার-জর্জরিত স্বামীরা এক মহতী সভার আহ্বান করেন। সভার উদ্দেশ্য, কি প্রকারে নিপীড়িত স্বামী-কুলকে তাঁদের খাণ্ডার খাণ্ডার গৃহিণীদের হাত থেকে উদ্ধার করা যায়?

'সভাপতির সম্মানিত আসনে বসানো হল সবচেয়ে জাঁদরেল দাড়িওলা অধ্যাপক মওলীকে। ঝাড়া ষাটটি বছর তিনি তাঁর দজ্জাল গিন্নীর হাতে অশেষ অত্যাচার ভুগেছেন সেকথা সকলেরই জানা ছিল।

'ওজস্বিনী ভাষায় গম্ভীর কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে বক্তার পর বক্তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপন আপন অভিজ্ঞতা বলে যেতে লাগলেন। স্ত্রীলোকের অত্যাচারে দেশ গেল, ঐতিহ্য গেল, ধর্ম গেল, সব গেল, চীন দেশ হটেনটটের মুল্লুকে পরিণত হতে চলল, এর একটা প্রতিকার করতেই হবে। ধন-প্রাণ, সর্বস্ব দিয়ে এ অত্যাচার ঠেকাতে হবে। এস ভাই, এক জোট হয়ে—

'এমন সময় বাড়ির দারোয়ান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, "হুজুররা এবার আসুন। আপনাদের গিন্নীরা কি করে এ সভার খবর পেয়ে ঝাঁটা, ছেঁড়া জুতো, ভাঙা ছাতা ইত্যাদি যাবতীয় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এদিকে ধাওয়া করে আসছে।"

'যেই না শোনা, আর যাবে কোথায়? জানলা দিয়ে, পেছনের দরজা দি'য়ে এমন

কি ছাত ফুটো করে, দেয়াল কানা করে দে ছুট, দে ছুট! তিন সেকেন্ডে মিটিঙ সাফ—বিলকুল ঠাণ্ডা!

'কেবলমাত্র সভাপতি বসে আছেন সেই শান্ত গম্ভীর মুখ নিয়ে—তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। দারোয়ান তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বারবার প্রণাম করে বলল, "হুজুর যে সাহস দেখাচ্ছেন তাঁর সামনে চেঙ্গিস-খানও তসলীম ঠুকতেন, কিন্তু এ তো সাহস নয়, এ হচ্ছে আত্মহত্যার শামিল। গৃহিণীদের প্রসেশনে সক্কলের পয়লা রয়েছেন আপনারই স্ত্রী। এখনো সময় আছে। আমি আপনাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।" সভাপতি তবু চুপ। তখন দারোয়ান তাঁকে তুলে ধরতে গিয়ে দেখে তাঁর সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা। হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছেন।'

আচার্য উ থামলেন। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে 'সাধু সাধু', 'শাবাশ, 'শাবাশ' বললুম। করতালি দিতে দিতে নিবেদন করলুম, 'এ একটা গল্পের মত গল্প বটে।'

আচার্য উ বললেন, 'এ বিষয়ে ভারতীয় আপ্তবাক্য কি?'

চোখ বন্ধ করে আল্লা রসুলকে স্মরণ করলুম, পীর দরবেশ গুরু ধর্ম কেউই বাদ পড়লেন না। শেষটায় মৌলা আলীর দয়া হল।

হাত জোড় করে বরজলালের মত ক্ষীণ কণ্ঠে ইমন কল্যাণ ধরলুম।

শ্রীমন্মহারাজ রাজাধিরাজ দেবেন্দ্রবিজয় মুখ কালি করে একদিন বসে আছেন ঘরের অন্ধকার কোণে। খবর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী এসে শুধালেন মহারাজের কুশল তো? মহারাজ রা কাড়েন না। মন্ত্রী বিস্তর পীড়াপীড়ি করাতে হঠাৎ খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন, 'ঐ রাণীটা—ওঃ কি দজ্জাল, কি খাণ্ডার! বাপরে বাপ! দেখলেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।'

মন্ত্রীর যেন বুক থেকে হিমালয় নেমে গেল। বললেন, 'ওঃ! আমি ভাবি আর কিছু। তাতে অত বিচলিত হচ্ছেন কেন মহারাজ! বউকে তো সবাই ডরায়—আম্মো ডরাই। তাই বলে তো আর কেউ এ রকমধারা গুম হয়ে বসে থাকে না।'

রাজা বললেন, 'ঐ তুমি আরেকখানা গুল ছাড়লে।' মন্ত্রী বললেন, 'আমি প্রমাণ করতে পারি।' রাজা বললেন, 'ধরো বাজি।' 'কত মহারাজ?' 'দশ লাখ?' 'দশ লাখ।'

পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরে ঢোল পেটানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি হল—বিষ্যুৎবার বেলা পাঁচটায় শহরের তাবত বিবাহিত পুরুষ যেন শহরের দেয়ালের বাইরে জমায়েত হয়; মহারাজ তাদের কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে চান।

লোকে লোকারণ্য। মধ্যিখানে মাচাঙ—তার উপরে মহারাজ আর মন্ত্রী। মন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন, 'মহারাজ জানতে চান তোমরা তোমাদের বউকে ডরাও কি না। তাই তাঁর হয়ে আমি হুকুম দিচ্ছি যারা বউকে ডরাও তারা পাহাড়ের দিকে সরে যাও

আর যারা ডরাও না তারা যাও নদীর দিকে।'

যেই না বলা অমনি হুড়মুড় করে, বাঘের সামনে পড়লে গোরুর পালের মত, কালবৈশাখীর সামনে শুকনো পলাশ পাতার মত সবাই ধাওয়া করলে পাহাড়ের দিকে একে অন্যকে পিষে, দলে, থেঁতলে—তিন সেকেন্ডের ভিতর পাহাড়ের গা ভর্তি।

বউকে না-ডরানোর দিক বিলকুল ফর্সা। না, ভুল বললুম। মাত্র একটি রোগা টিঙটিঙে সেই বিরাট মাঠের মধ্যিখানে লিক্‌লিক্ করছে।

রাজা তো অবাক। ব্যাপারটা যে এ-রকম দাঁড়াবে তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। মন্ত্রীকে বললেন, 'তুমি বাজি জিতলে। এই নাও দশ লখা হার।' মন্ত্রী বললেন, 'দাঁড়ান, মহারাজ। ঐ যে একটা লোক রয়ে গেছে।' মন্ত্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে এলে বললেন, 'তুমি যে বড় ওদিকে দাঁড়িয়ে? বউকে ডরাও না বুঝি?'

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'অতশত বুঝি নে, হুজুর। এখানে আসবার সময় বউ আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, যেদিকে ভিড় সেখানে যেয়ো না। তাই আমি ওদিকে যাই নি।'

আচার্য উ আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভারতবর্ষেরই জিৎ। তোমার গল্প যেন বাঘিনী বউ। আমার গল্প ভয়ে পালাল।'

তবু আমার মনে সন্দেহ রয়ে গিয়েছে। রসিক পাঠক, তুমি বলতে পারো কোন গল্পটাকে শিরোপা দি।*

গাঁজা

কিংবা গুলও বলতে পারেন। সদাশয় ভারত সরকার যখন আমাকে কিছুতেই 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মবিভূষণ' জাতীয় কোনো উপাধিই দিলেন না, এবং শেষ পর্যন্ত শিশির ভাদুড়ী পেয়েও সেটি বেয়ারিং চিঠির মত ফেরত দিলেন তখন হাজরা রোডের রকফেলাররা (অর্থাৎ যাঁরা রকে অন্তত এক লক্ষ গুল মেরে লক্ষপতি রকফেলার হয়েছেন) সাড়ম্বরে আমাকে 'গুলম্‌গীর' উপাধি দিলেন।

হালের কথা। বর্ষার ছদ্মবেশ পরে শরৎ নেমেছেন, কলকাতার শহরে। বাড়ির আঙিনায় হাঁটুজল, রাস্তায় কোমর। সেই জল ভেঙে ভিজে জগঝম্প হয়ে তাবৎ 'ফেলাররাই' উপস্থিত। এসেই বসলেন টেলিফোনটি মাঝখানে রেখে। তারপর সবাই

---

* এই ধরণে তুর্কী-ইরানি গল্পের জন্য নস্‌রুদ্দীন্ খোজা রচনা দেখুন।

আপন আপন আপিস-আদালত কারখানা-শুঁড়িখানাতে খবর পাঠালেন, 'কী ভয়ঙ্কর জল দাঁড়িয়েছে রাস্তায়। বাড়ি থেকে বেরনো সম্পূর্ণ অসম্ভব। নৌকো ভাড়ার চেষ্টা করছি। আপিসে আজ না আসতে পারলে কয়েকটা ভিজিটার ফিরে যাবে। সর্বনাশ হবে। কি করি বলুন তো?'

মশাদার এরকম সকরুণ বেদনার গন্ধঢালা আপিস-প্রীতি-এর পূর্বে আমি কখনো দেখি নি। রকে আসতে তাকে বুক ভেজাতে হয়েছে, এখন তার চোখ ভেজা অথচ তার বাড়ি থেকে যে দিকে আপিস সেদিকে যেতে হাঁটু পর্যন্ত ভেজাতে হয় না।

আমাদের রকটি সংমিশ্রিত; অর্থাৎ দু-চারটি চিংড়ি সদস্যও আছেন। আবার ফণি-কাকার বয়স ষাট পেরিয়েছে, গুড়গুড়ির বয়স পাঁচ পেরোয় নি। এরা মাঝে-মধ্যে থাকলে আমাদের একটু সামলে-সুমলে কথা কইতে হয়।

মশাদার প্যাঁচটা দেখে টেটেন মারলে ডবল প্যাঁচ। অজন সেনকে বললে, 'অজনদা, আমার আপিসকে ঝপ্ করে একটা ফোন করে দিন তো, আমি আপিসে বেরিয়ে গিয়েছি, পৌঁচেছি কিনা।'

অজনদা আরো তৈরী মাল। নম্বর পেয়ে খবরটা দিয়ে কি একটা শুনে আঁতকে উঠে বলল, 'কী বললেন? পৌঁছয় নি? বলেন কি মশাই? বড় দুশ্চিন্তায় ফেললেন তো!'

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

অজনদার নিজের কোনো ভাবনা নেই। তার আপিসে মাত্র একটি কল। সেটা সে প্রায়ই আপিস ছাড়ার পূর্বে বে-কল করে আসে।

এবারে আমরা শান্তমনে সমাহিত চিত্তে কর্তব্য কর্মে মন দিলুম।

অজন বুঝিয়ে বলে, 'আলম অর্থাৎ দুনিয়া জয় করে পেলেন বাদশা আওরঙ্গজেব ঐ আলমগীর নাম। সেই ওজনে আপনি গুলম্‌গীর।'

আমি বললুম, 'হাসালি রে হাসালি। এ আর নূতন কি শোনালি? প্রথম আমি পরীস্তানে ছিলুম গুল্-ই বকাওলী, তারপর লন্‌ডনে নেমে হলুম ডিউক অব গুলস্টার, তারপর ফ্রান্সে হলুম দ্য গুল, তারপর পাকিস্তানে হলুম গুল মুহম্মদ, এখানে এসে হলুম গুলজারিলাল নন্দ। তা ভালো, ভালো। গুলম্ গীর। বেশ বেশ।

বড়দা উপর থেকে রকে নামেন ক্বচিৎ-কস্মিন। বললেন, 'ল্যাটে—ল্যাটে বুঝলেন।' বড়দার মুখ হামেহাল পানের পিকে ভর্তি। তারই মহামূল্যবান এক ফোঁটা পাছে বরবাদ হয়, সেই ভয়ে তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে, স্বর্গের দিকে ঠোঁট দুটি সমান্তরাল করে সেই দুটিকে মুখের ভিতরের দিকে বেঁকিয়ে দিয়ে 'ত' 'দ'-কে 'ট', 'ড' করে কথা বলেন—অল্পই।

তাঁর এসব কলকায়দা করা সত্ত্বেও আমরা তখন পাখা, খবরে কাগজ হাতের কাছে যা পাই তাই দিয়ে মুখ ঢাকি। আমি স্বয়ং ছাতা ব্যবহার করি।

অজনদা বললে, 'এবারে আপনি আপনার উপাধি-প্রাপ্তি সম্মানার্থে একটি সরেস গুল ছাড়ুন তো, চাচা!'

মশা বললে, 'কিংবা গাঁজা।'

আমি বললুম, 'যদি ছাড়ি গাঁজার গুল?'

ঘেণ্টু বললে, 'চাচাকে নিয়ে তোরা পারবি নে রে, ছেড়েই দে।' ঘেণ্টুর পাড়াদত্ত নাম ঘণ্টু। আমি নাম দিয়েছি ঘেণ্টু। যবে থেকে আমার চর্মরোগ হয়েছে। ঘেণ্টু চর্মরোগের জাগ্রত দেবী। বিশ্বাস না হলে চলন্তিকা খুলে দেখুন।

আমি বললুম, 'তবে শোন। কিন্তু তার পূর্বে টেটেনকে সাবধান করে দিচ্ছি, সে যেন আমার গাঁজার গুল নিয়ে কোনো সোসিয়ো-পোলিটিকো-ইকনমিক স্টাটিস্‌টিকস সঞ্চয় না করে।' সে আজকাল ঐ নিয়ে মেতেছে।

টেটেন নানাবটি কেস পড়ছিল। বললে, 'আপনি কিস্‌সুটি জানেন না, চাচা। আপনার জানা নেই, এ সংসারে মিথ্যাবাদী আছে এবং তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদীও আছে এবং সর্বশেষে স্টাটিসটিশিয়ানদের কথা ভুলবেন না। ওদের মাল নিয়েই তো সরকার গুল মারে। নিত্যি নিত্যি তো কাগজে দেখতে পান? আমি আপনার দোরে যাব কেন?'

'তবে শোন্। নিশ্চিন্ত হয়ে বলি।'

পার্টিশেনের বছর খানেক পরের কথা। আমার মেজদা ওতর বাংলার কোথায় যেন কি একটা ডাঙর নোকরি করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা। আমরা এখন দুই ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন দেশের অধিবাসী। কিন্তু আমাদের ভিতর কোনো ঝগড়া-কাজিয়া নেই। এই অ্যাদ্দিন বাদে নেহরুজী আর আইয়ুব খান সাহেব সেটা বুঝতে পেরে আমাদের শুভবুদ্ধি এক্তেয়ার করেছেন। তা সে যাকগে।

হিন্দুস্থানের বিস্তর দরদ-ভরা তত্ত্বতাবাশ করে মেজদা শুধলে 'তোদের দেশে গাঁজার কি পরিস্থিতি?'

আমি একগাল হেসে বললুম, 'স্বরাজ পেয়ে বাড়তির দিকে।'

মেজদা আশ্চর্য হয়ে শুধালে, 'সে কিরে? কোথায় পাচ্ছিস? আমি তো চালান দিতে পারছি নে।'

আমিও অবাক। শেষটায় বোঝা গেল দাদা ঝিলিম মেরে শিবনেত্র হওয়ার সত্যিকার গাঁজার কথা বলছে। আমি কি করে জানব? আমি পাষণ্ড বটি,—দাদা ধর্মভীরু সদাচারী লোক।

বললে 'শোন।'

পার্টিশেনের ফলে মেলা অচিন্তিত প্রশ্ন, নানা ঝামেলা মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল এবং তারই সর্বপ্রধান হয়ে উঠে দাঁড়াল গঞ্জিকা-সমস্যা।

গাঁজার এত গুণ আমি জানতুম না। শুনতে পেলুম, স্বয়ং জাহাঙ্গীর বাদশা নাকি

গাঁজা খেয়ে উভয়ার্থে অচৈতন্য হয়েছিলেন। সেটা নাকি তুজ্‌ক্‌-ই-জাহাঁগীরীতে আছে। গাঁজা ছাড়েন শেষটায় তিনি মনের দুঃখে। এর দাম অতি সস্তা বলে সেটা পোষায় না রাজা-বাদশাদের রাজসিক জাত্যভিমানে। সে কথা যাক্‌।

আমার এলাকায় পৃথিবীর বৃহত্তম গাঁজার চাষ এবং গুদোম। ভারতে গাঁজার চাষ প্রায় নেই। আমি এসব তত্ত্ব জানতুম না—সমস্ত জীবন কাটিয়েছি আসামে, বরঞ্চ চায়ের খবর কিছুটা রাখি। এসব গুহ্য রহস্যের খবর দিয়ে গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার আমাকে দুঃসংবাদ দিলে, সে বচ্ছরের গাঁজা গুদোমে পচে বরবাদ হব-হব করছে। ইন্ডিয়াতে চালান দেবার উপাই নেই—অথচ সেখানেই তার প্রধান চাহিদা।

আমি শুধোলুম, 'কেন? তুমি নিজে খাও না বলে অন্য লোকও খাবে না? এ তো বড় জুলুম!'

দাদা বললে, 'কী জ্বালা! আমি শ্রীঘরবাস পছন্দ করি নে; তাই বলে আমি জেল তুলে দিয়েছি নাকি? সাধে কি বলি তুই একটি চাইল্‌ড্‌ প্রডিজি—ওয়ান্ডার চাইল্‌ড্‌—চল্লিশ বছরে তোর যা জ্ঞান-গম্যি হল, আল্লার কুদরতে পাঁচ বছর বয়েসেই সেটা তুই অর্জন করে নিয়েছিলি।'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'আর তুমি বিয়াল্লিশে।' —দাদা আমার চেয়ে দু' বছরের বড়।

দাদা বললে, 'তোর রসবোধ নেই। ঠাণ্ডা হ।'

রকফেলারদের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এসব মাইনর বর্ডার ইন্‌সিডেন্ট আমাদের ভিতরে কালে-কস্মিনে হয়, কিন্তু মিটমাট হয়ে যায় "আকাশ-বাণী", "ঢাক্কা-ডিংডমে" পৌঁছবার পূর্বেই।'

অজনদা শুধোলে, 'ঢাক্কা-ডিংডম্‌টা কি চাচা?'

'ডিংডম্‌ মানে জগঝম্প, বিরাট ঢাক, যার থেকে ইংরিজি টম্‌টম্‌, টম্‌টমিং শব্দ এসেছে। অর্থাৎ ঢাকার বেতার কেন্দ্র। তারপর শোন—'

দাদা বললে, 'ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। ভারতের ষাট হাজার সন্ন্যাসী নাকি রাষ্ট্রপতির কাছে সই, হাতের টিপ দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন, গাঁজার অভাবে নানাবিধ কষ্ট হচ্ছে, আত্মচিন্তার ব্যাঘাত হচ্ছে—'

আমি গোশ্‌শা করে বললুম, 'দেখো, পিতা গত হওয়ার পর অগ্রজ পিতৃতুল্য। কিন্তু তুমি যদি আমাদের সন্ন্যাসীদের নিয়ে মস্করা করো—'

বাধা দিয়ে দাদা বেদনাতুর কণ্ঠে বললে, 'দেখ ভাই, তুই কখনো দেখেছিস যে আমি কাউকে নিয়ে—'

এবারে আমি বাধা দিয়ে বললুম, থাক্‌ থাক্‌। তুমি বলো। দাদার ঐ গলাটা আমি বড়ই ডরাই। ও দাদা ব্যবহার করে পঞ্চাশ বছরে একবার। দাদার বয়স তখন বিয়াল্লিশ।

দাদা তো আমাকে মাফ করবার জন্য তৈরী। চশমার পরকলা দুটো পুঁছে নিয়ে বললে, 'পূর্বেই বলেছি, পার্টিশেনের ফলে বিস্তর অভাবিতপূর্ব সমস্যা দেখা দিল—এটা তারই একটা। পার্টিশেনের পূর্বে সাস্তাহারের গাঁজা যেত হরিদ্বারে অক্লেশে, ব্যাঙালোরের বিয়ার আসত ঢাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে। এখন মধ্যিখানে এসে দাঁড়াল এক দুশমন্! জিনীভাতে কবে কে আইন করেছিল বিশ্বজনের কল্যাণার্থে—কল্যাণ না কচু—তার সার মর্ম এই; আপন দেশে তুমি সার্বভৌম রাজা, যা খুশী করতে পারো যত খুশী ততো আফিঙ ফলিয়ে বিক্রি করতে পারো, গাঁজা চালাতে পারো—কিন্তু ভোলো না আপন দেশের চৌহদ্দির ভিতর। এক্সপোর্ট করতে গেলেই চিত্তির। তখন জিনীভার অনুমতি চাই। যেমন মনে কর ফিনল্যান্ড জিনীভার মারফতে তোদের কাছে চাইলে দু মণ আফিঙ—ওষুধ বানাবার জন্য। জিনীভা সন্দেহের গোয়েন্দা লাগাবে জানবার জন্যে সত্যি ওষুধ বানাবার জন্য ফিনল্যান্ডের অতখানি প্রয়োজন কি না, কিংবা ওরি খানিকটে আক্রা দরে বাজারে বিক্রি করে, দেশের লোককে আফিঙখোর বানিয়ে দু' পয়সা কামিয়ে নিতে চায়। কারণ কোনো কোনো দেশে নাকি বিদেশের ওষুধ বানানেওলাদের সঙ্গে ষড় করে ওষুধের অছিলায় বেশী বেশী হশীশ ককেইন রপ্তানি করে সে সব দেশের বহু লোকের সর্বনাশ করেছে। আইনগুলো আমি পড়ে দেখি নি, তাই ঠিকঠিক বলতে পারব না—নির্যাসটি জানিয়েছিল গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার। এখন নাকি জিনীভার পারমিশন চাই, সেটা পেতে কতদিন লাগবে তার ঠিকঠিকানা নেই, কতখানি পাঠানো যাবে তার স্থিরতা নেই।

ইতিমধ্যে উপস্থিত হল আরেক সঙ্কট।

গেল বছরের গাঁজাতে গুদোম ভর্তি। এদিকে হাল বছরের গাঁজা ক্ষেতে তৈরী। তুলে গুদোমজাত করতে হবে নূতন গুদোম এক ঝটকায় তৈরী করা যায় না—শেষটায় হয়তো জিনীভা কোনো পারমিটই দেবে না, কিংবা এত অল্প দেবে যে বেবাক ব্যবসাই গুটোতে হবে। নয়া গুদোমের কথাই ওঠে না।

তখন নানা চিন্তা, বহু ভাবনা, ততোধিক কর্তৃপক্ষকে আলোচনা করে স্থির করা হল গেল বছরের গাঁজা পোড়াও—'

আড্ডার কেউই গঞ্জিকা-রসিক নয়। তবু সবাই—টেটেনদি ছাড়া—এক কণ্ঠে হায় হায় করে উঠল। খাই আর না-ই খাই, একটা ভালো মাল বরবাদ হতে দেখলে কার না দুঃখ হয়? রায়টের সময় পার্ক সার্কাসের মদের দোকানে বোতল ভাঙা হচ্ছে দেখে এক টেম্পারেন্স পাদ্রীকে পর্যন্ত আমি শোক করতে দেখেছি।

স্টাটিস্টিশিয়ান টেটেন বললে, 'আপনারা এতে এমন কি নূতন শোক পাচ্ছেন? মার্কিনরা যে দু'দিন অন্তর অন্তর অঢেল গম লিট্‌রিলি অ্যান্ড মেট্‌ফরিক্লি দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয় সে বুঝি জানেন না?' টেটেনই আমাদের মধ্যে ইংরেজিতে এম-এ। ওর উচ্চারণ আমাদের বুঝতে কষ্ট হয়। -

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলার পর আমি গল্পের খেই ধরে এবং সিগারেট ধরিয়ে বললুম, তারপর দাদা বললে, 'গুদোমেতে নূতন মাল পোরা হবে। ম্যানেজারকে বললুম, আমি অমুক দিন যাব, সেদিন পুরনো মাল পোড়ানো হবে। কারণটা তাকে আমি আর বললুম না। সেই যে—তুই জানিস নাকি?—বড়দা তোকে বলেছেন, তিনি যখন জাপানী বোমার সময় ট্রেজারি অফিসার ছিলেন তখন হুকুম এল, জাপানী বোমা পড়লে, ব্যাপক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে ট্রেজারির তাবৎ কারেন্সি নোট পুড়িয়ে ফেলবে? ভাইজাগ না কোথাকার এক সুবুদ্ধিমান একটি মাত্র বোমা পড়া মাত্রই সরকারকে খবর দিলে সে সব নোট পুড়িয়ে ফেলেছে। তারপর দু'বছর বাদে, তাজ্জবকী বাৎ, বাজারে সে সব নোটের দর্শন পাওয়া যেতে লাগল। পোড়ায় নি। সরিয়ে ফেলেছিল। আমার তাই ভয়, গাঁজার বেলাও ঐ যদি না হয়।

আগে-ভাগে দিনক্ষণ দেখে, অর্থাৎ টুর প্রোগ্রাম যথা-যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বেরলুম গাঁজা পোড়াতে।'

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, 'কি বললে?'

দাদা ঈষৎ চিন্তা করে বললে, 'হ্যাঁ তা তো বটেই। "গাঁজা পোড়ানো" কথাটার অর্থ "গাঁজা খাওয়া"ও হয়। তাই শুনেছি, ছোকরা নাতির হাতে সিগারেট দেখে যখন ঠাকুরদা গম্ভীর কণ্ঠে তাকে বললেন, 'জানিস, সিগারেট মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু।' সে তখন শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'তাই তো পোড়াতে যাচ্ছি।'

মোকামে পৌঁছে দেখি বিরাট ভিড়। বিশখানা গাঁয়ের বাছাই বাছাই লোক জমায়েত হয়েছেন সেখানে, গাঁজা পোড়ানো দেখবেন বলে। আমি তো অবাক। বাঁশ-পাতা পোড়ানো আর গাঁজা পাতা পোড়ানোতে এমন কি তফাৎ যে দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে জমায়েত হবে? তা সে যাকগে।

হুদো হুদো গাঁজা ওজন করে হিসেব মিলিয়ে ডাঁই ডাঁই করে মাঠের মধ্যখানে রাখা হল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে ম্যানেজারই মুখাগ্নি করলে। সে-ই তার জনক একে দিয়ে তার বহু পয়সা কামাবার কথা ছিল।

সেদিন বাতাসটা ছিল একটু এলোমেলো। গাঁজার ধুঁয়ো ক্ষণে এদিকে যায় ক্ষণে ওদিকে যায়। আর তখন দেখি অবাক কাণ্ড! পাতা পোড়াবার সময় যেদিকে ধুঁয়ো যায় মানুষ সেদিক থেকে সরে যায়। আজ দেখি উল্টী বাৎ। জোয়ান-বুড়ো, মেয়েমদ্দে—হ্যাঁ কয়েকটি মেয়ে-ছেলেও ছিল—ছোটে সেদিকে।

আর সে কী দম নেওয়ার বহর। সাঁই সাঁই শব্দ করে সবাই নাভিকুণ্ডলী পর্যন্ত ভরে নিচ্ছে সেই নন্দন কাননের পারিজাত পাপড়ি পোড়ানোর খুশবাই—অন্তত তাদের কাছে তাই। আমার নাকে একবার একটুখানি ঢোকাতে আমি তো কেশে অস্থির। আর ওরা ফেলেছে কী পরিতৃপ্তির নিশ্বাস—আঃ, আঃ। কেউ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, কোমরে দু'হাত রেখে, আকাশের দিকে জোড়া মুখ তুলে নাসারন্ধ্র স্ফীত

করে নিচ্ছে এক একখানা দীর্ঘ দম, আর ছাড়ছে দীর্ঘতর 'আঃ'—!' শব্দ। কেউ মাটিতে বসে ক্যাবলাকান্তের মত মুখ হাঁ করে আসা মার্গ দিয়ে যৌগিকধূম গ্রহণ প্রশস্ততর মনে করছে।

হঠাৎ হাওয়া ওলটাল। তখন পড়িমড়ি হয়ে সবাই ছুটল সেদিকে। আমি ম্যানেজার, সেরেশ্‌তাদার ততোধিক পড়িমড়ি হয়ে ছুটলুম অন্যদিকে। দু একটি চাপরাসী দেখি মনস্থির করতে পারছে না। তাদের আমি দোষ দিই নে।

ভেবে দেখ্, পৃথিবীতে এ-ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনো হয়েছে? গাঁজা তো আর কোথাও ফলানো হয় না। তারই মণ মণ পুড়িয়ে একচ্ছত্র গঞ্জিকাযজ্ঞ। চতুর্দিকে গরীব দুঃখী বিস্তর। এক ছিলিমের দম বাজারে কিনতে গেলে এদের দম বেরিয়ে যায়। আর এখানে লক্ষ লক্ষ তাওয়া পোড়ানো হচ্ছে আকাশ বাতাস টৈটম্বুর করে। হয়তো ধরণীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই শেষ যজ্ঞ।

আমি তো সায়েন্সের ছাত্র ছিলুম। তোদের কোনো এক ঔপন্যাসিক নাকি সদর রাস্তায় মদের পিপে ফেটে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছে? আমি তার ট্রেলার বাইস্কোপে দেখেছি। কিছু না—ধুলোখেলা। সেখানে সবাই করছে মালের জন্য হুটোপুটি একই দিকে। এখানে বিরাট জিরগা-জলসার-জনসমাজ দিকনির্ণয় যন্ত্রের অষ্টকোণ চষে ফেলেছে—ধুয়োঁ যখন যেদিকে যায় সেদিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকে ছুটছি আমরা কয়েকজন। রবীন্দ্রনাথ নাকি 'জাগ্রত-ভগবান'কে ডেকেছিলেন, তাঁকে 'জনসমাজ মাঝে' ডেকে নেবার জন্যে? আমি পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়ছি, অবশ্য মনে মনে—আল্লাতালা যেন এই আমামুন্নাস, এই 'জনসমাজ থেকে আমাকে তফাত রাখেন।'

আমি ততক্ষণে হাসতে হাসতে প্রায় কেঁদে ফেলেছি। দাদা আমার গম্ভীর রাশভারী প্রকৃতির লোক চোখেমুখে কোনো রকম ভাব প্রকাশ করে না অবশ্য দরদী লোক বলে মাঝে ঠোঁটের কোণে মৃদুহাস্য দেখা যায়—যা-ই হোক্, যা-ই থাক, আমার মত ফাজিল-পঞ্চানন নয়। কোটপাতলুন তুর্কী টুপি পরা সেই লোক খনে এদিক খনে ওদিক ধাওয়া করছে, টুপির ফুন্না বা ট্যাসেল চৈতনের মত খাড়া হয়ে এদিক ওদিক কম্প্রমান—এ দৃশ্যেয় কল্পনা মাত্রই বাস্তবের বাড়া।

দাদা বললে, তুই তো হাসছিস; আমার তখন যা অবস্থা। শেষটায় দেখি, মাথাটা তাজ্জিম মাজ্জিম করতে আরম্ভ করেছে। এত হুটোপুটি সত্ত্বেও ঘিলুতে খানিকটে ধুঁয়ো ঢুকে গেছে নিশ্চয়ই। তারপর মনে হল বেশ কেমন যেন ফুর্তি ফুর্তি লাগছে, কি রকম যেন চিত্তাকাশে উড়ুক্কু উড়ুক্কু ভাব। তারপর দেখি ম্যানেজারটা আমার দিকে চেয়ে কি রকম বেয়াদবের মত ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। ওর তা হলে হয়েছে। কিংবা আমার। অথবা উভয়ের।

আর এ-স্থলে থাকা নয়।

টলটলায়মান, পড়পড়ায়মান হয়ে জীপে উঠলুম। সেও এক বিপদ। দেখি দুখানা জীপ। দুটোই ধুঁয়োটে কিন্তু হুবহু একই রকম। কোনটায় উঠি শেষটায় দেখি আমার পাশে আমারই মত কে একজন দাঁড়িয়ে। হুবহু আমারই মত, তার টুপির ফুন্নাটি পর্যন্ত। দুজনাতে দুই জীপে উঠলাম।'

আমি বললুম, 'দুটো জীপ না কচু!'

দাদা বললে, 'বুঝেছি, বুঝেছি, তোকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। শান্ত হয়ে শোন। তারপর গাড়ি যায় কখনো ডাইনে ঢাকা, আর কখনো বাঁয়ে মতিহারী। তবে কি ড্রাইভারটা—? সে তো সর্বক্ষণ আমারই পিছনে ছিল। তারপর দেখি সেই অন্য জীপটাও ঢাকা মতিহারী করছে একদম পাশে পাশে থেকে। ওমা! তারপর দেখি চারটে জীপ। সেও না হয় বুঝলাম। কিন্তু মোশয়, সে কী কাণ্ড! চারখানাই উড়তে আরম্ভ করল।'

আমি শুধালুম, 'উড়তে?'

'হ্যাঁ উড়তে। জীপটাই তো ছিল ঠায় দাঁড়িয়ে। ধুঁয়ো খেয়েছিল আমাদের চেয়েও বেশী।

হাওয়ায় উড়তে উড়তে ঘুমিয়ে পড়লুম। এবং শেষ পর্যন্ত বাংলোয় পৌঁছলুম।

ভাগ্যিস বেশী ধুঁয়ো মগজে যায় নি। আপন পায়েই ঘরে ঢুকলুম।

সামনেই দেখি তোর ভাবী। আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকালেন। বাপ্‌স্‌। তারপর অতি শান্ত কণ্ঠে—কিন্তু কী কাঠিন্য কী দার্ঢ্য সে কণ্ঠে—শুধালেন, "আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?" 'আমি কিছু বলিনি।'

দাদা থামলেন।

আমি আড্ডাকে বললুম, 'আমার ভাবী-সাহেবা অতিশয় পুণ্যশীলা রমণী, পাঁচ বেকৎ নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, তসবী টপকান। শামসুল-উলেমার মেয়ে।'

রক শুধালে, 'ওটার মানে কি চাচা?'

আমি বললুম, 'পণ্ডিত-ভাস্কর। তোদের মহামহোপাধ্যায়ের অপজিট্‌ নাম্বার।'

রক শুধালে, 'তারপর?'

আমি বললুম, 'তদন্তর কি হল জানি নে। বৌদি দাদার হাল থেকে কতখানি আমেজ করতে পেরেছিলেন তাও বলতে পারি নে, কারণ ঠিক সেই সময়ে ভাবী-সাহেবা তাঁর স্পিশিলাটি চারপরতি পরোটা ও দেখতে বজ্রের মত কঠোর খেতে কুসুমের মত মোলায়েম শব্‌ডেগ্‌ নিয়ে ঢুকলেন। আমরা খেতে পেলুম বটে কিন্তু কাহিনীটি অনাহারে মারা গেল।'

মশাদা বললে, 'বিলকুল গুল্‌।'

আমি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললুম, 'সাকুল্যে। তাই না বলেছিলুম, গাঁজার গুল।'

অর্থাৎ গুলের রাজা 'গুলম্‌গীর'। তোরা আমাকে আজ ঐ টাইটেলটি দিলি না?'

অনুকরণ না হনুকরণ?

আগে ভাগেই বলে রাখছি, এ-লেখা সমালোচনা নয়।

সমালোচনা লেখবার মতো শক্তি—দুষ্টলোকে বলে, 'শক্তির অভাব'—আমার এবং আমার মতো অধিকাংশ লোকের নেই। গল্পচ্ছলে নিবেদন করি ঃ—

প্রতি রববারে এক বঁড়শে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি মাছ ধরে। বড় মাছের শিকারী তাই ফাতনা ডোবে কালে কস্মিনে, আকছার বরাবরই যায় বিন্ শিকারে। তারই একটু দূরে আরেকটা লোক প্রতি রববারই এসে বসে এবং তামাম দিনটা কাটায় গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওর মাছধরা দেখে দেখে! দুজনায় আলাপ পরিচয় নেই। মাস তিনেক পর ঐ শিকারী লোকটার আলসেমি দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পর একটু বিরক্তির সুরে শুধালে, 'ওহে, তুমি তাহলে নিজেই মাছ ধরো না কেন।'

লোকটা আঁৎকে উঠে বললে, 'বাপ্‌স্! অত ধৈর্য আমার নেই।'

সমালোচনা লেখার ধৈর্য আমার নেই।

আর কি-ই বা হবে সমালোচনা লিখে? কটা সুস্থ-লোক সমালোচনা পড়ে? কটা বুদ্ধিমান-মাছ টোপ গেলে? আলগোছে তফাতে থেকে সমালোচনা প্রবন্ধে একটু-আধটু ঠোকর দেয় অনেকেই—অর্থাৎ রোক্কা পয়সা ঢেলে মাসিকটা যখন নিতান্তই কিনেছে তখন পয়সার দাম তোলবার জন্য একটু-আধটু খোঁচাখুঁচি করে। ফলে চারের রস যত না পেল বঁড়শির খোঁচাতে তার চেয়ে বেশী জখম হয়ে 'দুত্তোর ছাই' বলে তাস-পাশাতে ফিরে যায়।

সমালোচকরা ভাবেন, পাঠকসাধারণ বোকার পাল। ওরা তাঁদের মুখে ঝাল চেখে বই কেনে। তাহলে আর দেখতে হত না। মারোয়াড়ীরা সস্তায় রাবিশ পাণ্ডুলিপি কিনে পয়সা দিয়ে উৎকৃষ্ট সমালোচনা লিখিয়ে রাবিশগুলো খুচকারী (অর্থাৎ খুচরোর লোভে পাইকারীর পরিমাণে) দরে বিক্রি করে ভুঁড়ি বাড়িয়ে নিতো—ফাও হিসাবে দেশে নামও হয়ে যেত, সৎসাহিত্য তথা 'সমালোচকদের' পৃষ্ঠপোষকরূপে।

আমার কথা যদি চট করে বিশ্বাস না করতে পারেন তবে চিন্তা করে দেখুন, আপ্তবাক্য নিবেদন করছি, পয়সা দিয়ে সমালোচনা লেখানো যায়, পয়সা দিয়ে কবিতা

লেখানো যায় না। নাহলে আমেরিকায় ভালো কবির অভাব হত না। সমালোচকের অভাব সেখানে নেই এবং বর্ণে গন্ধে তাঁরা অস্মদ্দেশীয় সমালোচকদেরই মতো।

পলিটিশিয়ানরাও ভাবেন প্রোপাগান্ডিস্ট (অর্থাৎ সমালোচক) দের দিয়ে নিজ পার্টির প্রশংসা কীর্তন করিয়ে নিয়ে বাজিমাত করবেন। কিন্তু ভোটার—ভোটার যা পাঠকও তা—আহাম্মুখ নয়, যদিও সরল বলে সত্য বুঝতে তাঁর একটু সময় লাগে। না হলে আওয়ামীরা মুসলীম লীগকে কস্মিনকালেও হটাতে পারতো না।

আমিও মাঝে-মধ্যে সমালোচনা পড়ি, কারণ আমিও আর পাঁচজন পাঠকের মতো পয়সা ঢেলেই কাগজ কিনি। তবে আমার পড়ার ধরন স্পানিয়ার্ডদের রুটি খাওয়ার মতো। শুনেছি, স্পানিয়ার্ডরা বছরের পয়লা দিন গির্জায় উপাসনা সেরে এসে এক টুকরো রুটি চিবোয়—কারণ প্রভু যীশুখৃষ্ট তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন, 'আজ আমাদের অদ্যকার রুটি দাও'। খানিকটে চিবিয়ে থু থু করে ফেলে দিয়ে বলে, 'তওবা, তওবা, সেই গেল বছরের রুটিরই মত যাচ্ছেতাই সোয়াদ।' তারপর বছরের আর ৩৬৪ দিন সে খায় কোর্মা কালিয়া কটলেট মমলেট। আমিও সমালোচনার শুকনো রুটি বছরের মধ্যে চিবুই মাত্র একটি দিন এবং প্রতিবারই হৃদয়ঙ্গম হয় সমালোচনার স্বাদ-গন্ধ সেই গেল বছরে কিছুমাত্র উন্নতি করতে পারে নি।

কথাটা যে ভাবে বর্ণনা করলুম তাতে পাঠকের ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কিন্তু মোটেই তা নয়। অভিজ্ঞতাটা পাঠকসাধারণ মাত্রেই নিদারুণ নিজস্ব। অবশ্য সমালোচনার কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা একে অন্যের সমালোচনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়ে থাকেন। কেন পড়েন? জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য? রাম রাম! শুধুমাত্র দেখবার জন্য কে তার মতে সায় দিয়েছে, কে দেয় নি এবং সেই অনুযায়ী দল পাকানো ঘোঁট বাড়ানো শক্তি সঞ্চয় করে রুটিটা আগুটা—থাক্।

অবশ্য সমালোচকদের সমালোচনা করার কুবুদ্ধি যদি আমার কখনো হয়—এতক্ষণ যা করলুম সেটা তারই সেতার বাঁধা মাত্র—তা হলে সেটা আপনাদেরই পাতে নিবেদন করবো। তবে ধর্মবুদ্ধি তখনো আপনাদের সাবধান করে দেবে, ও লেখাটা না পড়তে।

* * *

মূল বক্তব্যে আসি। ইদানীং আমি বাঙলার বিভিন্ন জায়গা থেকে, এবং বাঙলার বাইরে থেকেও কয়েকখানা চিঠি পেয়েছি। এঁরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন, 'কি প্রকারে ভালো লেখক হওয়া যায়?'

প্রথমটায় উল্লসিত হয়েছিলাম। যাক, বাঁচা গেল। বাঙলা দেশ তা হলে স্বীকার করেছে, আমি ভালো লেখক। এবারে তা হলে কলকাতা-দিল্লীতে গিয়ে কিঞ্চিৎ তদ্বির করলেই, দুচারটে প্রাইজ পেয়ে যাবো, লোকসভার সদস্যগিরি, কলচেরল

ডেলিগেশনের মেম্বরী এ-সবও বাদ যাবে না। বিদেশ যাবার সুযোগও হয়ে যাবে—বিলেত দেখার আমার ভারী শখ, অর্থাভাবে এতদিন হয়ে ওঠে নি। ইংরিজিটা জানিনে, এতদিন এই একটা ভয় মনে মনে ছিল। এখন বুলগানিন, চু-এন-লেইয়ের কল্যাণে সেটাও গেছে। এঁরা ইংরিজি না জেনে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু হায়, এত সুখ সইবে কেন? আমার গিন্নী নিরক্ষরা; টিপসই করে হালে আদালতে তালাকের দরখাস্ত করেছেন। তালাকটা মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গেই আছেন। তাঁর কাছে চিঠিগুলো পড়ে নিজের মূল্য বাড়াতে গিয়েছিলুম। তিনি করলেন উল্টো অর্থ। সেটা আরো সরল। ব্যবসাতে যে দেউলে হয়েছে, তারই কাছে আসে লোক সলার সন্ধানে; ফেল-করা ছেলে পাস-করার চেয়ে ভালো প্রাইভেট ট্যুটর হয়।

এর উত্তর আমি দেব কি? গৃহিণী যে কটা গল্প জানেন সব কটাই আমার সঙ্গে টায় টায় মিলে যায়। মনে হয় আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ছেলেবেলা থেকে তাঁকে এই তালিমটুকু শুধু দিয়েছেন, স্বামীর গোদা পায়ের গোদটি কি প্রকারে বারে বারে দেখিয়ে দিতে হয়। অবশ্য তার জন্য যে বিশেষ তালিমের প্রয়োজন হয় সেটা অস্বীকার করলেও চলে। ওটা তাদের বিধিদত্ত জন্মলব্ধ অশিক্ষিত-পটুত্ব। যে সব সমালোচকদের কথা পূর্বে নিবেদন করেছি, তাদের বেলাও এই নীতি প্রযোজ্য।

ব্রাহ্মণীর আপ্তবাক্য আমি মেনে নিয়েছি। তিনি তালাকের দুরবস্থাটি উইথড্র করেছেন—শুনে দুঃখিত হবেন।

* * *

শঙ্করাচার্য দর্শনরণাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়ে বলেছিলেন, 'সাংখ্যমল্লকে আহ্বান করো। সেই মল্লদের অধিপতি। তাকে পরাজিত করলে অন্যান্য সফরী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করে অযথা কালক্ষয় করতে হবে না।' আমি শঙ্কর নই। তাই সবচেয়ে সরল প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

প্রশ্নটি এই ঃ 'মপাসাঁর ছোট গল্প অপার আনন্দ দেয়, কিন্তু তাঁর অনুকরণকারীদের গল্প এত বিস্বাদ কেন? অপিচ, মপাসাঁ ছোট গল্প লেখার যে কাঠামো তৈরী করে দিয়ে গিয়েছেন তার অনুকরণ না করে গল্প লিখিই বা কি প্রকারে?'

যাঁরা সঙ্গীত আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছেন তাঁরাই জানেন, ওস্তাদ যেভাবে গান গান তারই হুবহু অনুকরণ করতে হয় ঝাড়া দশটি বছর ধরে। ভারতনৃত্য শিখতে গেলে মীণাক্ষীসুন্দরম্ শিল্পের নৃত্য অনুকরণ করতে হত ততোধিক কাল। স্যাকরায় শাকরেদকে কত বছর ধরে একটানা গুরুর অনুকরণ করে যেতে হয়, তার ঠিক ঠিক খবর আমার জানা নেই। ভারতবর্ষে এই ছিল রেওয়াজ।

সাহেবরা এদেশে এসে বললে, 'এত বেশী অনুকরণ করলে নিজস্ব সৃজনশক্তি

(অরিজিনালিটি) চাপা পড়ে যায়। ফলে কোনো কলার আর উন্নতি হয় না।' কথাটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর মধ্যে অনেকখানি সত্য লুকনো আছে।

কিন্তু তার বাড়াবাড়িতে কি হয়, সেটাও তো নিত্য নিত্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। গুণীজনের উচ্চাঙ্গ সৃষ্টি অধ্যয়ন না করেই, আরম্ভ হয়ে যায় 'এপিক' লেখা, দু'কদম চলতে না শিখেই ডান্‌স্ 'কম্পোজ' করা, আরো কত কী, এবং সর্বকর্মে নামঞ্জুর হলে সমালোচক হওয়ার পন্থা তো সব সময়েই খোলা আছে। সেই যে পুরনো গল্প—শহর-পাগলা ভাবতো, সে বিধবা মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী। পাগলা সেরে গেছে এই রিপোর্ট পাওয়ার পর পাগলাগারদের বড় ডাক্তার তাকে ডেকে পাঠিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে শুধালেন, 'তা তুমি খালাস হওয়ার পর করবে কি?' সুস্থ লোকের মতো বললে, 'মামার বড় ব্যবসা আছে, সেখানে ঢুকে যাবো।' 'সেটা যদি না হয়?' চিন্তা করে বললে, 'তাহলে আমার বি-এ ডিগ্রী তো রয়েছেই—ট্যুইশনি নেব।' তারপরে একগাল হেসে বললে, 'অত ভাবছেন কেন, ডাক্তার? কিছু না হলে যে কোনো সময়ই তো আবার মহারানীর স্বামী হয়ে যেতে পারবো।' সমালোচক সব সময় হওয়া যায়।

তৃতীয় দল অন্য পন্থা নিলে। ওস্তাদদের হুবহু নকল তারা করলে না—তাতে বায়নাক্কা বিস্তর। আবার বিন্ তালিমের 'অরিজিনালিটি' পাঠকসাধারণ পছন্দ করে না। উপায় কি? তাই তারা ওস্তাদদের কতকগুলি বাছাই বাছাই জিনিস অনুকরণ করলে এবং শুধু অনুকরণই না, বাছাই বাছাই জিনিসগুলোর মাত্রা দিলে বাড়িয়ে।

চার্লি চ্যাপলিন একবার নাম ভাঁড়িয়ে গোপনবাসের জন্য গেছেন চিলির এক অজানা শহরে। বেড়াতে বেড়াতে দেখেন, দেয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপন 'সোমবার রাত্রে শহরের কনসার্ট ঘরে চার্লি চ্যাপলিনের নকল করার প্রতিযোগিতা হবে। ভ্যাগাবন্ড চার্লির বেশভূষা পরিধান করে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে স্টেজের ইস্‌পার উস্‌পার হতে হবে চার্লি ধরনে। সর্বোৎকৃষ্ট অনুকরণের পুরস্কার পাঁচশ' টাকা।'

চার্লি ভাবলেন, এখানে তো কেউ তাঁকে চেনে না, দেখাই যাক না, প্রতিযোগিতায় ছদ্মনামে নেমে কি হয়।

ছাব্বিশ জন প্রতিযোগীর ভিতর চার্লি হলেন বারো নম্বর।

তার সরল অর্থ ঐ ছোট শহর, ধেড়ধেড়ে ডিহি গোষ্ঠিপুরে বারোজন ওস্তাদ রয়েছেন যাঁরা চার্লিকে হাতে কলমে দেখিয়ে দিলেন চার্লির পার্ট কি করে প্লে করতে হয়!

চার্লি শিরে করাঘাত করে বলেছিলেন, 'হা ভগবান, আমার অভিনয় যদি এই বারো জনের মতো হয় তবে আমি আত্মহত্যা করে মরবো।'

ব্যাপারটা হয়েছে, চার্লি যেখানে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা দিয়ে হৃদয়ের গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেন এঁরা সেটাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে মস্করাতে পরিণত করেছেন, চার্লি

যেখানে চোখের জলের রেশ মাত্র দেখিয়েছেন এঁরা সেখানে হাউমাউ করে আসমান-জমীন ফাটিয়ে আড়াই ঘটি চোখের জল ফেলেছেন, চারুকলার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে চার্লি যেখানে অখণ্ড সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রশান্ত শিব সৃষ্টি করেছেন সেখানে তারা প্রত্যেক অঙ্গে ফাইলেরিয়ার গোদ জুড়ে বানিয়ে তুলেছেন এক একটি বিকট মর্কট।

ঘরোয়া উপমা দিতে হলে বলি, ভেজাল সরষের তেলেরই বড় বেশী সোনালী ঝাঁঝ—মারাত্মক তুখোড়।

রবীন্দ্রনাথের দোদুল দোলা, 'ব্যাকুল বেণু', 'উদাস হিয়াকে', 'দোলাতর', 'বেণুতর', করে নিত্য নিত্য কত না নবনব মস্করা হচ্ছে। কিন্তু তবু চার্লি বেঁচে গেছেন। কারণ আর যা ই হোক মার্কিন মুল্লুক পরশু দিনের গড়া দেশ। ভেজালে এদের অভিজ্ঞতা আর কতটুকু? প্রাচীন চীনের কাহিনী শ্রবণ করুন।

একদা চীন দেশে এক গুণীজ্ঞানী চরিত্রবলে অতুলনীয় বৌদ্ধ শ্রমণের আবির্ভাব হয়। যেমন তাঁর মধুর সরল শিশুর মতো চলাফেরা-জীবনধারা, তেমনি তাঁর অদ্ভুত বচনবিন্যাস! বুদ্ধের কীর্তিকাহিনী তিনি কখনো বলতেন বলদীপ্ত কণ্ঠে, কখনো সজল করুণ নয়নে—তথাগতেরই মতন তখন তাঁর সৌম্যবদন দেখে আর উৎসাহের বচন শুনে বহুশত নরনারী একই দিন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতো। ক্রমে তাঁর মাতৃভূমির সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের জয়ধ্বনি বেজে উঠলা, বুদ্ধের জীবনাদর্শ বহু পাপীতাপীকে ধর্মের মার্গ অনুসরণে অনুপ্রাণিত করলো।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার পর তার মৃত্যুক্ষণ কাছে এল। তাঁর মন কিন্তু শান্ত, তাঁর চিত্ত নিষ্কম্প প্রদীপশিখাবৎ। শুধু একটি চিন্তা-বাত্যা ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মুমূর্ষু প্রদীপশিখাকে বিতাড়িত করছে। শিষ্যেরা বুঝতে পেরে সবিনয় জিজ্ঞেস করলে, সেবাতে কোনো ত্রুটি হচ্ছে কি না।

গুরু বললেন, 'না। ইহলোক ত্যাগ করতে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আমার মাত্র একটি ভাবনা। আমার মৃত্যুর পর আমার কাজের ভার কে নেবে?'

শিষ্যেরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর চরিত্রবল কে পেয়েছে, তাঁর বক্তৃতাশক্তি কার আছে যে এ-কঠিন কাজ কাঁধে নেবে।

গুরু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

এমন সময় অতি অজানা এক নূতন শিষ্য সামনে এসে বলে, 'আমি ও ভার নিতে পারি।'

গুরুর বদনে প্রসন্নতার দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠলো। তবু ঈষৎ দ্বিধার কণ্ঠে শুধালেন, 'কিন্তু বৎস, তোমাকে তো আমি চেনবার অবকাশ পাই নি। তুমি কি সত্যই ও কাজ পারবে? ঐ দেখো, আমার দীর্ঘদিনের শিষ্যেরা সাহস না পেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা দেখি, তুমি অমিতাভের জীবনের যে কোনো বিষয় নিয়ে একটি

বক্তৃতা দাও তো।'

বিস্ময়! বিস্ময়!—সেই শিষ্য তখন গলা খুলে গাধার মতো, হুবহু গাধার মতো, চেঁচিয়ে উঠলো। কিছু না, শুধু গাধার মতো চেঁচালো।

সবাই বাক্যহীন নিস্পন্দ।

ব্যাপার কি?

গুরুর মাত্র একটু সামান্য ত্রুটি ছিল। তিনি বক্তৃতা দেবার সময় অন্য বক্তাদের তুলনায় একটু বেশী চিৎকার করে কথা বলতেন। ভুঁইফোঁড় শিষ্য ভেবেছে ভালো করে চেঁচাতে পারাতেই উত্তম বক্তৃতার গূঢ় রহস্য। ঐ কর্মটি সে করতে পারলে তাবৎ মুশকিল হবে আসান। তাই সে চ্যাঁচানোয় চ্যাম্পিয়ন রাসভরাজের মতো চেঁচিয়ে উঠেছে।

আমার গুরুদেবের পিতৃতুল্য অগ্রজ সত্যদ্রষ্টা, প্রাতঃস্মরণীয় ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন,

'To imitate-এর বাঙলা, অনুকরণ।

To ape-এর বাঙলা, হনুকরণ।'

এ স্থলে রাসভকরণ।

কিসের সন্ধানে?

হটেনটট্‌দের কথা আলাদা। শিক্ষালাভের জন্য তারা যেখানে খুশি যেতে পারে। একথা তাদের ভাবতে হয় না, 'যে-শিক্ষা লাভ করতে যাচ্ছি সেটা আমার দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাবে তো?' কারণ কোনো প্রকারের ঐতিহ্যের কণামাত্র বালাই তাদের নেই।

ইংরেজ শাসনের ফলে আমরা প্রায় হটেনটটের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছিলুম। আর কয়েকটি বৎসর মাত্র ইংরেজ এদেশে থাকলে আমরা একে অন্যকে কাঁচা খেয়ে ফেলতে আরম্ভ করতুম।

ইংরেজ গিয়েছে। তাই এখন প্রশ্ন উঠেছে আমরা বিদ্যা লাভ করতে যাব কোন দেশে? এতদিন এ প্রশ্ন কেউ শুধাতো না। টাকা থাকলেই ছোকরারা ছুটতো হয় অক্সফোর্ডের দিকে নয় কেমব্রিজ পানে। সেখানে সীট না পেলে লন্ডন কিংবা এডিনবরা।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। এই ভারতবর্ষে একদিন বিদ্যাশিক্ষার এমনি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল যে, গান্ধার, কাম্বোজ, বল্‌হীক, তিব্বত, শ্যাম, চীন থেকে বিদ্যার্থী শ্রমণ এদেশে

আসত সত্যজ্ঞান লাভ করার জন্য! এবং বিংশ শতকে দেখলুম, এই ভারতবর্ষের লোকই ধেয়ে চলেছে ইংলন্ডের দিকে 'বিদ্যালাভের' জন্য। ভারতীয় ঐতিহ্য তখন তার দুরবস্থার চরমে পৌঁছেছে!

রাধার দুরবস্থা যখন চরমে পৌঁছেছিল, তখন যমুনায় জল উজান বয়েছিল, একথা তাহলে মিথ্যা নয়।

কিন্তু আমাদের ছেলেরা যে ইংলন্ডের পানে উজান স্রোতের মতো বয়ে চলেছিল, সেটা তো আর রাতারাতি বন্ধ করে দেওয়া যায় না—পরাধীনতা মুর্গীটার গলা কাটা যাওয়ার পরও সে খানিকদূর পর্যন্ত ছুটে যায়, তারপর ধপ করে মাটিতে পড়ে। তাই এই বেলা জমাখরচ নিয়ে নেওয়া ভালো, ভারতীয় ছেলে ইয়োরোপে পেত কি, যেত কিসের আশায়?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করার সময় বলেছিলেন, ইয়োরোপকে আমরা চিনলুম ইংলন্ডের ভিতর দিয়ে—তাই আমাদের প্রায় সকলেরই বিশ্বাস ইংলন্ড আর ইয়োরোপ একই জিনিস। ইংলন্ডের অনেক গুণ আছে সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না, কিন্তু ইয়োরোপীয় বৈদগ্ধ্যভাণ্ডারে যে ইংলন্ড তেমন কিছু হীরে মাণিক জমা দিতে পারে নি সে কথাও সত্য। ইয়োরোপীয় বৈদগ্ধ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুতুবমিনার বলতে যাঁদের নাম মনে আসে—মাইকেল এঞ্জেলো, রদাঁ, রাফায়েল, সেজান, বেটোফেন, ভাগনার, গ্যোটে, টলস্টয়, দেকার্ত, কাণ্ট, পাসত্যোর, আইনস্টাইন ইংলন্ডে জন্মাননি। তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে যেন ফ্রান্স, জর্মনি, ইটালী, রুশ থেকে গুণীজ্ঞানীরা এসে এদেশের ছেলেমেয়েদের সামনে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেন।

রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন বহু গুণী শান্তিনিকেতনে এসেছেন, বহু ছাত্র তাঁদের কাছ থেকে নানা প্রকারের বিদ্যা আহরণ করেছে, কিন্তু আজ শান্তিনিকেতনে সে-মেলা আর বসে না। তবু আমার বিশ্বাস, বাঙালী যদি আত্মবিশ্বাস না হারায় তবে এই শান্তিনিকেতনেই—দিল্লী এলাহাবাদ, আহমদাবাদে নয়—এই শান্তিনিকেতনের পঞ্চবটীর তলায়ই একদিন পঞ্চমহাদেশ সম্মিলিত হবে। আমাদের দেখতে হবে, এই পঞ্চবটী যেন ততদিনে শুকিয়ে না যায়।

ভারতীয় ছেলে যে ইংলন্ডে পড়াশোনা করতে যেত তার কারণ এই নয় যে, তাদের সবাই ধরে নিয়েছিল ইংলন্ডই ইয়োরোপের প্রতীক—তারা ধরে নেয় নি যে, ইয়োরোপ থেকে যা কিছু শেখবার মত আছে তার তাবৎ সম্পদ অক্সফোর্ড কেমব্রিজেই পাওয়া যায়। এদের ভিতর অনেক ছেলেই জানতো, শিল্পকলার জন্য ফ্রান্স এবং বিজ্ঞান দর্শনের জন্য জর্মনিতেই গঙ্গোদক পাওয়া যায়—অভাববশতঃ তারা যে তখন কূপোদকের সন্ধানে যেত তাও নয়। তার একমাত্র কারণ চাকরি দেবার বেলা ইংরেজ এ জলেরই কদর দেখাতো বেশী। (এতে আশ্চর্য হবার মত কিছু নেই; আয়ানও

চাইতেন না যে রাধা যমুনার জল আনতে যান, পাছে কৃষ্ণের সঙ্গে সেখানে তাঁর দেখা হয়ে যায়—ইংরেজও চাইত না যে ফ্রান্স, জর্মনি গিয়ে আমরা সভ্য ইয়োরোপকে চিনে ফেলি। আয়ান ইংরেজ দুইজনই তাই কূপোদক-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র)।

জানি আমার পাঠকমাত্রই টিপ্পনি কাটবেন আমি বড্ড বেশী প্রাদেশিক কিন্তু তাই বলে তো আর ডাহা মিথ্যে কথা বলতে পারিনে। নিবেদন করতে বাধ্য হচ্ছি যে ইংলন্ড বর্জন করে তবু যে কয়টি ছেলে প্যারিস বার্লিন, ম্যুনিক, ভিয়েনায় জ্ঞানের সন্ধানে যেত তাদের অধিকাংশই বাঙালী।

আশা করি একথা কেউ বলবেন না যে, বাঙালীর ট্যাঁকে এত বেশী কড়ি জমে গিয়েছিল যে, সেগুলো ওড়াবার তালে সে প্যারিস যেত, জর্মনি ঘুরত। বরঞ্চ বাঙালীর বদনাম সে চাকরির সন্ধানে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। এক অখ্যাতনামা বাঙালী কবি চাকরি বাঁচানো সম্পর্কে আপিস ধাবমান বাঙালী কেরানীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন,—

ভরা পেটে ছুটতে মানা? চিবিয়ে খাওয়া
স্বাস্থ্যকর?
চাকরি আগে বাঁচাই দাদা, প্রাণ বাঁচানো
সে তারপর।

যে অন্নের জন্য বাঙালী কেরানীগিরি করে সেই অন্ন পর্যন্ত বাঙালী কেরানী ধীরেসুস্থে খেয়ে আপিস যেতে পারে না। এত বড় প্যারাডক্স্ এত বড় স্বার্থত্যাগ বাঙ্গলা দেশের বাইরে আপনি পাবেন না।

আমি বলি—আর আপনার কথায় কান দেব না—বাঙালীরই ঈষৎ রসবোধ ছিল, তাই সে প্যারিস যেত।

প্যারিসে একপ্রকারের হতভাগা চিত্রকরের দল আছে—এদের নাম পেভমেন্ট আর্টিস্ট। এরা আবার দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এদের ভিতর যারা কিঞ্চিৎ খানদানি তারা আপন ছবি ফুটপাথের রেলিঙের উপর ঝুলিয়ে রেখে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আপনি যদি কোনো ছবি সম্বন্ধে কিছু জানতে চান তবে সে পরম উৎসাহে আপনাকে বাৎলে দেবে ছবিটার তাৎপর্য কি। আপনি যদি সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ দেখান তবে সে তার তাবৎ ছবির ঠিকুজি-কুলজি, নাড়ী-নক্ষত্র সবকিছু গড় গড় করে বলে যাবে, আর যদি-স্যাৎ আপনি একখানা ছবি কিনে ফেলেন—এ জাতীয় অলৌকিক ঘটনা অতিশয় রাঙা শুক্কুরবার ছাড়া কখনো দৃষ্টিগোচর হয় না—তবে সে আপনাকে 'ও রিভোয়া' জানাবার সময় কানে কানে বলে দেবে, 'এ ছবি কিনে আপনি ভুল করেন নি, মসিয়ো—এ ছবি দেখবার জন্য তামাম পৃথিবী একদিন আপনার দোরের গোড়ায় ধন্না দেবে।'

অবশ্য ততদিন সে উপোস করে। শেষটায় সে-দিন না দেখেই সে মরে—

শীতে এবং ক্ষুধায়।

এদের চেয়েও হতভাগা চিত্রকর আছে। তাদের রঙ আর ক্যানভাস কেনবার পয়সা পর্যন্ত নেই। তাই তারা রঙিন খড়ি দিয়ে ফুটপাথের একপাশে ছবি এঁকে রাখে। প্যারিসের ফুটপাথে বারোমাস পুজোর ভিড়—তাই এদের ছবি আঁকতে হয় অপেক্ষাকৃত নির্জন ফুটপাথে। সেখানে পয়সা পাবার আশাও তাই কম।

এসব ছবি তো আর কেউ বাড়ি নিয়ে যেতে পারে না, তাই ছবি দেখে খুশী হয়ে কেউ যদি চিত্রকরের হ্যাটের ভিতর—বলতে ভুলে গিয়েছিলুম হ্যাটটা ছবির একপাশে চিৎ করে পাতা থাকে—দু'টি পয়সা ফেলে দেয় তবে সেটা ভিক্ষে দেওয়ার মতই হ'ল। এ শ্রেণীর চিত্রকররা অবিশ্যি বলে, 'পয়সাটা ভিক্ষে নয়, পিকচার গ্যালারির দর্শনী। দর্শনী দিয়েছ বলে কি তোমাকে গ্যালারির ছবি বাড়ি নিয়ে যেতে দেয়?' হক্ কথা।

এদের যদি বেশী পয়সা দিয়ে বলেন, 'ঐ ছবিটা তুমি আমাকে ক্যানভাস আর রঙ কিনে ভালো করে এঁকে দাও', তবে সে পয়সাটা সীনের জলে ফেলারই সমান। এ শ্রেণীর চিত্রকরের সঙ্গে বোতলবাসিনীর বড্ড বেশী দহরম-মহরম।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলে মন উদাস হয়ে গিয়েছিল। তাই বেড়াতে বেরিয়েছি আর দেশের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি ফুটপাথের উপর অলৌকিক দৃশ্য। পদ্মানদীর গোটা ছয়েক ছবি রঙিন খড়ি দিয়ে আঁকা। ছবিগুলো ভালো না মন্দ সেকথা আমি এক লহমার তরেও ভাবলুম না। বিদেশ-বিভুঁইয়ে দেশের লোক পেলে সে পকেটমার না শঙ্করাচার্য, সেকথা কেউ শুধায় না।

বৃষ্টি নামলেই ছবিগুলো ধুয়ে মুছে যাবে। আর্টিস্টের দিকে তাকালুম। শতচ্ছিন্ন কোট পাতলুন। হাতে বেয়ালা। বাঙালী।

আমাকে দেখে তার মুখের ভাব কণামাত্র বদলালো না। বেয়ালাখানা কানের কাছে তুলে ধরে ভাটিয়ালি বাজাতে আরম্ভ করল।

হাড্ডিসার মুখ, ঠোঁট দুটো অনবরত কাঁপছে, চোখ দুটিতে কোনো প্রকারের জ্যোতির বিন্দুমাত্র আভাস নেই, একমাথা উস্কোখুস্কো চুল, কিন্তু সব ছাড়িয়ে চোখে পড়ে তার কপালখানা। এবং সে কপাল দেখে স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে, এরকম কপালী মানুষ বিদেশ-বিভুঁইয়ে ভিক্ষে মাঙছে কেন?

তাকে পাশের কাফেতে টেনে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে বিস্তর বেগ পেতে হয়েছিল। আমার কোনো কথার উত্তর দেয় না, আমার চেয়ে দেড় মাথা উঁচু বলে তার দৃষ্টি আমার মাথার উপর দিয়ে কোথায় কোন দূরান্তে গিয়ে ঠেকেছে তার সন্ধান নেই। একবার হাত ধরে বললুম, 'চলুন, এককাপ কফি খাবেন', ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে ফেলল।

আমি নিরাশ হয়ে চলে যাচ্ছি দেখে হঠাৎ হ্যাটটা তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে

চলল। পাশের কাফেতে বসে আমি শুধালুম, 'কফি? চা?' মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো। আমি মনে মনে বুঝতে পেরেছিলুম সে কি চায়; কিন্তু সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবার জন্যই চা কফির প্রস্তাব পেড়েছিলুম। শেষটায় শুধালুম, 'তবি কি খাবেন?'

একটি কথা বললো, 'আবসাঁৎ।'

দুনিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক মাদক দ্রব্য! শতকরা আশীভাগ তাতে এলকহল। এ মদ মানুষ তিন চার বৎসরের বেশী খেতে পারে না। তারই ভিতরে হয় আত্মহত্যা করে, নয় পাগল হয়ে যায়, না হয় এলকহলিক বিভীষিকা দেখে দেখে এক মারাত্মক রোগে চীৎকার করে করে শেষটায় ভিরমি গিয়ে মারা যায়। ইঁদুরছানার নাকের ডগা এ মদে একবার চুবিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলে সে মিনিট তিনকের ভিতর ছটফট করে মারা যায়।

কী বিকৃত মুখ করে যে আর্টিস্ট আবসাঁৎটা খেল, তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। মনে হল, পানীয় যেন আগুন হয়ে পেটে ঢুকতে চায় বলে নাড়ীভুঁড়ি উল্টে গিয়ে বমি হয়ে বেরতে চায়, আর সমস্ত মুখে তখন ফুটে ওঠে অসহ্য যন্ত্রণার বিকৃততম বিভীষিকা। চোখ দুটো ফুলে উঠে যেন বাইরের দিকে ছিটকে পড়ে যেতে চায়, আর দরদর করে দুচোখ দিয়ে জল নেমে আসে।

আমি মাত্র একটা আবসাঁতের অর্ডার দিয়েছিলুম, সেটা শেষ হতেই আমার দিকে না তাকিয়ে নিজেই গোটাতিনেক অর্ডার দিয়ে ঝপাঝপ গিল্‌লো।

আমি চুপ করে আপন কফি খেয়ে যাচ্ছিলুম।

গোটাচারেক আবসাঁৎ সে ততক্ষণে গিলেছে। তখন দেখি সে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য এর চোখে এল কোত্থেকে?

হঠাৎ বললো, 'আর কেন ছোকরা, এইবার কেটে পড়ো, বীট ইট্, গে ভেক্, ভিৎ ভিৎ!' ক'টা ভাষায় যে সে আমাকে পালাতে বললো তার হিসেবই আমি রাখতে পারলুম না।

আমি চুপ করে বসে রইলুম—নড়ন-চড়ন নট-কিচ্ছু।

একগাল হেসে বলল, 'দেখলি? আমি ভিখিরি নই। এই ভাষা ক'টি ভাঙ্গিয়েই আমি তোর চেয়ে দামী সুট পরতে পারবো, বুঝলি? আবসাঁৎ দিয়ে প্যারিস শহর ভাসিয়ে দিতে পারবো, বুঝলি, কমপ্রাঁ, ফের্‌শট্‌হেস্ট ডু, পন্নিময়েশ?' আবার চলল ভাষার তুবড়ি।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে খানিকক্ষণ হাসলো। শুধালো, 'ছবি আঁকতে এসেছিস এ দেশে? না হলে আর্টিস্টের উপর দরদ কেন, বাপু? তা তোর অজন্টার কি হল? না বাগ-গুহা? কিংবা মোগল? অথবা রাজপুত?'

তারপর হঠাৎ হো হো করে হেসে কুটি কুটি। 'অবনবাবু? নন্দলাল? যামিনী

রায়? এনারা সব আর্টিস্ট! কচু!'

আমি তবু চুপ।

বললে, 'অ-অ-অ। সেজান্, রেনোয়া, গোগাঁ, আঁরি মাতিস্? বল না রে ছোকরা।'

আমি পূর্ববৎ।

'তবে শোন্ ছোকরা। এদের কাছ থেকে কিচ্ছুটি শেখবার নেই, তোকে সাফসফা বলে দিচ্ছি। আমার কথা শোন্! আর্ট জিনিসটা কি? আর্ট হচ্ছে—'

বলে সে আমায় প্রথম আর্ট সম্বন্ধে একখানা লেকচার শোনালে। সেই গ্রীকদের আমল থেকে নন্দনশাস্ত্রের ইতিহাস শুরু ক'রে হঠাৎ চলে গেল ভরত দণ্ডিন মম্মট ভট্টে। সেখান থেকে গোঁত্তা খেয়ে নাবলো টলস্টয়ে—মধ্যিখানে গ্যোটেকে খুব একহাত নিল। তারপর বদলের, মালার্মে। শেষ করল জেমস জয়েসকে দিয়ে।

আরো বিস্তর কাব্য, নাট্য, চিত্রের সে উল্লেখ ক'রে গেল, যার নাম আমি বাপের জন্মে শুনিনি।

তারপর ঝপ ক'রে আরেকটা আবসাঁৎ গিলে বললো, 'উহুঁ! তোর চোখ থেকে বুঝতে পারছি ছবির তুই বুঝিস কচুপোড়া। একবার একটা সাড়া পর্যন্ত দিলিনে। তবে কি তোর শখ মূর্তি গড়াতে? অশোকস্তম্ভের সিঙ্গি, গান্ধারের বুদ্ধ, মথুরার অমিতাভ, এলেফেন্টার ত্রিমূর্তি, মাইকেল এঞ্জেলার মোজেস, নটরাজ? বল না?'

তারপর ঝাড়লে আরেকখানা লেকচর। দুনিয়ার কোন যাদুঘরের কোন কোণে মূর্তি লুকনো আছে, সব খবর নখাগ্র-দর্পণে।

এই রকম ক'রে লোকটা আর্টের যত শাখা-প্রশাখা আছে তার সম্বন্ধে আপন মনে কখনো মাথা নেড়ে নেড়ে, কখনো শব্দ ওজন ক'রে ক'রে, কখনো গড়গড়িয়ে মেল গাড়ির তেজে, কখনো বক্রোক্তি ক'রে, আর কখনো বা সন্দেহের দোদুল-দোলায় দুলে ব্যাখ্যান দিল। এদেশ ওদেশ সেদেশ সব দেশ-মহাদেশের সর্বপ্রকারের আর্ট বস্তুর পাঁচামেশালি বানিয়ে।

এরকম পণ্ডিত আমি জীবনে আর কখনো দেখিনি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে সে চুপ করে আর থাকতে দিল না।

বোধ হয় নেশা একটু কমে গিয়েছিল; তাই চাপ দিয়ে শুধালো, 'বল্, তুই এদেশে এসেছিস কি করতে?'

আমি না পেরে ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, 'লেখাপড়া শিখতে।'

খুব লম্বা একখানা 'অ-অ-অ-' এনে বললো।

'তা তো শিখবি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওয়াইন, শ্যাম্পেন, আবসাঁৎ? তার কি হবে? নানা প্রকারের ব্যামো? তার কি হবে? অদ্ভুত অদ্ভুত নয়া নয়া ইনকিলাবী মতবাদ? তার কি হবে?'

*　　*　　*

এই হল মুশকিল। আবসাঁৎ ব্যামোর চেয়েও ভয়ঙ্কর অর্ধসিদ্ধ অর্ধপক্ক মতবাদ। শুধু ইনকিলাবী নয়, অন্য পাঁচরকমেরও।

আজ পর্যন্ত যেটুকু এদেশে এসেছে তাকেই আমরা সামাল দিতে পারছিনে। আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের শিক্ষার সঙ্গে তাকে কি করে মিল খাওয়াবো, বুঝে উঠতে পারিনে। অথচ পশ্চিমের সঙ্গে লেনদেনও তো বন্ধ ক'রে দেওয়া যায় না। উপায় কি?

চরিত্র পরিচয়

গল্প শুনেছি, ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন আর স্কচ এই চারজনে মিলে একটা চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করল। বন্দোবস্ত হল সবাই কিছু সঙ্গে নিয়ে আসবেন। ইংরেজ নিয়ে এল বেকন আর আণ্ডা, ফরাসী নিয়ে এল এক বোতল শ্যাম্পেন, জর্মন নিয়ে এল ডজনখানেক সসেজ, আর স্কচম্যান—? সে সঙ্গে নিয়ে এল তার ভাইকে?

এ জাতীয় বিস্তর গল্প ইয়োরোপে আছে। স্কচদের সম্বন্ধে গল্প আরম্ভ হলেই মনে মনে প্রত্যাশা করতে পারবেন যে গল্পটার প্রতিপাদ্য বস্তু হবে, হয় স্কচ্‌দের হাড়কিপ্‌টেমিগিরি নয় তাদের হুইস্কির প্রতি অত্যধিক দুর্বলতা। ওদিকে আবার বিশ্বসংসার জানে স্কচরা ভয়ঙ্কর গোঁড়া ক্রীশ্চান আর মারাত্মক রকমের নীতিবাগীশ (বঙ্গজ হেরম্ব মৈত্র তুলনীয়)। তাই এই তিনগুণে মিলে গিয়ে গল্প বেরল;—

এক স্কচ পাদ্রী এসেছেন লন্ডনে, দেখা করতে গেছেন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে। গিয়ে দেখেন হৈহৈ রৈরৈ, ইলাহি ব্যাপার, পেল্লাই পার্টি, মেয়েমদ্দে গিসগিস করছে। বন্ধুর স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে কাচুমাচু হয়ে পাদ্রীকে অভ্যর্থনা জানালেন। কারণ জানতেন, স্কচ পাদ্রীরা এরকম পার্টি পরবের মাতলামো আদপেই পছন্দ করেন না। অথচ ভদ্রতাও রক্ষা করতে হয়; তাই ভয়ে ভয়ে শুধালেন—

'একটুখানি চা খাবেন?'

পাদ্রী হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'নো টী!'

আরো ভয়ে ভয়ে শুধালেন—

'কফি?'

'নো কফি!'

'কোকো?'

'নো কোকো!'

ভদ্রমহিলা তখন মরীয়া। মৃদুস্বরে, কাতরকণ্ঠে শেষ প্রশ্ন শুধালেন—'হুইস্কি

সোডা?'

'নো সোডা!'

অথচ কলকাতায় একবার অনুসন্ধান করে আমি খবর পাই, যে-সব ব্রিটিশ এদেশে দানখয়রাত করে গিয়েছেন তাঁদের বেশীর ভাগই স্কচ্—ইংরেজের দান অতি নগণ্য। তারপর বিলেতে খবর নিয়ে জানলুম স্কচরা হুইস্কি খায় খুব কম, বেশীর ভাগ রপ্তানি করে দেয়, আর নিজেরা খায় বিয়ার!

ঠিক সেই রকমই বিশ্বদুনিয়ার বিশ্বাস, ফরাসী জাতটা বড্ডই উচ্ছৃঙ্খল। পঞ্চ-মকার নিয়ে অষ্টপ্রহর বেএক্তেয়ার। তাই ইংরিজি 'ক্যারিইঙ কোল্ টু নিউকাসল'-এর ফরাসী রূপ নাকি 'টেকিঙ এ ওয়াইফ টু প্যারিস'।

এ প্রবাদটি আমি ফরাসী ভাষায় শুনি নি; শুনেছি ইংরেজের মুখে ইংরিজি ভাষাতে। তাই প্যারিস গিয়ে আমার জানবার বাসনা হল ফরাসীরা সত্যই উপরের প্রবাদবাক্য মেনে চলে কি না?

খানিকটা চলে, অস্বীকার করা যায় না। যৌন ব্যাপারে ফরাসীরা বেশ উদার কিন্তু একটা ব্যাপার দেখলুম তারা ভয়ঙ্কর নীতিবাগীশ। ফষ্টিনষ্টি তারা অনেকখানি বরদাস্ত করে—অবশ্য নিয়ম, সেটা যেন বিয়ের পূর্বে না করে পরেই করা হয়—কিন্তু সেই ফষ্টিনষ্টি যদি এমন চরমে পৌঁছয় যে স্ত্রী স্বামীকে কিংবা স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তবে ফরাসী মেয়েমদ্দ দু দলই চটে যায়। 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠানটিকে ফরাসী জাত বড়ই সম্ভ্রমের সঙ্গে মেনে চলে। তাই পরকীয়া প্রেম যতই গভীর হোক না কেন তারই ফলে যদি কোনো পরিবার ভেঙে পড়ার উপক্রম করে তবে অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, নাগর-নাগরী একে অন্যকে ত্যাগ করেছেন।

কাজেই মেনে নিতে হয়, এ ব্যাপারে ফরাসীদের যথেষ্ট সংযম আছে।

ঈষৎ অবান্তর, তবু হয়তো পাঠক প্রশ্ন শুধাবেন, তা হলে এই যে শুনতে পাই প্যারিসে হরদম ফুর্তি সেটা কি তবে ডাহা মিথ্যে?

নিশ্চয়ই নয়। প্যারিসে ফুর্তির কমতি নেই। কিন্তু সে ফুর্তিটা করে অ-ফরাসীরা। যৌন ব্যাপারে ইংরেজের ভণ্ডামি সকলেই অবগত আছেন—লরেন্স্ সেটা বিশ্বসংসারের কাছে গোপন রাখেন নি। তাই ইংরেজ মোকা পেলেই ছুটে যায় প্যারিসে। পাড়াপ্রতিবেশী তো আর সেখানে সঙ্গে যাবে না—বেশ যাচ্ছেতাই করা যাবে। শুধু ইংরেজ নয় আরো পাঁচটা জাত আসে, তবে তারা আসে খোলাখুলি সরাসরিভাবে—ইংরেজের মত 'ফরাসী আর্ট' দেখার ভান করে না। কোনো জর্মনকে যদি বার্লিনে শুনতে পেতুম বলছে, 'ভাই হপ্তাখানেকের জন্য প্যারিস চললুম' তখন সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেতুম আর পাঁচজন মিটমিটিয়ে হাসছে—অবশ্য প্রথম জর্মনও সে হাসিতে যোগ দিতে কসুর করছে না।

তা সে যাই হোক, একটা প্রবাদ আমি বিশ্বাস করি। ফরাসীরা বলে

'পারফিডিয়স অ্যালবিয়ন' অর্থাৎ 'ভণ্ড ইংরেজ'। একটি গল্প শুনুন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার খবর শুনে এক পেন্সন-প্রাপ্ত বুড়ো শিখ মেজর জিজ্ঞেস করলেন, 'কে কার বিরুদ্ধে লড়ছে?'

'ইংরেজ-ফরাসী জর্মনির বিরুদ্ধে।'

সর্দারজী আপশোস করে বললেন, ফরাসী হারলে দুনিয়া থেকে সৌন্দর্যের চর্চা উঠে যাবে আর জর্মনি হারলেও বুরী বাৎ, কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান কলাকৌশল মার যাবে। কিন্তু ইংরেজের হারা সম্বন্ধে সর্দারজী চুপ।

'আর যদি ইংরেজ হারে?'

সর্দারজী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তবে দুনিয়া থেকে বেইমানী লোপ পেয়ে যাবে।।'

'বাঁশবনে—'

প্যারিসের এক সুবিখ্যাত 'গুর্মে' অর্থাৎ 'খুশখানেওলা' বা ভোজন-রসিক একবার তুর্কীতে বেড়াতে যান। ইউরোপে উত্তম ভোজনের মক্কা-মদীনা যে রকম প্যারিস, এশিয়া-আফ্রিকায় সেই রকম তুর্কী। অন্তত ইয়োরোপীয়দের বিশ্বাস তাই—যদিও আমার ব্যক্তিগত ধারণা প্রাচ্যদেশীয় ভোজন-মক্কা তুর্কী নয়—দিল্লী, লখনউ, আগ্রা। কিন্তু সে-কথা থাক্।

প্যারিস-গুর্মের কন্‌স্‌তুন্‌তুনিয়া (কন্‌স্‌টানটিনোপোল) আগমনবার্তা সেখানকার ভোজন-রসিক সমাজে ছড়িয়ে পড়তে বেশীদিন লাগল না। তাঁদের চক্রবর্তী যে পাশা ও মার্গে বহুদিন ধরে সাধনার ফলে স্বর্গত মহামান্য আগা খানকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, তিনি প্যারিসের গুর্মেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নৈশভোজনে নিমন্ত্রণ জানালেন—গুর্মেও তারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলেন।

সে-ভোজনের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বরঞ্চ যে এখনও ইউরোপীয় সঙ্গীত শোনে নি তাকে বেটোফেন সমঝাতে আমি রাজী আছি।

গুর্মে পরের দিনই প্যারিস রওয়ানা দিলেন। তাঁর তীর্থদর্শন সমাপন হয়েছে—তিনি তো আর সিন্‌সোফিয়া মসজিদ দেখতে কন্‌স্‌তুন্‌তুনিয়া আসেন নি।

প্যারিসে ফিরে যাওয়া মাত্রই সেখানকার গুর্মে-সমাজ তাঁকে শুধালে, 'কী রকম খেলে?'

তিনি বললেন, 'অপূর্ব, অপূর্ব! এ-রকম খানা এ-জন্মে কখনও খাই নি। তুর্কী গিয়ে আমার উদর ধন্য হয়েছে, আমার রসনা তার চরম মোক্ষলাভ করেছে।'

এবম্প্রকার বহুবিধ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর তিনি কিঞ্চিৎ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন

করলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু...'

সবাই বললে, 'কিন্তু?'

'পদ ছিল বড্ড বেশী।'

ভোজন-মার্গে যাঁরা মন্ত্রসিদ্ধ তাঁরাই শুধু এ বাক্যের অর্থ বুঝতে পারবেন।

কেউ যখন বলে 'ওঃ, যা খাইয়েছে! ডাল ছিল চার রকমের, পোলাও ছিল পাঁচ রকমের, অমুক ছিল তমুক রকমের---'

তখন আমার ভুরু ইঞ্চিখানেক উপরের দিকে ওঠে।

চার রকমের ডাল? লোকটা কি তবে জানে না তার বাড়িতে কোন ডাল সবচেয়ে ভাল রান্না হয়? আর চার রকমের ডাল এবং পাঁচ রকমের পোলাও-ই যদি আপনি খান তবে রসগোল্লা সন্দেশে পৌঁছবেন কী করে? যদি বলেন, 'রুচির পার্থক্য রয়েছে, তাই চার রকমের ডাল', তবে শুধাই সার্থক কবি সুন্দরীর বর্ণনা কালে কি পঁচিশটা বিশেষণ দিয়ে বলেন, 'রুচি-মাফিক তোমার বিশেষণটা বেছে নাও' কিংবা চিত্রকর হনুমানের ছবি আঁকার সময় তাঁর পশ্চাদ্দেশে পাঁচটা পাঁচ রকমের ন্যাজ এঁকে দিয়ে বলেন, 'পছন্দ-সই তোমার ন্যাজটা বেছে নাও।'

কাগজে পড়েছি ডাচেস্ অব উইনজার কখনও সূপ খেতে দেন না। ডিনারের অবতরণিকায় গাদা-গুচ্ছের তরল বস্তু পেটে ঢুকিয়ে দিলে বাদবাকী পদ মানুষ ভাল করে খাবে কী করে? অতিশয় হক্ কথা। আমার ভাল পাচক নেই বলে আমি পারতপক্ষে কাউকে নিমন্ত্রণ করি নে। যদিস্যাৎ করি, তবে ছোট্ট একটি টমাটো ককটেল দিই (শেরির গেলাস-ভর্তি টমাটো রস এবং দশ ফোঁটা 'মাগ্‌গী'—তদভাবে উস্টার সস্ + চার ফোঁটা তাবাস্কো সস্---তদভাবে চীনা চিলি সস্—তদভাবে এক চিমটি লাল লঙ্কাগুঁড়ো + প্রয়োজনীয় নুন। এসব ভাল করে মিশিয়ে খুশবায়ের জন্য উপরে অতি সামান্য গোল মরিচর গুঁড়ো ভাসিয়ে দেবেন)। এটা মদ্য নয়, এটা খাদ্য নয়—ক্ষুধা-উত্তেজক মাত্র।

তবে রেস্তোরাঁর কথা আলাদা। কারণ রেস্তোরাঁয় তাবৎ চৌষট্টি পদ খাবার জন্য কেউ পীড়াপীড়ি করে না। ভোজে আপনি পদের পর পদ স্কিপ করতে থাকলে গৃহস্বামী তথা অন্য নিমন্ত্রিতেরা সন্দ করবেন, আপনি একটা স্নব্। রেস্তোরাঁয় সে-আশঙ্কা নেই।

এবং ভাল রেস্তোরাঁতে আ লা কার্তের বাহান্ন পদ থাকার পরও গোটাতিনেক তাব্‌ল্ দ্যোৎ (table d'hote) বা ফিক্‌স্‌ড্ দামে ফিক্‌স্‌ড্ পদের ভোজন থাকে। যেমন মনে করুন দু টাকাতে আছে (১) সেলেরি সূপ, (২) রোস্ট মাটন্ (৩) পুডিং, আড়াই টাকাতে (১) সেলেরি সূপ, (২) বয়েল্‌ড্ ফিশ, (৩) রোস্ট মাটন, (৪) পুডিং; এবং তিন টাকাতে আছে (১) সেলেরি সূপ, (২) বয়েল্‌ড্ ফিশ্, (৩) রোস্ট চিকেন্, (৪) পুডিং কিংবা আইসক্রীম।

এই তাব্‌ল্‌ দ্যোৎ বাতলে দেবার প্রধান উদ্দেশ্য ডোমকে বাঁশ বাছতে সাহায্য করা। বিশেষ করে এই সাহায্যের প্রয়োজন মহিলাদেরই বেশী। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, মহিলারা মেনু কার্ড অর্থাৎ আ লা কার্ত হাতে নিলে পুরুষদের কী হয়। ওই ফাঁকে মর্নিং ওয়াক সেরে এসে দেখবেন, ম্যাডাম তখনও মনস্থির করতে পারেন নি কোন সূপ তার বিম্বাধর ছুঁয়ে কম্বু কণ্ঠ পেরিয়ে লম্বোদরে বিলম্বিত হবেন। ইতিমধ্যে ওয়েটারের দাড়ি গজিয়ে গিয়েছে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘড়ির কাঁটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে—অবশ্য আসলে তা নয়, ইতিমধ্যে পাকা চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে।

দা-ঠাকুরের পাইস হোটেলে মেনু বাছতে আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না। কখন তেতো খেতে হয় আর কখনই বা টক, সে-তত্ত্ব আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। আমাদের সময়ে পাইস্‌ হোটেলে তাব্‌ল্‌ দ্যোৎও থাকত। ওই জিনিস সে দিন রান্না হয়েছে লাটে; কাজেই সেইটে সেদিন অর্ডার দিলে ভোজনপর্ব সমাধান হত সস্তায়।

সায়েবী হোটেলে গিয়ে আমরা পড়ি বিপদে। সে-রেস্তোরাঁ যদি আবার উন্নাসিক হয়, তবে প্রায় সমস্ত মেনুখানাই লেখা থাকে ফরাসী ভাষায়। 'বাছুরের কাটলেট' নাম দেখে আপনি হিন্দুস্তানী আঁতকে উঠলেন, কিন্তু ওইটেই হয়তো খেতে দেখলেন আপনার মুসলমান বন্ধুকে। শুধালেন, 'কি বস্তু?' বললে, 'এস্কালপ দ্য ভো ভিয়েনোওয়াজ'—তাতে বাছুরের নাম গন্ধ নেই, 'ভো যে বাছুর আপনি জানবেন কি করে? আপনি তাই দিব্যি অর্ডার দিয়ে বসলেন। রেস্তোরাঁ যদি আরেক কাঠি সরেস হয়, তবে ওই বস্তুরই নাম পাবেন জর্মনে—'ভিনার স্নিৎসেল্‌'। 'স্নিৎসেল্‌' অর্থ 'এস্কালপ', তার মানে ইংরিজিতে স্ক্যাপল, সোজা বাংলায় 'মাংসের টুকরো'। ওটা কিসের মাংস তার কোনো হদিস ওতে নেই। শূয়রেরও 'স্নিৎসেল' হয়, চীনদেশে হয়তো কুকুরেরও হয়। শুনেছি, আমাদের মুনিঋষিরা গণ্ডার খেতেন। অনুমান করি, তাঁরা তা হলে গণ্ডারের 'স্নিৎসেল্‌' খেতেন।

আমি ইংরিজি জানি নে। মুসলমান মুরুব্বীদের কাছে শুনেছি শূয়রের মাংসের নাম ইংরিজিতে 'পর্ক' এবং ওটা খাওয়া মহাপাপ। তাই 'পর্কচপ' না খেয়ে আশ্বস্ত হতুম ধর্মরক্ষা করেছি। তার পর একদিন আবিষ্কার করলুম 'হ্যাম', 'বেকন' শূয়রের মাংস, এমন কী ওই মাংসের কটলেট, সসেজও হয়—এবং মেনুতে তার উল্লেখও থাকে না। আবিষ্কারের পর অহোরাত্র জলস্পর্শ করি নি এবং মোল্লাবাড়িতে গিয়ে 'তওবা' অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত করেছিলুম। মোল্লা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'অজান্তে খেলে পাপ হয় না।' কিন্তু আমার পাপিষ্ঠ মন চিন্তা করে দেখলে, অজান্তে খেলেও স্বাদে ভাল লাগতে পারে।

কিন্তু ইংরিজি রেস্তোরাঁ বাবদে আমার আপনার বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তা নেই। বন্ধুবান্ধবদের ভিতর আকছারই দু-একজন বিলেত-ফেরতা থাকেন। মেনু সম্বন্ধে

তাঁদের সুগভীর জ্ঞান দেখাবার মোকা পেয়ে তাঁরা বিমলোল্লাস অনুভব করেন, আমরাও উপকৃত হই। তদুপরি 'বয়' যখন বিল হাজির করে, তখন আমি হঠাৎ জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে থাকি—এটিকেট-দুরস্ত বিলেত-ফেরতাকেই এ ক্ষেত্রে বিল শোধ করতে হয়। উদাস, ভাবালু হওয়ার ভান করতে পারলে বিস্তর লাভ।

বাঙালীর দুর্বলতা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বা ইংলিশ্ রান্নার প্রতি নয়—তার প্রাণ ছোঁক ছোঁক করে মোগলাই রান্নার জন্য। কিন্তু মেনু পড়তে জানে না বলে যা-তা অর্ডার দিয়ে বসে এবং নিতান্ত পয়সা ঢেলে দিয়েছে বলে সেটা যখন অতি অনিচ্ছায় খায়, তখন দেখতে পায়, পাশের টেবিলে এক ভাগ্যবান ঠিক সেই সেই জিনিসই পরম পরিতোষ সহকারে খাচ্ছে, যে-সব খাবার সৎ-কামনা নিয়ে সে রেস্তোরাঁয় এসেছিল।

একেই বলে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস!

জীবনের মেজর ট্র্যাজেডি বা 'অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস'-এর নির্ঘণ্ট যদি দিতে হয়, তবে আমার প্রথম যৌবনের প্রথমা প্রিয়া যে আমাকে জিল্ট করেছিলেন সেটার উল্লেখ আমি করব না, কিন্তু এটার উল্লেখ অতি অবশ্য করব। সুখাদ্যের জিলটিং ভোলার জন্য একটা জীবন যথেষ্ট দীর্ঘ নয়।

বাঙালী-রান্না বললে কি বোঝায় সেটা আমরা মোটামুটি জানি কিন্তু সব বাঙালী-রান্না এক রকম নয়। পূব আর পশ্চিম বাংলার রান্নাতে এন্তার তফাত। পূবের রান্নাতে ঝালের প্রাচুর্য, পশ্চিমের রান্নাতে চিনি। কে যেন বলেছিল, 'মাই মোটর কার ইজ সাউন্ড ইন্ ইভ্রি পার্ট, এক্সেপ্ট্ ইন দি হর্ন—ঠিক সেই রকম পশ্চিম-বাংলার রান্নাতে 'শুগার ইন্ এভ্রিথিং এক্সেপট্ ইন্ রসগোল্লা।'

সব মোগলাই রান্না এক রকমের নয়। কলকাতায় এই কয়েক বছর পূর্বেও প্রচলিত ছিল একমাত্র 'কলকাত্তাই মোগলাই' রান্না। হালে 'লাহোরী মোগলাই'ও প্রচলিত হয়েছে। দেশ বিভাগের পর লাহোর-পিণ্ডির 'শেখ'রা দিল্লীর কনট সার্কাসে এসে 'পাঞ্জাবী মোগলা'ই রান্না প্রবর্তন করেন (দিল্লীর মোগলাই এখন চাঁদনী চৌকে আশ্রয় নিয়েছে) এবং তারই ব্রাঞ্চ এখন কলকাতা এসে পৌঁছেছে।

এ রান্নার বৈশিষ্ট্য তিনটি জিনিসে;—

(১) আফগানী নান্। কলকাতার আদিম ও অকৃত্রিম নান্-রুটির (ফার্সীতে 'নান্' শব্দেরই অর্থ রুটি—'নান্-রুটি' তাই হুবহু পাঁউরুটির মত, কারণ পর্তুগীজ 'পাঁউ' শব্দের অর্থ রুটি) সঙ্গে এর অতি অল্প মিল। আফগানী নান্ দৈর্ঘ্যে প্রায় একহাত এবং আকারে অনেকটা সিংহল দ্বীপের ন্যায়। রুটির পাশগুলো মোলায়েম, মধ্যিখানটা বিস্কুটের মত ক্রিস্প্ (ওই দিয়ে ভোজনের শেষ অঙ্কে দিব্য 'চীজ অ্যান্ড বিস্কিট্'ও খাওয়া যায়)। এই নান্ আপনি কতখানি মোলায়েম বা ক্রিস্প্ খেতে

পছন্দ করেন সেটা দু-চার দিন খাওয়ার পরেই খানসামাকে বলে দিতে পারবেন।

(২) তন্দুরী মাছ। মাঝারি সাইজের একটা আস্ত মাছ সাফসুতরো করে, মশলাদি মাখিয়ে তন্দুর-(আভ্‌ন)-এর ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যখন বেরিয়ে আসে তখন মনে হয়, বোধ হয় ভালমত রান্না হয় নি। কিন্তু খেয়ে দেখবেন অপূর্ব স্বাদ। আমাদের বাড়িতে তন্দুর নেই বলে আমরা পাঞ্জাবীদের এই 'তন্দুরী ফিশ্‌' অবদানটি মুক্তকণ্ঠে এবং সরস জিহ্বায় মেনে নিয়েছি।

(৩) তন্দুরী চিকেন্‌। এতে প্রায় কোনো মশলাই ব্যবহার করা হয় না বলে এ-জিনিস যত খুশী খান, অসুখ করবে না। অতি মোলায়েম এবং উপাদেয়। আস্ত মুর্গীটি হাত দিয়ে ভাঙবেন এবং হাত দিয়েই নান্‌ সহযোগে খাবেন—ছুরি-কাঁটার পাশ মাড়াবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে শিক-কাবাব, শামী-কাবাব, বড়ী-কাবাব, মিশ্‌রী-(মিশরীয়) কাবাব অল্প অল্প খেতে পারেন। একটুখানি গ্রেভি-ওলা ভিজে বস্তুর প্রয়োজন হলে কোফতা-নরগিস্‌ (অনেকটা ডেভিলের মত) অর্ডার দিতে পারেন। আমি কিন্তু এ-পর্বে শুকনোই পছন্দ করি।

উপরোল্লিখিত এক, দুই তিন নম্বরের জিনিস খাস কলকাত্তাই মোগলাই রেস্তোরাঁয় পাবেন না। তবে শুনেছি, ইদানীং কোনো কোনো রেস্তোরাঁ চাপে পড়ে রাখতে আরম্ভ করেছেন।

এবার ভেজার পালা।

মটন পোলাও, চিকেন পোলাও, আণ্ডা পোলাও এবং মটর পোলাও। ফিশ পোলাও অল্প রেস্তোরাঁয় পাওয়া যায়।

এর সঙ্গে দুনিয়ার জিনিস খেতে পারেন। কোর্মা, কালিয়া, দোলমা, রেজালা যা খুশি। যাঁরা ঝাল খেতে ভালবাসেন অথচ অসুখের ভয়ে খান না, তাঁরা 'দহী ওলা-গোশ্‌ৎ'—অর্থাৎ দই মাংস (সাধারণত মটনের হয়)—খাবেন। দিল্লিওলারা যে এত ঝাল খেয়েও কাল কাটাচ্ছে তার একমাত্র কারণ, হয় দহি-ওলা গোশ্‌ৎ খায় নয় খাওয়ার পর এক ভাঁড় টকদই খায়।

পেটটাকে যদি আরও ধাতস্থ রাখতে চান তবে খাবেন 'শাক-ওলা গোশ্‌ৎ'—অর্থাৎ শাকের সঙ্গে মাংস। এটা শিখদের প্রিয় খাদ্য—যে রকম ওরা করেলার ভিতর কিমা মাংস পুরে দোলমা খায়।

আর ঝাল ফর্জী রওগন যুস, শাহী কুর্মা এবং লাটের মাল চিকেন কারি, মটন কারি ইত্যাদি তো রয়েছেই। ভেজিটেরিয়ানদের জন্য মটর-পোলাও এবং চীজ আলু কিংবা চীজ মটর কারি। তবে মাংসহীন সাদা পোলাওয়ের সঙ্গেই চীজ-মটর ঝোল মানায় বেশী।

আমি মটর পোলাওয়ের সঙ্গে মটন কিংবা চিকেন্‌ কারি খাই; কারণ মটন-

পোলাওয়ের সঙ্গে মটন-কারিতে মটনের বাড়াবাড়ি হয়, আবার চিকেন পোলাওয়ের সঙ্গে মটন কারিতে দুটো মাংসের ককটেলকে আমার গুবলেট বলে মনে হয়। তবে এটা নিছকই রুচির কথা। আর ভুলবেন না, গ্রেভির অপ্রাচুর্য হলে, সব সময়ই ওটা আলাদা করে অর্ডার দেওয়া যায়।

সর্বশেষ উপদেশ বয়স্ক ওয়েটারকে মেনু বাছাই করার সময় ডেকে নিয়ে তার সদুপদেশ নেবেন। না নিলে কি হয়?

এক ইংরেজ স্নব গেছেন প্যারিসের রেস্তোরাঁয়। তিনি কারও উপদেশ নেবেন না। মেনুর প্রথম পদে আঙুল দিয়ে বোঝালেন কী চাই। নিশ্চয়ই সূপ। এল তাই। উত্তম প্রস্তাব।

তারপর আঙুল নামালেন অনেকখানি নীচে। ভাবলেন মাছ, মাংস, আণ্ডা কিছু একটা আসবে। এল আবার সূপ। ইংরেজ জানতেন না ফরাসীরা বাইশ রকমের সূপ রাখে।

খেয়েছে! এখন কী করা যায়? আঙুল দিলেন সর্বশেষ পদে। পুডিঙ্ কিংবা আইসক্রীম হবে।

এল খড়কে—টুথ পেক্!!

বেদে

ঝাড়া বিয়াল্লিশ বছর মিশরে চাকরি করার পর ইংরেজ রাস্‌ল্ পাশা (পাশা খেতাবটি তিনি মিশরীয় সরকারের কাছে পান) একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছেন। সা'দ জগলুল পাশা থেকে আরম্ভ করে বহু বাঘ বৃহৎ চিড়িয়ার সঙ্গে তাঁর বিস্তর যোগাযোগের ফলে এই কেতাবখানি লেখা হয়েছে।

এমন কি বেদেরাও এ বইয়ে বাদ পড়েনি। রাস্‌ল্ পাশার মতে মিশরের বেদেরা আসলে ভারতীয়। শুধু তাই নয়, রাস্‌ল্ পাশা পৃথিবীর আর সব পণ্ডিতের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন পৃথিবীর সব বেদেরই ভাষা নাকি আসলে ভারতীয়—তা সে ইউরোপীয় বেদেই হোক আর চীনে বেদেই হোক।

পণ্ডিত নই, তাই চট্ করে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ইউরোপীয় বেদেরা ফর্সায় প্রায় ইংরেজদের সামিল, সিংহলের বেদে ঘনশ্যাম। আচার-ব্যবহারেও বিস্তর পার্থক্য, বহুৎ ফারাক। আরবিস্থানের বেদেরা কথায় কথায় ছোরা বের করে, জর্মনীর বেদেরা ঘুঁষি ওঁচায় বটে, কিন্তু শেষটায় বখেড়ার ফৈসালা হয় বিয়ারের বোতল টেনে। চীন দেশের বেদেরা নাকি রূপালি ঝরণাতলায় সোনালী চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে

চুকুস্ চুকুস্ করে সবুজ চা চাখে।

তবু আজ স্বীকার করি গুণীরাই হক্ কথা বলেছেন।

*　　*　　*

আমার বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ। আজ যেখানে জর্মনীর রাজধানী, সেই সাদা-মাটা বন্ (Bonn) শহরে আমি তখন কলেজ যাই। এগারোটার ঝোঁকে কলেজের পাশের কাফেতে বসে এক পাত্র কফি খাই ও সময়টায় বনের মত আধা-ঘুমন্ত-পুরীর কাফেতে খদ্দেরের ঝামেলা লাগে না। খদ্দের বলতে নিতান্ত আমারই মত দু একটি কফি-কাতর প্রাণী।

সেদিনও তাই। আমি এককোণে কফি সাঙ্গ করে উঠি-উঠি করছি এমন সময় অন্য কোণের কাউন্টারে, আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল এসে এক বেদেনী। গোলাপী স্কার্ট, বেগুনী ব্লাউজ লাল-নীলে ডোরা কাটা স্কার্ফ, মিশকালো খোঁপা-বাঁধা চুল। কেক্ আর কফির গুঁড়ো কিনতে এসেছে।

সওদা শেষ হয়ে গেলে পর যখন সে ঘুরে দাঁড়াল তখন হঠাৎ তার চোখ পড়ল আমার উপর। প্রথমটায় থ হয়ে তাকিয়ে রইল প্যাট প্যাট করে। তারপর কি এক বিজাতীয় ভাষায় চীৎকার করে সোল্লাসে এগিয়ে এল আমার দিকে। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় সর্বমুখ টমাটোর মত লাল করে অনর্গল বকে যেতে লাগল সেই 'যাবনিক' ভাষায়। সে ভাষা আমার চেনা-অচেনা কোনো ভাষারই চৌহদ্দি মাড়ায় না, কিন্তু শোনালো—তারই মুখের মত—মিষ্টি।

আমি জর্মনে বললুম, 'আমি তো আপনার ভাষা বুঝতে পারছিনে।'

মেয়েটি মুখ করল আরও লাল। বুঝলুম, চটেছে। ফের চালাল সেই তুবড়ী বাজী—সেই বিজাতীয় বুলিতে। কিছুতেই জর্মন বলতে রাজী হয় না।

আমি কাতর হয়ে কাফের মালিককে বললুম, 'একে বুঝিয়ে বলুন না, আমি ভারতীয়; এর ভাষা বুঝতে পারছিনে।'

আমার সকরুণ নিবেদনটা শেষ হওয়ার পূর্বেই মেয়েটা হুঙ্কার দিয়ে কাফেওয়ালাকে পরিষ্কার জর্মনে বলল, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। আমরা বেদে, ভারতবর্ষ আমাদের আদিম ভূমি। এও ভারতীয়। আমার জাত-ভাই। ভদ্রলোক সেজেছে, তাই আমার সঙ্গে কথা কইতে চায় না।'

আমি আর কি বলব? পণ্ডিতেরাও তো এই মতই পোষণ করেন। তবু বললুম, 'কিন্তু সত্যি বলছি, আমি আপনার ভাষা বুঝতে পারছিনে।'

চোখে-মুখে—এমন কি আমার মনে হল চুলে পর্যন্ত—ঘেন্না মেখে মেয়েটা গটগট করে কাফে-থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বোকা বনে তাকিয়ে রইলুম।

কয়েক মিনিট পরে জানলার দিকে নজর যেতে দেখি সেই মেয়েটি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কফির দাম পূর্বেই চুকিয়ে দিয়েছিলুম—চুপ করে বেরিয়ে

পড়ে তার মুখোমুখি হলুম।

ধবধবে দাঁতে হাসির ঝিলিক লাগিয়ে আমায় অভ্যর্থনা করে নিয়ে বললো—দুত্তোর ছাই আবার সেই বিজাতীয় ভাষায়—কি বললো, খোদার মালুম। গড় গড় করে চোখে-মুখে হাসি মেখে সুডৌল দুখানি বাহু দুলিয়ে, সর্বাঙ্গে সৌন্দর্যের ঢেউ তুলে।

আমি আবার জর্মনে বললুম, 'সত্যি ফ্রলাইন (কুমারী), আমি তোমার ভাষা বুঝতে পারছিনে।'

কেউটে সাপের মত ফণা তুলে যেন আমাকে ছোবল মারতে এল। আমি তড়াক করে তিন কদম পিছিয়ে গেলুম।

হঠাৎ মেয়েটা কি যেন ভেবে নিয়ে আবার হাসিমুখে বলল,—যাক্ বাঁচাল, এবার জর্মনে—'সব মানুষেরই কিছু-না-কিছু পাগলামি থাকে, তোমার বুঝি মাতৃভাষায় কথা না বলার? তা আমি সেটা সয়ে নিলুম। কিন্তু কেন এ স্নবারি, আপন ভাষাকে অবহেলা, কাফের লোকের সামনে আপন জনকে অস্বীকার করা? তাই তো তোমাকে বাইরে ডেকে আনলুম।'

আমি বললুম, 'তোমার আপন জন হতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আমি তো তা নই।'

ফের ফণা তুলতে গিয়ে নিজেকে চেপে নিয়ে বলল, 'তোমার আপন জন নই আমি? দেখো দিকিনি তোমার রঙ আর আমার রঙ মিলিয়ে—একই বাদামী না? হাঁ, আমার একটু সোনালী বটে—তা সে আমি রোদবৃষ্টিতে ঘোরাঘুরি করি বলে। দেখো দিকিনি চুলের রঙ—মিশকালো, ঢেউ খেলানো। নিজের চোখ দেখনি কখনো আয়না দিয়ে?—আমার চোখের রঙ তোমারই মত কালো। আর সব জর্মনদের দিকে তাকিয়ে দেখো, হাবা-গবার দল, শ্বেত কুষ্ঠের মত সাদা, মাগো!'

আমি চুপ।

বলল, 'বুঝতে পেরেছি, বাপু, বুঝতে পেরেছি; বাপ তোমার দু'পয়সা রেখে গিয়েছে—হঠাৎ নবাব হয়েছ। এখন আর বেদে বলে পরিচয় দিতে চাও না! হাতে আবার খাতাপত্র—কলেজ যাও বুঝি? ভদ্রলোক সাজার শখ চেপেছে, না?'

আমি বললুম, 'ফ্রলাইন, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার সাতপুরুষ লেখাপড়া করেছে, আমিও তাই করছি। ভদ্রলোক সাজা না-সাজার কোনো কথাই উঠছে না।'

মেয়েটি এমনভাবে তাকালো যার সোজা অর্থ 'গাঁজা গুল'। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভারতীয় নও?'

আমি বললুম, 'আলবৎ!'

আনন্দের হাসি হেসে বলল, 'ভারতীয়েরা সব বেদে।'

আমি বললুম, 'সুন্দরী, তোমরা ভারতবর্ষ ছেড়েছ হাজার, দু'হাজার বছর কিংবা

তারও পূর্বে। বাদবাকী ভারতীয়রা এখনো গেরস্থালী করে।'

কিছুতেই বিশ্বাস করে না। বলল, 'তোমার সঙ্গে আর কাঁহাতক খামকা তর্ক করি। তার চেয়ে চলো আমার সঙ্গে। আমাদের সার্কাসের গাড়ি শহরের বাইরে রেখে এসেছি। বাবা, মা সেখানে। তোমাকে পেলে ভারি খুশী হবেন। তাঁদের সঙ্গে তর্ক করো। তখন বুঝবে ঠ্যালা কারে কয়। বাবা সব জানে। কাচের গোলার দিকে তাকিয়ে সব বাৎলে দেবে।'

অনেকক্ষণ ধরে এ রকম ধারা কথা হয়েছিল। আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না, আমি বেদে নই, স্নব নই, সাদা-মাটা ভারতীয়।

* * *

এ-কথাটা কিন্তু সেদিন সাফ সাফ বুঝে গেলুম, দু'হাজার কিংবা তার বেশি বছর ধরে যাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি তারা যদি বিদেশ-বিভুঁইয়ে দেখামাত্র আমাকে ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি আমাদের আপন জন' তখন কি করে বুক ঠুকে বলি—যদিও জানি, আজ আমাদের ভাষা আলাদা, আচার-ব্যবহার আলাদা—যে ওরা ভারতীয় নয়??

ধূপছায়া

জাহাজে শেষ রাত্রি। পরদিন ভেনিস পৌঁছব।

তিনদিন ধ'রে কারো মুখে আর কোনো কথা নেই—শেষরাত্রে যে জব্বর ফ্যান্সি বল হবে তাই নিয়ে সুবো-শাম জল্পনা-কল্পনা। মহিলারা কে কি পরবেন, তাই ভেবে ভেবে আকুল হয়ে উঠছেন কিন্তু কে কোন বেশ ধরবেন সে কথা একে অন্যের কাছ থেকে একদম চেপে যাচ্ছেন। নিতান্ত বিপদে পড়লে তবু বরঞ্চ কোনো পুরুষের শরণাপন্ন হওয়া যায়, কিন্তু স্ত্রীলোক?—নৈব নৈব চ। বুঝলুম, আমাদের দেশে ভুল বলে না 'বরঞ্চ যমের হাতে স্বামীকে তুলে দেব তবু সতীনের হাতে নয়'। এস্থলে বরঞ্চ অপরিচিত হুলোর সাহায্য কবুল, তবু কোনো মেনির ছায়া মাড়াব না।

আমি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, বয়সে চ্যাংড়া, ২৪ হয় কি না হয়। ভয়ে কারোর সঙ্গে কথা কইনে, পাছে এটিকেটের ব্যাকরণ ভুল হয়ে যায়। আমার কেবিনে—বিবেচনা করুন খুদ কেবিনে, 'ডেকে' না 'লাউঞ্জে' না—এক গরবিনী ফরাসিনী ভামিনী এসে উপস্থিত, 'মসিয়ো, তিন সত্যি দাও কাউকে বলবে না, তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি।'

বাপ মা আদর করে বলতেন আমার নাকি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। আমি বিলক্ষণ জানি, আমার বর্ণ কি। আমারই এক বন্ধু আমার রঙ দেখিয়ে দোকানদারকে বলেছিলেন ঐ রঙের বুট-পালিশ দিতে। লজ্জায় সেই বর্ণ টিকেয় আগুন ধরার রঙ

চড়ালো! সাতবার খাবি খেয়ে বললুম, 'ইয়েস, ইয়েস, উই, উই; বিলক্ষণ, বিলক্ষণ!'

বললেন, 'আপনার সিল্কের পাগড়িটা এক রাত্রের মত ধার দিন।' আমার মত কালো কুচ্ছিৎকে তিনি প্রেমনিবেদন করবেন দুরাশা আমি করি নি কিন্তু নিতান্ত গদ্যময়ী পাগড়ি! কে বলে ফরাসিনী সুরসিকা?

তা যাক্‌গে—এইটে আসল বক্তব্য নয়। মোদ্দা কথা এই করে করে ফ্যান্সি বল 'রূপায়িত' হল।

ইলাহি ব্যাপার, পেল্লাই কাণ্ড। শিখের বাচ্চা দাড়িমাড়ি বাগিয়ে ভলগা-মাঝির পোশাক পরে নাচছে চীনা পাজামা-কুর্তা পরা নধরা ভিয়েনা-সুন্দরীর সঙ্গে, বগলে ঝাড়ু দেবে মেথরানীর বেশ পরে ফরাসিনী ধেই ধেই করছেন স্প্যানীয় রাজপুত্রের বেশে মিশকালো নিগ্রোর সঙ্গে, রেড ইন্ডিয়ানের রঙ মেখে জাপানী তুর্কী-নাচন নাচছে এক পার্সী নারীর সঙ্গে—তার সর্বাঙ্গ প্যাকিঙের ব্রাউন-পেপার মোড়া তদুপরি কালো হরফে লেখা 'ফ্রেজাইল, উইথ কেয়ার'—'কাচের বস্তু, ভঙ্গুর, সাবধানে নাড়াচাড়া করো।'

এসব বস্তু রপ্ত হতে বাঙালী ছেলের সময় লাগে।

আমি কি পরে গিয়েছিলুম তা আর বলব না। একেই তো মর্কটের মত চেহারা, তাকে 'ফিন্‌সি' করলে বড়ি শুকনোর সময় কাগ তাড়াবার জন্য পাড়ায় ডাক পড়বে।

বারে গিয়ে দাঁড়ালুম।

উঃ! চ্যাংড়া-চিংড়ীরা কী বেদম ফুর্তিটাই না করতে জানে। হোলির দিনে যেমন মানুষ গায় রঙ মাখে এরা ঠিক তেমনি দু পাত্তর রঙিন জল গিলে মনে রঙ লাগিয়ে নিয়েছেন ঃ চোখ অল্প অল্প গোলাপি হয়ে গিয়েছে—বিশ্ব সংসার গোলাপি রঙে ছোপানো বলে মনে আমেজ লাগছে। না হয় খর্চা হয়েই গেল—শেষ কড়ি খর্চা না করলে খুদা আরো পয়সা দেবেন কি করে? না হয় নাচলই লক্ষ্মীছাড়া মেরিটা ঐ খাটাশ-মুখো সেপাইটার সঙ্গে তোমাকে ছোলাগাছি দেখিয়ে—ভয় কি, আরো মেলা মেরি ফেনী রয়েছে। মনে আর এক পোঁচ রঙ লাগিয়ে লাও হে লাটুবাবু, বাবুরা যখন অত করে কইছেন। বেবাক বাৎ ভুলে যাবে। অত সিরিয়াস হয়ো না মাইরি, এই শেষ পরবের রাত্তিরে।

তার সঙ্গে এ কোণে ও কোণে, হেথা-হোথা একে অন্যের কানে কানে কত 'মৃদু মর্মর গানে মর্মের বাণী বলা', কত 'বেদনার পেয়ালা' ভরে গেল হিয়ায়, কত গান উঠলো বুকে বুকে, 'পিয়ো হে পিয়ো'।

অর্‌কেস্ট্রা কিন্তু ঢাক ঢোল কত্তাল বাজিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে—

'ওগো, ডনা ক্লারা, তোমাকে আমি নাচতে দেখেছি
ওগো, ডনা ক্লারা, তোমার সোনার ছবি বুকে এঁকেছি।'

* * *

বাইরে এসে ডেকের সুদূরতম প্রান্তে একখানা চেয়ার টেনে একলাটি চুপ করে বসলুম। সিগার সিগরেটের অত্যাচারে সমুদ্রের লোনা হাওয়া জলসাঘরে নাক গলাতে পারেনি; আমাকে পেয়ে খুশী হয়ে আমার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে গেল।

আজ কি অমাবস্যা? এরকম অন্ধকার শ্রাবণ-ভাদ্রের মেঘাচ্ছন্ন অমাযামিনীতেও দেশে কখনো দেখিনি। গাছপালা, বাড়িঘরদোর যেন অন্ধকারের খানিকটে শুষে নেয় বলে ডাঙ্গার অন্ধকার সমুদ্রের অন্ধকারের চেয়ে অনেকখানি হাল্কা। এখানে দিনের বেলাকার নীল সমুদ্র আর নীল আকাশ রাত্রি বেলায় যেন এক হয়ে গিয়ে জমে উঠে গড়ে তুলছে এক ঘনকৃষ্ণ অন্ধ-প্রাচীর, না—আরো কাছে এসে আমার চোখে মাখিয়ে দিয়ে গেছে কৃষ্ণাঞ্জন।

শুধু চিলিক মেরে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে প্রপেলারের তাড়ায় ভেসে-ওঠা ফেনা আর বুদ্বুদ। ঐ ফেনাটুকু মাঝে মাঝে না দেখতে পেলে মনে ভয় জাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছি, জলসাঘরের দিকে ছুটে গিয়ে আলো দেখে সেখান থেকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে হত।

জাহাজের হৃৎপিণ্ড যেন ধপ্ ধপ্ করছে—তাই অষ্টপ্রহর একটা একটানা মৃদু শিহরণ জাহাজের সর্বাঙ্গে লেগেই আছে। সে শিহরণ এমনিতেই দেহমনে অস্বস্তি জাগায় কিন্তু আজ এই মৃত্যু-অন্ধকারে সে স্পন্দন যেন আমার চৈতন্যবোধকে গভীরতম সুষুপ্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখল।

কান্নার শব্দ?

তাজা হাওয়া পাওয়ার জন্য কে যেন সুদূর জলসাঘরের একখানি জানলা খুলে দিয়েছে। তারই ক্ষীণ আলোতে দেখি একটি মেয়ে রেলিঙে মাথা রেখে কাঁদছে।

এ মেয়ে সিঙ্গাপুর গিয়েছিল তার স্বামীর সঙ্গে হনি-মুন যাপন করতে। সেখানে তার স্বামী হঠাৎ মারা যায়। দেশে ফিরে যাচ্ছে একা॥

রসগোল্লা

'চুঙ্গিঘর' কথাটা বাঙলা ভাষাতে কখনও খুব বেশী চালু ছিল না বলে আজকের দিনে অধিকাংশ বাঙালী যদি সেটা ভুলে গিয়ে থাকে তবে তাই নিয়ে মর্মাহত হবার কোনো কারণ নেই। ইংরিজিতে একে বলে 'কাষ্টম্ হাউস', ফরাসীতে 'দুয়ান', 'জর্মনে ৎস্‌ল্-আম্‌ট্', ফার্সীতে 'গুমরুক্' ইত্যাদি। এতগুলো ভাষাতে যে এই লক্ষ্মীছাড়া প্রতিষ্ঠানটার প্রতিশব্দ দিলুম তার কারণ আজকের দিনে আমার ইয়ার, পাড়ার পাঁচু, ভূতো সবাই সরকারী , নিম-সরকারী, মিন-সরকারী পয়সায় নিত্যি নিতি কাইরো-

কান্দাহার প্যারিস-ভেনিস সর্বত্র নানাবিধ কনফারেন্স করতে যায় বলে আর পাকিস্তান হিন্দুস্থান গমনাগমন ত আছেই। ওই শব্দটি জানা থাকলে তড়িঘড়ি তার সন্ধান নিয়ে আর পাঁচজনের আগে সেখানে পৌঁছতে পারলে তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ওটাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা কস্মিনকালেও করবেন না। বরঞ্চ রহমত কাবুলীকে তার হক্কের কড়ি থেকে বঞ্চিত করলে করতেও পারেন কিন্তু তার দেশের 'গুমরুক্'টিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন না। 'কাবুলি-ওয়ালা' ফিল্ম আমি দেখি নি। রহমতও বোধ করি সেটাতে তার 'গুমরুক্'কে এড়াবার চেষ্টা করে নি।

কেন? ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

ডাক্তার, উকিল, কসাই, ডাকাত, সম্পাদক (এবং সম্পাদকরা বলবেন, লেখক) এদের মধ্যে সক্কলের প্রথম কার জন্মগ্রহণ হয় সে কথা বলা শক্ত। যারই হোক, তিনি যে চুঙ্গিঘরের চেয়ে প্রাচীন নন সে-বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষে মানুষে লেনদেন নিশ্চয়ই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল এবং সেই মুহূর্তেই তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠল, 'আমার ট্যাক্সোটা ভুলো না কিন্তু'—তা সে তৃতীয় ব্যক্তি গাঁয়ের মোড়লই হন, পঞ্চাশখানা গাঁয়ের দলপতিই হন, কিম্বা রাজা অথবা তাঁর কর্মচারীই হন। তা তিনি নিন, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই, কারণ এ-যাবৎ আমি পুরনো খবরের কাগজ ছাড়া অন্য কোনো বস্তু বিক্রি করি নি। কিন্তু যেখানে দুপয়সা লাভের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, সেখানে যখন চুঙ্গিঘর তার না-হক্কের কড়ি না-হক চাইতে যায়, তখনই আমাদের মনে সুবুদ্ধি জাগে, ওদের ফাঁকি দেওয়া যায় কি প্রকারে।

এই মনে করুন, আপনি যাচ্ছিলেন ঢাকা। প্যাক করতে গিয়ে দেখেন মাত্র দুটি শার্ট ধোপার মারপিট থেকে গা বাঁচিয়ে কোনো গতিকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। ইস্টিশানে যাবার সময় কিনলেন একটি নয়া শার্ট। বাস্, আপনার হয়ে গেল। দর্শনা পৌঁছতেই পাকিস্তানী চুঙ্গিঘর হুলুধ্বনি দিয়ে দর্শনী চেয়ে উঠবে। তারপর আপনার শার্টটির গায়ে হাত বুলুবে, মস্তক আঘ্রাণ করবে এবং শেষটায় ধৃতরাষ্ট্র যে-রকম ভীমসেনকে আলিঙ্গন করেছিলেন ঠিক সেই রকম বুকে জড়িয়ে ধরবে।

আপনার পাঁজর কখানা পটপট করতে আরম্ভ করেছে, তবু শুকনো মুখে চিঁচিঁ করে বলবেন, 'ওটা ত আমি নিজের ব্যবহারের জন্য সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ওতে ত ট্যাক্স লাগবার কথা নয়।'

আইন তাই বলে।

হায় রে আইন! চুঙ্গিওলা বলবে, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। কিন্তু ওটা যদি আপনি ঢাকাতে বিক্রি করেন?'

তর্কস্থলে ধরে নিলুম, আপনার পিতামহ তর্কবাগীশ ছিলেন তাই আপনি মুর্খের ন্যায় তর্ক তুললেন, 'পুরনো শার্টও ত ঢাকাতে বিক্রি করা যায়।'

এই করলেন ভুল। তর্কে জিতলেই যদি সংসারে জিত হত তবে সক্রাতেসকে

বিষ খেতে হত না, যীশুকে ক্রুশের উপর শিব হতে হত না।

চুঙ্গিওলা জানে জীবনের প্রধান আইন, 'চুপ করে থাক্, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভাল না। এক্কেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তির চালনা।।'

কী যেন এক অজানার ধেয়ানে, দীর্ঘ অ্যারস্ট্রিপের পশ্চাতের সুদূর দিক্-চক্রবালের দিকে তাকিয়ে বলবে, 'তা পারেন।'

তারপর কাগজ পেন্সিল নিয়ে কি সব টরে-টক্কা করবে। তারপর বলবে, 'পনেরো টাকা।'

আপনার মনের অবস্থা আপনিই তখন জানেন—আমি আর তার কী বয়ান দেব! ব্যাপারটা যখন আপনার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হল, তখন আপনি ক্ষীণতম কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু ঐ শার্টটার দামই ত মাত্র চার টাকা।'

চুঙ্গিওলা একখানা হলদে কাগজে চোখ বুলিয়ে নেবে। আপনি এটাতে দরখাস্ত করেছিলেন এবং নূতন শার্টটার উল্লেখ করেন নি। চুঙ্গিওলার কাছে তার সরল অর্থ, আপনি এটা স্মাগল্ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পাচার করতে চেয়েছিলেন, হাতে-নাতে বে-আইনী কর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়লে তার জরিমানা দশ টাকা, জেলও হতে পারত, আফিং কিংবা ককেইন হলে—এ যাত্রা বেঁচে গেছেন।

সেই হলদে কাগজখানা অধ্যয়ন করে কোনো লাভ নেই। কারণ তার প্রথম প্রশ্ন ছিল,

১। আপনার জন্মের সময় যে কাঁচি দিয়ে নাড়ি কাটা হয়েছিল, তার সাইজ কত?

এবং শেষ প্রশ্ন,

২। আপনার মৃত্যুর সন ও তারিখ কি?

আপনি তখন শার্টটির মায়া ত্যাগ করে ঈষৎ অভিমানভরে বললেন, 'তা হলে ওটা আপনারা রেখে দিন।'

কিন্তু ওইটি হবার জো নেই। আপনি ঘড়ি চুরি করে পেয়েছিলেন তিন মাসের জেল। ঘড়ি ফেরত দিলেই ত আর হাকিম আপনাকে ছেড়ে দেবে না। শার্ট ফেরত দিতে চাইলেও রেহাই নেই।

তখন শার্টটা চড়বে নিলামে। এক টাকা পেলে আপনি মহা ভাগ্যবান। জরিমানাটার অবশ্য নড়নচড়ন হল না।

ঢাকা থেকে ফিরে আসবার সময় ভারতীয় চুঙ্গিওলা দেখে ফেললে আপনার নূতন পেলিকান ফাউন্টেন পেনটি। কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। আপনি ভাবলেন, ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েই এ-কর্মে নূতন, তাই প্যাসেঞ্জারকে খামকা হয়রান করে। বিলেত-ফিলেতে বোধ হয় চুঙ্গিঘর টুরিস্টদের নিছক মনোরঞ্জনার্থে। তবে শুনুন।

আমার এক বন্ধু প্রায়ই ইউরোপ-আমেরিকায় যান। এতই বেশী যাওয়া-আসা করেন যে, তাঁর সঙ্গে কোথাও দেখা হলে বলবার উপায় নেই, তিনি বিদেশ যাচ্ছেন না ফিরে আসছেন। ওই যে রকম ঢাকার কুট্টি গাড়ওয়ান এক ভদ্রলোককে ভি শেপের গেঞ্জি উল্টো পরে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কর্তা আইতেছেন, না যাইতেছেন?'

তিনি নেমেছেন ইটালির ভেনিস বন্দরে জাহাজ থেকে। ঝাণ্ডু ব্যবসায়ী লোক। তাই চুঙ্গিঘরের সেই হলদে কাগজখানায় যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে শেষটায় লিখেছেন, 'এক টিন ভ্যাকুয়াম প্যাক্‌ট্‌ ভারতীয় মিষ্টান্ন। মূল্য দশ টাকা।' অস্কার ওয়াইল্ড যখন মার্কিন মুল্লুকে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন চুঙ্গিঘর পাঁচজনের মত তাঁকেও শুধিয়েছিল, 'এনিথিং টু ডিক্লেয়ার?' তিনি আঙুল দিয়ে তাঁর মগজের বাক্সটি বার কয়েক ট্যাপ করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাই জিনিয়াস।' আমার পরিচিতদের ভিতর ওই ঝাণ্ডুদাই একমাত্র লোক, যিনি মাথা ত ট্যাপ করতে পারতেনই, সঙ্গে সঙ্গে হার্টটা ট্যাপ করলেও কেউ কোনো আপত্তি করতে পারত না।

জাহাজখানা ছিল বিরাট সাইজের—ঝাণ্ডুদার বপুটি স্বচক্ষে দেখেছেন যাঁরা, তাঁরাই আমার কথায় সায় দেবেন যে, তাঁকে ভাসিয়ে রাখা যে-সে জাহাজের কর্ম নয়—তাই সেদিন চুঙ্গিঘরে লেগে গিয়েছিল মোহনবাগান ভর্সস ফিল্ম-স্টার-টীম ম্যাচের ভিড়। ঝাণ্ডুদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ মনে পড়ল ইতালির 'কিয়ান্তি' জিনিসটি বড়ই সরেস এবং সরস। চুঙ্গিঘরের কাঠের খোঁয়াড়ের মুখে দাঁড়িয়েছিল এক পাহারাওলা। তাকে হাজার লিরার একখানা নোট দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কয়েক বোতল 'কিয়ান্তি' রাস্তার ওধারে দোকান থেকে নিয়ে আসতে। পাহারাওলা খাঁটি খানদানী লোকের সংস্পর্শে এসেছে ঠাহর করতে পেরে খাঁটি নিয়ে এল তিন মিনিটেই। পূর্বেই বলেছি ঝাণ্ডুদা জন্মেছিলেন তাগড়াই হার্ট নিয়ে—জাহাজে পরিচিত অপরিচিত তথা চুঙ্গিঘরের পাহারাওলা সেপাই, চাপরাসী, কুলী সবাইকে 'কিয়ান্তি' বিলোতে লাগলেন দরাজ দিলে। 'স্বাস্থ্যপান' আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই ঝাণ্ডুদার ডাক পড়ে গেল চুঙ্গির কাউন্টারে। মাল খালাসিতে তাঁর পালা এসে গেছে। নিমন্ত্রিত রবাহূত সব্বাইকে দরাজহাত দুখানা পাখির মত মেলে দিয়ে বললেন, 'আপনারা ততক্ষণে ইচ্ছে করুন; আমি এই এলুম বলে। 'কিয়ান্তি' রানীকে বসিয়ে রাখা মহাপাপ।'

ঝাণ্ডুদার বাক্স পেঁটরার এত সব জাত-বেজাত হোটেলের লেবেল লাগানো থাকত যে, অগা চুঙ্গিওলাও বুঝতে পারত এগুলোর মালিক বাস্তুভিটার তোয়াক্কা করে না—তার জীবন কাটে হোটেলে হোটেলে। আজকের চুঙ্গিওলা কিন্তু সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করলে, প্রথম ভাগের ছেলে যে-রকম বানান ভুল করে

করে বই পড়ে। লোকটার চেহারাও বদখত। টিঙটিঙে রোগা, গালদুটো ভাঙা, সে-গালের হাড় দুটো জোয়ালের মত বেরিয়ে পড়েছে, চোখ দুটো গভীর গর্তের ভিতর থেকে নাকটাকে প্যাঁসনের মত চেপে ধরেছে, নাকের তলায় টুথব্রাশের মত হিটলারী গোঁপ। পূর্বেই নিবেদন করেছি, ঝাণ্ডুদা ঝাণ্ডু লোক, তাই তিনি মানুষকে তার চেহারা থেকে যাচাই করেন না। এবারে কিন্তু তাঁকেও সেই নিয়মের ব্যভিচার করতে হল। লোকটাকে আড়চোখে দেখলেন, সন্দেহের নয়নে আমার কানে কানে বললেন, 'শেক্‌স্‌পিয়ার নাকি বলেছেন, রোগা লোককে সমঝে চলবে?' আমার বিশ্বাস, আজ যে শেক্‌স্‌পিয়ারের এত নাম-ডাক সেটা ওই দিন থেকেই শুরু হয়—কারণ ঝাণ্ডুদা আত্ম-নির্ভরশীল মহাজন, কারও কাছ থেকে কখনো কানাকড়ি ধার নেন নি। তিনি ঋণ স্বীকার করাতে ওইদিন থেকে শেক্‌স্‌পিয়ারের যশ-পত্তন হয়।

চুঙ্গিওলা শুধালে, 'ওই টিনটার ভিতর আছে কি?'

'ইন্ডিয়ান সুইট্‌স্‌।'

'ওটা খুলুন।'

'সেটা কী করে হয়? ওটা আমি নিয়ে যাব লন্ডনে! খুললে বরবাদ হয়ে যাবে যে?'

চুঙ্গিওলা যে-ভাবে ঝাণ্ডুদার দিকে তাকালে তাতে যা টিন খোলার হুকুম হল, পাঁচশ ট্যাঁটরা পিটিয়ে কোনো বাদশাও ও রকম হুকুমজারি করতে পারতেন না।

ঝাণ্ডুদা মরীয়া হয়ে কাতর নয়নে বললেন, 'ব্রাদার, এ-টিনটা আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর মেয়ের জন্য লন্ডনে—নেহাতই চিংড়ি মেয়ে। এটা খুললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

এবারে চুঙ্গিওলা যে-ভাবে তাকালে, তাতে আমি হাজার ট্যাঁটরার শব্দ শুনতে পেলুম।

বিরাট-লাশ ঝাণ্ডুদা পিঁপড়ের মত নয়ন করে সকাতরে বললেন, 'তাহলে ওটা ডাকে করে লন্ডন পাঠিয়ে দাও, আমি ওটাকে সেখানেই খালাস করব।'

আমরা একবাক্যে বললুম, 'কিন্তু তাতে তো বড্ড খরচা পড়বে। পাউন্ড পাঁচেক—নিদেন।'

হ্রস্বশ্বাস ফেলেই বললেন, 'তা আর কী করা যায়।'

কিন্তু আশ্চর্য, চুঙ্গিওলা তাতেও রাজী হয় না। আমরাও অবাক। কারণ এ-আইন তো সক্কলেরই জানা।

ঝাণ্ডুদা একটুখানি দাঁত কিড়মিড় খেয়ে লোকটাকে আইনটার মর্ম প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝালেন। তার অর্থ, টিনের ভিতরে বাঘ-ভাল্লুক, ককেইন-হেরয়িন যা-ই থাক্‌ ও-মাল যখন সোজা লন্ডন চলে যাচ্ছে তখন তার পুণ্যভূমি ইতালি তো আর কলঙ্কিত হবে না।

আমরা সবাই কসাইটাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম ঝাণ্ডুদার প্রস্তাবটি অতিশয়

সমীচীন এবং আইনসঙ্গতও বটে। আমাদের দল তখন বেশ বিরাট আকার ধারণ করেছে। 'কিয়াস্তি'রানীর সেবকের অভাব ইতালিতে কখনও হয় নি—প্রাচুর্য থাকলে পৃথিবীতেও হত না। এক ফরাসি উকিল কাইরো থেকে পোর্ট সঈদে জাহাজ ধরে—সে পর্যন্ত বিন্ ফীজে লেকচার ঝাড়লে। চুঙ্গিওলার ভাবখানা সে পৃথিবীর কোনো ভাষাই বোঝে না।

ঝাণ্ডুদা তখন চটেছেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'শালা, তবে খুলছি। কিন্তু ব্যাটা তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ছি নে।' তারপর ইংরিজিতে বললেন, 'কিন্তু তোমাকে ওটা নিজে খেয়ে পরখ করে দেখতে হবে ওটা সত্যি ইন্ডিয়ান সুইট্স্ কি না।'

শয়তানটা চট করে কাউন্টারের নীচে থেকে টিন-কাটার বের করে দিলে। ফরাসী বিদ্রোহের সময় গিলোটিনের অভাব হয় নি।

ঝাণ্ডুদা টিন-কাটার হাতে নিয়ে ফের চুঙ্গিওলাকে বললেন, 'তোমাকে কিন্তু ওই মিষ্টি পরখ করতে হবে নিজে, আবার বলছি।'

চুঙ্গিওলা একটু শুকনো হাসি হাসলে। শীতে বেজায় ঠোঁট ফাটলে আমরা যেরকম হেসে থাকি।

ঝাণ্ডুদা টিন কাটলেন।

কী আর বেরুবে? বেরল রসগোল্লা। বিয়ে-শাদীতে ঝাণ্ডুদা ভুরি ভুরি রসগোল্লা স্বহস্তে বিতরণ করেছেন—ব্রাহ্মণ-সন্তানও বটেন। কাঁটা-চামচের তোয়াক্কা না করে রসগোল্লা হাত দিয়ে তুলে প্রথমে বিতরণ করলেন বাঙালীদের, তারপর যাবতীয় ভারতীয়দের, তারপর সবাইকে, অর্থাৎ ফরাসী জর্মন ইতালীর স্প্যানিয়ার্ডদের।

মাতৃভাষা বাংলাটাই বহুত তকলিফ বরদাস্ত করেও কাবুতে আনতে পারি নি, কাজেই গণ্ডা তিনেক ভাষায় তখন বাঙালীর বহুযুগের সাধনার ধন রসগোল্লার যে বৈতালিক গীতি উঠেছিল তার ফটোগ্রাফ দি কী প্রকারে?

ফরাসীরা বলেছিল, 'এপাতাঁ!'

জর্মনরা, 'ক্লর্কে!'

ইতালিয়ানরা, 'ব্র্যাভো!'

স্প্যানিশরা, 'দেলিচজো, দেলিচজো।'

আরবরা, 'ইয়া সালাম, ইয়া সালাম!'

তামাম চুঙ্গিঘর তখন রসগোল্লা গিলছে। আকাশে বাতাসে রসগোল্লা। কিউবিজ্‌ম বা দাদাইজ্‌মের টেক্‌নিক দিয়েই শুধু এর ছবি আঁকা যায়। চুঙ্গিঘরের পুলিস বরকন্দাজ, চাপরাসী-স্পাই সক্কলেরই হাতে রসগোল্লা। প্রথমে ছিল ওদের হাতে 'কিয়াস্তি', আমাদের রসগোল্লা। এক লহমায় বদলাবদলি হয়ে গেল।

আফ্রিকার একজন ক্রিশ্চান নিগ্রো আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ক্রিশ্চান মিশনারিরা যখন আমাদের দেশে এসেছিলেন তখন তাদের হাতে ছিল বাইবেল,

আমাদের ছিল জমিজমা। কিছুদিন বাদেই দেখি, ওদের হাতে জমিজমা, আমাদের হাতে বাইবেল।'

আমাদের হাতে 'কিয়ান্তি'।

ওদিকে দেখি, ঝাণ্ডুদা আপন ভুঁড়িটি কাউন্টারের উপর চেপে ধরে চুঙ্গিওলার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছেন—বাংলাতে—'একটা খেয়ে দেখ।' হাতে তাঁর একটি সরেস রসগোল্লা।

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা একটু পিছন দিকে হটিয়ে গম্ভীররূপ ধারণ করেছে।

ঝাণ্ডুদা নাছোড়বান্দা। সামনের দিকে আরেকটু এগিয়ে বললেন, 'দেখছ তো, সবাই খাচ্ছে। ককেইন নয়, আফিঙ নয়। তবু নিজেই চেখে দেখ, এ বস্তু কী!'

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা আরও পিছিয়ে নিলে। লোকটা অতি পাষণ্ড। একবারের তরে 'সরি-টরি'ও বললে না।

হঠাৎ বলা-নেই কওয়া নেই, ঝাণ্ডুদা তামাম ভুঁড়িখানা কাউন্টারের উপর চেপে ধরে ক্যাঁক করে পাকড়ালেন চুঙ্গিওলার কলার বাঁ আর ডান হাতে থেবড়ে দিলেন একটা রসগোল্লা ওর নাকের উপর। ঝাণ্ডুদার তাগ সব সময়েই অতিশয় খারাপ।

আর সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায়, 'শালা, তুমি খাবে না। তোমার গুষ্টি খাবে। ব্যাটা, তুমি মস্করা পেয়েছ। পই পই করে বললুম রসগোল্লাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, চিংড়িটা বড্ড নিরাশ হবে, তা তুমি শুনবে না'—আরও কত কী!

ততক্ষণে কিন্তু তাবৎ চুঙ্গিঘরে লেগে গিয়েছে ধুন্দুমার! চুঙ্গিওলার গলা থেকে যেটুকু মিহি আওয়াজ বেরুচ্ছে তার থেকে বোঝা যাচ্ছে সে পরিত্রাণের জন্য চাপরাসী থেকে আরম্ভ করে ইলদুচে মুস্‌সোলীনি—মাঝখানে যত সব কনসাল, লিগেশন মিনিস্‌টার অ্যাম্বাসেডর—প্লেনিপটিনশিয়ারি কারুরই দোহাই কাড়তে কসুর করছে না। মেরি মাতা, হোলি যিসস, পোপঠাকুর তো বটেনই।

আর চিৎকার-চেঁচামেচি হবেই বা না কেন? এ যে রীতিমত বে-আইনী কর্ম। সরকারী চাকুরেকে তার কর্তব্যকর্ম সমাধান বিঘ্ন উৎপাদক করে তাকে সাড়ে তিনমনী লাশ দিয়ে চেপে ধরে রসগোল্লা খাওয়াবার চেষ্টা করুন আর সেঁকো খাওয়াবারই চেষ্টা করুন, কর্মটির জন্য আকছারই জেলে যেতে হয়। ইতালিতে এর চেয়ে বহুত অল্পেই ফাঁসি হয়।

ঝাণ্ডুদার কোমর জাবড়ে ধরে আমরা জনপাঁচেক তাঁকে কাউন্টার থেকে টেনে নামাবার চেষ্টা করছি। তিনি পর্দার পর পর্দা চড়াচ্ছেন, 'খাবি নি, ও পরান আমার, খাবি নি, ব্যাটা—' চুঙ্গিওলা ক্ষীণকণ্ঠে পুলিসকে ডাকছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে আমার মাতৃভূমি সোনার দেশ ভারতবর্ষের ট্রাঙ্ককলে যেন কথা শুনছি। কিন্তু কোথায় পুলিস? চুঙ্গিঘরের পাইক বরকন্দাজ, ডাণ্ডাবরদার, আস্‌-সরদার বেবাক চাকর-নফর বিলকুল বেমালুম গায়েব! এ কি ভানুমতী, এ কি ইন্দ্রজাল!

দেখি, ফরাসী উকিল আকাশের দিকে দু হাত তুলে অর্ধনিমীলিত চক্ষে, গদ্‌গদ কণ্ঠে বলছে, 'ধন্য পুণ্যভূমি ইতালি, ধন্য পুণ্যনগর ভেনিস্! এ-ভূমির এমনই পুণ্য যে হিদেন রসগোল্লা পর্যন্ত কোন মিরাক্‌ল্ দেখাতে পারে। কোথায় লাগে "মিরাক্‌ল্ অব মিলান" এর কাছে—এ যে সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবতা, পুলিস-মুলিস সবাইকে ঝেঁটিয়ে বার করে দিলেন এখান থেকে! ওহোহো, এর নাম হবে "মিরাক্‌ল্ দ্য রসগোল্লা"।'

উকিল মানুষ সোজা কথা প্যাঁচ না মেরে বলতে পারে না। তার উচ্ছ্বাসের মূল বক্তব্য, রসগোল্লার নেমকহারাম করতে চায় না ইতালীয় পুলিস-বরকন্দাজরা। তাই তারা গা-ঢাকা দিয়েছে।

আমরা সবাই একবাক্যে সায় দিলুম। কিন্তু কে এক কাষ্ঠরসিক বলে উঠল, 'রসগোল্লা নয়, কিয়ান্তি!' আরও দু-চার পাষণ্ড তায় সায় দিল।

ইতিমধ্যে ঝাণ্ডুদাকে বহু কষ্টে কাউন্টারের এদিকে নামানো হয়েছে। চুঙ্গিওলা রুমাল দিয়ে রসগোল্লার থ্যাব্‌ড়া মুছতে যাচ্ছে দেখে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'ওটা পুঁছিস নি; আদালতে সাক্ষী দেবে—ইগজিবিট্ নাম্বার ওয়ান।'

ওদিকে তখন বেটিং লেগে গিয়েছে, ইতালিয়ানরা 'কিয়ান্তি' পান করে, না রসগোল্লা খেয়ে সবাই গা-ঢাকা দিয়েছে? কিন্তু ফৈসালা করবে কে? তাই এ-বেটিঙে রিস্‌ক্ নেই। সবাই লেগে গিয়েছে।

কে একজন ঝাণ্ডুদাকে সদুপদেশ দিলেন, 'পুলিস-টুলিস ফের এসে যাবে। ততক্ষণে আপনি কেটে পড়ুন।'

তিনি বললেন, 'না, ওই যে লোকটা ফোন করছে। আসুক না ওদের বড় কর্তা।'

তিন মিনিটের ভিতর বড় কর্তা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। ফরাসী উকিলের বোধ হয় সবচেয়ে বড় যুক্তি ঘুষ। এক বোতল 'কিয়ান্তি' নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঝাণ্ডুদা বাধা দিয়ে বললেন, 'নো।'

তারপর বড়সাহেবের সামনে গিয়ে বললেন, 'সিন্নোর, বিফোর ইউ প্রসীড', অর্থাৎ কিনা ময়না তদন্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আপনি একটি ইন্ডিয়ান সুঈট্‌স্ চেখে দেখুন।' বলে নিজের মুখে তুললেন একটি। আমাদের সবাইকে আরেক প্রস্থ বিতরণ করলেন।

বড় কর্তা হয়তো অনেক রকমের ঘুষ খেয়ে ওকিবহাল এবং তালেবর। কিংবা হয়তো কখনও ঘুষ খাননি। 'না-বিইয়ে কানাইয়ের মা' যখন হওয়া যায় এবং স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র যখন এ-প্রবাদটি ব্যবহার করে গেছেন, তখন 'ঘুষ না খেয়েও দারোগা' তো হওয়া যেতে পারে।

বড় কর্তা একটি মুখে তুলেই চোখ বন্ধ করে রইলেন আড়াই মিনিট। চোখ বন্ধ অবস্থায়ই আবার হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফের। আবার।

এবার ঝাণ্ডুদা বললেন, 'এক ফোঁটা কিয়াস্তি?'

কাদম্বিনীর ন্যায় গম্ভীর নিনাদে উত্তর এল, 'না। রসগোল্লা।'

টিন তখন ভোঁ-ভাঁ।

চুঙ্গিওলা তার ফরিয়াদ জানালে।

কর্তা বললেন, 'টিন খুলেছ তো বেশ করেছ, না হলে খাওয়া যেত কি করে?' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কি করতে? আরও রসগোল্লা নিয়ে আসুন।' আমরা সুড় সুড় করে বেরিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলুম, বড়কর্তা চুঙ্গিওলাকে বলছেন, 'তুমিও তো একটা আস্ত গাড়ল। টিন খুললে আর ওই সরস মাল চেখে দেখলে না?

'কিয়াস্তি' না রসগোল্লা সে-বেটের সমাধান হল।

ইতালীর প্রখ্যাত কবি ফিলিকাজা গেয়েছেন,

'ইতালি, ইতালি, এত রূপ তুমি কেন ধরেছিলে, হায়!
অনন্ত ক্লেশ লেখা ও-ললাটে নিরাশার কালিমায়।'

আমিও তাঁর স্মরণে গাইলুম,

রসের গোলক, এত রস তুমি কেন ধরেছিলে হায়!
ইতালির দেশ ধর্ম ভুলিয়া লুটাইল তব পায়!!

নেকি

শ্রদ্ধেয়া সম্পাদিকা মহোদয়া সমীপেষু,

একদা আমি জনপ্রিয় (অবশ্য সরেস না) লেখক ছিলুম। সেদিন আর নাই। কিন্তু মেয়েছেলেরা আকছারই প্রাচীন-পন্থী হয়—পষ্ট বুঝলুম, আপনি অবদি ব্যত্যয় নন। নইলে এখনো আমার লেখা চাইবেন কেন? আপনি হয়তো ভাবছেন, 'চল্লিশ বৎসর পূর্বে যে বিউটি-কুইন হয়েছিল, আজই বা সে হতে পারবে না কেন? ইতিমধ্যে সে প্র্যাক্‌টিস করে করে তো আরো পার্ফেক্ট হয়েছে!'

আচ্ছা সে কথা না হয় থাক।

আপনার আদেশ অনুযায়ী আমি একটা লেখা আরম্ভ করি। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে। এমন সময় আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। লেখাটা বাধ্য হয়ে বন্ধ করতে হয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অষ্টাদশ পর্ব ক্ষণে হোথায়, ক্ষণে হেথায় থাবড়া মেরে মেরে এগোনো যায় না।

ওদিকে অসুখের তখন সবেমাত্র গোড়াপত্তন। ইনসমনিয়া। রাতের পর রাত

কেটে যায়—এগারোটা, বারোটা, একটা, দুটোর ঘণ্টা শুনে শুনে। ভোরের প্রথম আলো ফোটে। ফিরোজকে ডাকি। তার ফার্স্ট পিরিয়েড সাড়ে ছটায়।

প্রচুরতম অবকাশ। সময় কাটে কি করে? খাটে শুয়ে শুয়ে কি করা যায়? কবিতা রচনা করা যায়। কিন্তু আপনি জানেন আমি কবি নই। তবে অসুখের সময় কারুরই মাথা ঠিক থাকে না বলে স্থির করলুম ঃ—

আমাদের সমাজে, রাজনীতিতে, ইস্কুল-কলেজে যে সব অনাচার অবিচার হচ্ছে (ভেজাল, জাল্ জিল্‌টিং ইত্যাদি) সেগুলো নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতার সিরীজ তৈরী করবো। তারই প্রথমটা আপনাকে পাঠালুম। 'নেকি' প্রাচীন পাপ। বাসনা ছিল, কালানুক্রমিক ধাপে ধাপে মডার্ন 'মাসাজ্‌বাথ' পর্যন্ত নেবে আসবো। কিন্তু 'নেকি' রচনা করার পরই অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লুম; সিরীজটা আর শেষ করা হল না।

নমস্কারান্তে—

সৈয়দ মুজতবা আলী

নেকি

মার্ মার্ লাথি ন্যাড়া ক'রে দে না
ঘোল ঢাল্ ঘটি ঘটি
কি পেয়েছি বেটি সমাজ কি নেই?
মার্ মার্ ক'ষে চটি।
হাবার মতন দাঁড়িয়ে যে বড়
কথা কি যায় না কানে?
আরে ঐ মোলো কাঁদে কেন ফের
বলে, যাবে কোন্ খানে?
কোন্‌খানে যাবে? কেন? সোনাগাছি
হাড়কাটা আছে খাসা।
ডপকি ছুঁড়ির মাংসটা বেড়ে
রতি দিয়ে পাবে মাষা।
কি বল্‌লি, ভূতো গুরু-মহারাজ
পূজোতে বেড়াতে এসে—
কি বলিস্, ব্যাটা হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ
থাম্ না, সর্বনেশে।
জয় গুরু জয় খাড়া রেখেছেন
আস্ত সমাজটারে
তুমি আমি কে রে শুধাবো যে তাঁরে
পাপ তাঁরে ছুঁতে পারে!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলি শোন্ এক কাজ কর্
ছুঁড়িটা কাশীই যাক্—
তুই নিয়ে যা না কী জ্বালারে, বাবা,
টাকা কটা হাতে থাক্।
আর শোন, ভূতো ঠিকানাটা ঠিক
মনে করে নিবি দেখে
যায় না তো বলা গুরুর মহিমা
ফের যদি চান একে॥ [১]

আর্ট না অ্যাক্সিডেন্ট

আর্ট বলতে আমরা আজকাল মোটামুটি রস-ই বুঝি। তা সে কাব্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে যে-কোনো কলার মধ্যেই প্রকাশিত হোক না কেন।

এখন প্রশ্ন, আর্ট বা রসের সংজ্ঞা কি? সে জিনিস কি? তার সঙ্গে দেখা হলে তাকে চিনব কি করে? অন্যান্য রস থেকে আলাদা করব কি করে? সরেস আর্ট কোনটা আর নিরেসই বা কোনটা?

প্রাচীন ভারত, গ্রীস এবং চীন—এই তিন দেশেই এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে এবং অধুনা পৃথিবীর বিদগ্ধ দেশ মাত্রেই এ নিয়ে কলহ-বিসংবাদের অন্ত নেই। বিশেষ করে যবে থেকে 'মডার্ন আর্ট' নামক বস্তুটি এমন সব 'রস' পরিবেশন করতে আরম্ভ করলে যার সঙ্গে আমাদের কণামাত্র পরিচয় নেই। এলোপাতাড়ি রঙের পোঁছকে বলা হল ছবি, অর্থহীন কতকগুলো দুর্বোধ শব্দ একজোট করে বলা হল কবিতা, বেসুরো বেতালা কতকগুলো বিদ্‌ঘুটে ধ্বনির অসমন্বয় করে বলা হল সঙ্গীত। বলছে যখন তখন হতেও পারে, কিন্তু না পেলাম রস, না বুঝলাম অর্থ, না দিয়ে গেল মনে অন্য কোনো রসের বা ইঙ্গিত! তাই বোধ হল হালের এক আলঙ্কারিক মডার্ন ভাস্কর্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, যখন ভাস্কর এক বিরাট কাঠের গুঁড়ি নিয়ে তার উপর ছ মাস ধরে প্রাণপণ বাটালি চালানোর পর সেটাকে কাঠের গুঁড়ির আকার দিতে পারেন, এবং নিচে লিখে দেন "কাঠের গুঁড়ি"—তখন সেটা 'মডার্ন ভাস্কর্য'।

ইতিমধ্যে এই মডার্ন আর্টের বাজারে একটি নূতন জীব ঢুকেছেন এবং সেখানে

---

১. বলা বাহুল্য, যে-সব সম্প্রদায়ের গুরুবাদ উৎকটরূপে আছে এ কবিতাটি পৃথিবীর সে-সব সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

হুলস্থূল বাধিয়ে তুলেছেন—এর নাম অ্যাক্সিডেন্ট বাঙলায় দুর্ঘটনা, দৈবযোগ, আকস্মিকতা যা খুশী বলতে পারেন।

এঁর আবির্ভাব হয়েছে সুইডেনের মতো ঠাণ্ডা দেশে—যেখানে মানুষ ঠাণ্ডাভাবে ধীরে-সুস্থে কথা কয়, চট করে যা-তা নিয়ে খামখা মেতে ওঠে না।

* * *

সুইডেনের মহাসম্মানিত ললিত-কলা আকাদেমির বিজ্ঞ বিজ্ঞ প্রফেসর, কলা রসিক গুণীজ্ঞানীরা অকস্মাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কর্ণমূলের পশ্চাদ্দেশ কণ্ডূয়ন করতে লাগলেন। তাঁদের মহামান্যবর প্রেসিডেন্ট তো খুদাতাল্লার হাতে সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি বলেই ফেললেন, 'কি করি, মশাইরা, বলুন। কে জানত শেষটায় এ-রকম-ধারা হবে? আজকাল নিত্যি নিত্যি এত সব নয়া নয়া এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে যে, কোন্‌টা যে এক্স্‌পেরিমেন্ট আর কোন্‌টা যে অ্যাক্সিডেন্ট কি করে ঠাওরাই? আমরা ভেবেছি, চিত্রকর ফালস্ট্রোম্ আর্টের ক্ষেত্রে একটা অভিনব নবীন পন্থা আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং তাই ভেবে ঐ ছবিটাও এক্জিবিশনের অন্যান্য ছবির পাশে টাঙিয়ে দিয়েছি'—

ওদিকে আর্টিস্ট ফালস্ট্রোম্ রেগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সর্বত্র চেঁচামেচি করে বলতে লাগলেন, তাঁকে লোকচক্ষে হীন করার মানসে দুষ্ট লোক কুমতলব নিয়ে এই অপকর্মটি করেছে।

অপকর্মটি কি?

ফালস্ট্রোম্ ছবি আঁকার সময় একখানা ম্যাসোনাইটের টুকরোয় মাঝে মাঝে তুলি পুঁছে নিতেন। কাজেই সেটাতে হরেক রকম রঙ লেগে থাকার কথা। ঐ সময়ে সুইডিশ ললিত-কলা আকাদেমি এক বিরাট মহতী এক্জিবিশনের ব্যবস্থা করেন—স্বতঃস্ফূর্তকলা (স্পন্টানিস্‌মুস বা Spontaneous art) ও তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ' এই নাম দিয়ে সে চিত্রপ্রদর্শনীতে সুইডেন তথা অন্যান্য দেশের স্পন্টানিস্‌মুস কলার উত্তম উত্তম নিদর্শন তাতে থাকবে। (ক্যুবিজম, দাদাইজমের মতো স্পন্টানিয়েজমও এক নবীন কলাসৃষ্টি পদ্ধতি—আমি অবশ্য এখানে সে প্রশ্ন তুলছিনে যে সার্থক কলাসৃষ্টি মাত্রই স্পনটেনিয়াস বা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে, বিশেষ পদ্ধতিকে এ নাম দিলে তাকে চেনবার কি যে সুবিধে হয় বোঝা কঠিন।)

এখন হয়েছে কি, আর্টিস্ট ফালস্ট্রোম্ তাঁর অন্য ছবি যাতে করে ডাকে যাবার সময় জখম না হয় সেই উদ্দেশ্যে ঐ রঙবেরঙের ম্যাসোনাইটের টুকরোখানা তাঁর ছবির উপরে রেখে চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলেন। আকাদেমির বড় কর্তারা ভাবলেন, এটাও মহৎ আর্টিস্টের এক নবীন মহান কলানিদর্শন এবং পরম শ্রদ্ধাভারে সেই ম্যাসোনাইটের টুকরোটির নিচে আর্টিস্টের স্বনামখ্যাত নামটি লিখে ঝুলিয়ে দিলেন আর্টিস্টের অন্য ছবির পাশে।

ব্যাপারটা যখন ধরা পড়ল তখন আর্ট সমালোচকরা কি যে করবেন ঠিক করতে না পেরে চুপ করে গেলেন আর সুইডেনবাসী আপনার আমার মতো সাধারণজন মুখ টিপে হাসলে, যে বাঘা বাঘা পণ্ডিতেরা ঐ 'স্বতঃস্ফূর্ত' রসিকতাটা ধরতে না পেরে ফাঁদে পা ফেলেছেন বলে।

কিন্তু এইখানে ব্যাপারটার গোড়াপত্তন মাত্র।

সুইডেনের কাগজে কাগজে তখন আলোচনা আরম্ভ হলো এই নিয়ে ঃ একখানা উটকো কাঠ জাতীয় জিনিসের উপর এলোপাতাড়ি রঙের ছোপকে যদি পণ্ডিতেরা আর্ট বলে মেনে নিতে পারেন তবে তাঁদের ঢাক-ঢোল-পেটানো এই মহাসাধনার 'মডার্ন আর্টের' মূল্যটা কি?

ওইভিন্দ ফালস্ট্রোম্ সুইডেনের নামকরা তরুণ চিত্রকর। তিনি সম্প্রতি এই 'স্বতঃস্ফূর্ত কলামার্গে' প্রবেশ করেছেন এবং কলানির্মাণের ক্রমবিকাশে তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর ঢং একাধিকবার আগাপাস্তলা বদলিয়েছেন। সুইডেনে এখন এই 'কনক্রীট', 'স্থূল', বা 'বাস্তব' মার্গের খুবই নামডাক; এঁরা নিজেদের অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত অনব্যবহিত ভাবে রঙের মারফতে প্রকাশ করেন—সে প্রকাশে কোনো বস্তু বা কোনো-কিছুর প্রতিকৃতি থাকে না, কোনো কিছু রূপায়িত করে না, ছবির নাম পর্যন্ত থাকে না—এবং দর্শক তাই দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরাসরি আর্টিস্টের অনুভূতি বুঝে গিয়ে তার অর্থ করে নেয়,—কিংবা ঐ আশা করা হয়।

এই হল মোটামুটি তার অর্থ—অর্থাৎ অর্থহীন জিনিসকে যদি অর্থ দিয়ে বোঝাতে হয় তবে যে 'অর্থ' দাঁড়ায়।

ফালস্ট্রোম্ চিত্রপ্রদর্শনীতে দু'খানি ছবি পাঠাতে চেয়েছিলেন, এবং পূর্বেই বলেছি সে দু'খানি ছবি যাতে করে পোস্টাপিসের চোট না খায় তাই সঙ্গে সেই ম্যাসোনাইটের টুকরো দিয়ে সেগুলোকে প্যাক্ করে তিনি চলে যান গ্রামাঞ্চলে ছুটি কাটাতে। এদিকে আকাদেমির বাঘ-সিঙ্গিরা ছবি তিনখানা (আসলে অবশ্য দু'খানা) ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বাছাই করে নিলেন দু'খানা,—এবং তার মধ্যে মনোনীত হয়ে গেল তুলি পোঁছার সেই ম্যাসোনাইটের পট্টি: ক্রিটিকদের কারোরই কাছে ঐ ম্যাসোনাইটের 'অঙ্কিত' তুলিপোঁছা রঙ-বেরঙ-করা জিনিসটির স্টাইল বা বিষয়বস্তু অদ্ভুত বা মূল্যহীন ঠেকে নি। তার অর্থ, একদিকে চিত্রকরের 'ন্যায়ত' 'ধর্মসঙ্গত' আঁকা ছবি ও অন্যদিকে তাঁর তুলি পোঁছার এলোপাতাড়ি রঙের ছোপ—এ দুয়ে কোনো পার্থক্য নেই!

তাই লেগেছে হুলস্থূল তর্কবিতর্ক, 'সে আর্ট তবে কি আর্ট যেখানে "ভুল" জিনিস অক্লেশে খাঁটি আর্ট বলে পাচার হয়ে যায়?'

এটা ধরা পড়ল কি করে? ফালস্ট্রোম্ ছুটি থেকে ফিরে একদিন স্বয়ং গিয়েছেন

চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে। সেখানে ঐ 'ম্যাসোনাইট ছবি'র কাণ্ড দেখে যখন ভুলটা ধরা পড়ল তখন কোথায় না তিনি বিচক্ষণ জনের মতো চুপ করে থাকবেন—তিনি উল্টে আরম্ভ করলেন তুলকালাম কাণ্ড!

ফলে জ্ঞানগর্ভ পণ্ডিতমণ্ডলী তীক্ষ্ণচক্ষু কলাসমালোচকের দল, ঝানু ঝানু আর্ট সংগ্রহকারিগণ, সরলচিত্ত সাধারণ দর্শক এবং সর্বশেষে নিজেকে আর তামাম ঐ 'স্বতঃস্ফূর্ত-কলা-পন্থীকে' বিশ্বজনের সম্মুখে তিনি হাস্যাস্পদ করে ছাড়লেন!

এর কয়েক বছর পূর্বে এক বিদগ্ধ বিদূষক চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জীর 'আঁকা' একখানি ছবি ঐ রকম এক চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠিয়ে শহরের লোককে বোকা বানিয়েছিলেন—তখনও কেউ ধরতে পারেননি ওটা বাঁদরের মস্করা।

কিন্তু প্রশ্ন, এই ধরনের তামাশা চলবে কতদিন ধরে? এই যে স্পন্টানিস্টের দল, কিংবা যে-কোনো নামই এঁদের হোক—এঁরা আর কতদিন ধরে আপন ব্যবহার দিয়ে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় প্রকাশ করবেন যে এঁদের আর্ট কোনো-কিছু সৃজন করার দুরূহ শক্তিসাধনায় আয়ত্ত নয়, আকস্মিক দৈব-দুর্বিপাক বা অ্যাক্সিডেন্ট বা ঘটনাচক্র এঁদেরই মতো উত্তম উত্তম ছবি আঁকতে পারে, শ্রেষ্ঠ গান গাইতে পারে, সার্থক কবিতা রচনা করতে পারে—এতদিন যা শুধু সরস্বতীর বরপুত্রেরাই বহু সাধনার পর করতে পারতেন?

এই প্রশ্নটি শুধিয়েছেন এক সরলচিত্ত, দিশেহারা সাধারণ লোক—সুইডেনের কাগজে।

উত্তরে আমরা বলি, কেন হবে না? এক কোটি বাঁদরকে যদি এক কোটি পিয়ানোর পাশে বসিয়ে দেওয়া হয়, এবং তারা যদি এক কোটি বংশপরম্পরা ওগুলোর উপর পিড়িং পাড়াং করে তবে কি একদিন একেবারের তরেও একটি মনোমোহন রাগিণী বাজানো হয়ে যাবে না? সেও তো অ্যাক্সিডেন্ট।

আমার ব্যক্তিগত কোনো টীকা বা টিপ্পনী নেই। মডার্ন কবিতা পড়ে আমি বুঝি না, আমি রস পাই না। সে নিয়ে আমার কোনো খেদ নেই। পৃথিবীতে কতশত ভালো জিনিস রয়েছে যার রসাস্বাদন আমি এখনো করে উঠতে পারিনি যে ওগুলো আমার না হলেও চলবে॥

কাইরো

কাইরো যাওয়ার জন্য আলাদা করে কাঠখড় পোড়াবার প্রয়োজন হয় না। ইউরোপ যাবার সময় জাহাজ সুয়েজ বন্দরে থামে। সেখানে নেবে সোজা কাইরো চলে যাবেন। এদিকে আপনার জাহাজ অতিধীরে মন্থরে সুয়েজ খালের ভিতর দিয়ে পোর্ট সইদের দিকে রওয়ানা হবে। খালের দু'দিকে বালুর পাড় যাতে ভেঙে গিয়ে খালটাকে বন্ধ না করে দেয়, তার জন্য কড়া আইন, জাহাজ যেন গরুর গাড়ির গতিতে এগোয়। কাজেই জাহাজ সইদ বন্দর পৌঁছতে না পৌঁছতে আপনি কাইরোতে ঢুঁ মেরে ট্রেনে করে সেই সইদ বন্দরেই পৌঁছে যাবেন! সেই জাহাজেই চেপে, সেই কেবিনেই শুয়ে ইউরোপ চলে যাবেন—ফালতো কোনো খরচা লাগবে না।

অবশ্য তাতে করে কাইরোর মত শহরের কিছুই দেখা হয় না—আর কাইরোতে দেখার মত জিনিস আছে বিস্তর। পিরামিড দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই, এইটুকু যা সান্ত্বনা। জাহাজের অনেকেই আপনাকে বলবেন, ঘণ্টা দশেকের জন্য কাইরাতে ওরকমধারা ঢুঁ মেরে বিশেষ কোনো লভ্য নেই। আমারও সেই মত; কিন্তু তবু যে যেতে বলছি তার কারণ যদি আপনার পছন্দ হয়ে যায়, তবে হয়তো বিলেত থেকে ফেরার মুখে ফের কাইরোতে নেবে দু-চার সপ্তাহ কাটিয়ে আসতে পারেন। ইয়োরোপে তো দেখবেন কুল্লে এক ইয়োরোপীয় সভ্যতা (ফরাসী, জর্মন, ইংরেজে যত তফাতই থাক না কেন, তবু তো তারা আপসে একটা সভ্যতাই গড়ে তুলেছে) আর দেখেছেন ভারতীয় সভ্যতা—তার উপর যদি আরেক তৃতীয় সভ্যতার সঙ্গে মোকাবেলা হয়ে যায়, তবে তাতে নিশ্চয়ই বিস্তর লভ্য।

আমার লেগেছিল কাইরো দেখতে পাক্কা একটি বচ্ছর। অতদিন আপনি থাকবেন না সে আমি জানি। আপনার অতটা সময় লাগবে না—সে-কথাও জানি। কারণ আমি কাটিয়েছিলুম, প্রথম ছটি মাস শুধু আড্ডা মেরে মেরে—বাড়ির ছাতের উপর থেকে পিরামিড স্পষ্ট দেখা যায়, ট্রামে করে হুশ করে সেখানে যেতে কোনোই বাধা নেই, পূর্ণিমায় আবার ইস্পিশল সার্ভিস, তৎসত্ত্বেও ছটি মাস কেটে গেল এ-কাফে ও-কাফে করে করে, পিরামিড দেখার ফুরসৎ আর হয়ে ওঠে না। বন্ধুরা কেউ জিজ্ঞেস করলে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতুম, 'সবই ললাটঙ্ক লিখন। কলকাতায় দশ বছর কাটিয়ে "গঙ্গাস্তান" যখন হয়ে ওঠে নি, তখন বাবা পিরামিড দর্শন কি আমার কপালে আছে?' (আসল কারণটা চুপে চুপে বলি;— এক গাদা পাথর দেখায় যে কি তত্ত্ব তা আমি পিরামিড দেখার আগে এবং পরে কোনো অবস্থাতেই ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারি নি)।

সে কথা থাক্। সভ্যতা, পিরামিড এসব জিনিস নিয়ে অন্য জায়গায় পাণ্ডিত্য ফলাব। 'বসুমতী'র পাঠকরা এতদিন আমাকে বিলক্ষণ চিনে গিয়েছেন, আমার মুখে পাণ্ডিত্যের কথা শুনলে ঠা ঠা করে হেসে উঠবেন। তাই সেই আড্ডাতেই ফিরে যাই।

আমি ভালোবাসি হেদো, হাতীবাগান, শ্যামবাজার। ও-সব জায়গায় তাজমহল নেই, পিরামিড নেই। তাতে আমার বিন্দুমাত্র খেদও নেই। আমি ভালোবাসি আমার পাড়ার চায়ের দোকানটি। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা হাজিরা দিই, পাড়ার পটলা, হাবুল আসে, সবাই মিলে বিড়ি ফুঁকে গুষ্ঠীসুখ অনুভব করি আর উজির-নাজির মারি। আমার যা কিছু জ্ঞান-গম্মি তা ঐ আড্ডারই ঝড়তি-পড়তি মাল কুড়িয়ে নিয়ে। তাই যখন কপালের গর্দিশে কাইরোতে বাসা বাঁধতে হল, তখন আড্ডাভাবে তিনদিনেই আমার নাভিশ্বাস উপস্থিত হল। ছন্নের মত শহরময় ঘুরে বেড়াই আর পটলা-হাবুল-বসন্ত রেস্টুরেন্টের জন্য সাহারার উষ্ণ নিঃশ্বাসের সঙ্গে আপন দীর্ঘনিঃশ্বাস মেশাই। এমন সময় সদ্‌গুরুর কৃপায় একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম—পাড়ায় কফিখানাতে রোজই দেখতে পাই গোটাপাঁচেক লোক বসন্ত রেস্টুরেন্টেরই মত চেঁচামেচি কাজিয়া-ঝগড়া করে আর এন্তার কফি খায়, বিস্তর সিগারেট পোড়ায়।

দিন তিনেক জিনিসটা লক্ষ্য করলুম, কখনো কফিখানায় বসে, কখনো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। নূতন শহরের সব কিছুই গোড়ার দিকে সুররিয়ালিস্টিক ছবির মত এলোপাতাড়ি ধরনের মনে হয়। অর্থ খাড়া হতে হতে কয়েকদিন কেটে যায়। যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম তখন আমেজ করলুম, আমাদের বসন্ত রেস্টুরেন্টের আড্ডা যখন গুরুচণ্ডালের সক্কলের জন্যই অবারিত দ্বার, তখন এরাই বা আমাকে ব্রাত্য করে রাখবে কেন? হিম্মৎ করে তাদের টেবিলের পাশে গিয়ে বসলুম আর করুণ নয়নে তাদের দিকে মাঝে মাঝে তাকালুম। শকুন্তলার হরিণও বুঝি ওরকমধারা তাকাতে পারত না।

দাওয়াই ধরল। এক ছোকরা এসে অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নিল এবং জানাল তাদের আড্ডার বিস্তর সীট ভেকেন্ট, আমি যদি ইত্যাদি। আমাকে তখন আর পায় কে? ভাঙা ফরাসী, টুটাফুটা আরবী, পিজিন্ ইংরিজি সবকিছু জড়িয়েমড়িয়ে দু'মিনিটের ভিতরেই তাঁদের সবাইকে বসন্ত রেস্টুরেন্টে নেমন্তন্ন করলুম, পটলা-হাবলুর ঠিকানা দিলুম, বসন্ত যে ভেজাল তেল আর পচা হাঁসের ডিম দিয়ে খাসা মামলেট বানায় তার বর্ণনা দিতেও ভুললুম না।

কিন্তু কোথায় লাগে আমাদের আড্ডা কাইরোর আড্ডার কাছে? বাঙালী-আড্ডার সবকটা সুখ কাইরোর আড্ডাতে তো আছেই, তার উপর আরেকটা মস্ত সুবিধার কথা এই বেলা বলি, যার জন্যে এতক্ষণ ধরে ভূমিকা দিলুম।

দুনিয়ার যত ফেরিওয়ালা কাইরোর কাফেতে চক্কর মেরে যায়। টুথব্রাশ, সাবান, মোজা, আরশি, চিরুনি, নোটবুক, পেন্সিল, তালাচাবি, ফাউন্টেন পেন, ঘড়ি—হেন

বস্তু নেই যা ফেরিওয়ালা নিয়ে আসে না। আমি জানি, সহজে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু ধর্মসাক্ষী, দর্জি পর্যন্ত বস্তা বস্তা কাপড় মুটের ঘাড়ে চাপিয়ে কাফের ভিতর চক্কর মেরে যায়। কায়রোর লোক দোকানে যেতে ভালোবাসে না। তাতে নাকি সময় নষ্ট হয়, আর দোকানী একা পেয়ে আপনাকে ঠকাবেও নিশ্চয়। আড্ডাতে বন্ধুবান্ধব রয়েছেন। পাঁচজনে মিলে বরঞ্চ ফেরিওয়ালাকে ঘায়েল করার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

একপ্রস্থ সুট বানাবার বাসনা ছিল। আড্ডাতে সেটা সবিনয় নিবেদন করলুম। পাশ দিয়ে দর্জি যাচ্ছিল—ডাক দিতেই সবাই 'হাঁ, হাঁ, করো কি করো কি!' বলে বাধা দিলেন। 'ও ব্যাটা সুট বানাবার কি জানে? প্লাস্তিরাস আসুক। গ্রীক বটে, ঠকাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু আমরাও তো পাঁচজন আছি। ও কাপড় আনে ঠকিয়ে, কাস্টম না দিয়ে। আমরা ওকে ঠকাতে পারলে টাকায় আট আনা লাভ। ঠকালে দু আনা লাভ, অথবা কুইট্‌স্‌।' তারপর আড্ডা আমায় বুঝিয়ে বলল, যে সুট বানাতে চায় সে যেন বর। তার কথা কওয়া ভালো দেখায় না। সে কনেপক্ষের প্যাঁচে পড়ে বানচাল হয়ে যাবে, গয়নাগুলো যাচাই না করে নিয়ে ফেলে আখেরে পস্তাবে।

প্লাস্তিরাস এল। তারপর বাপরে বাপ! সে কি অসম্ভব দরদস্তুর বকাবকি, শেষটায় হাতাহাতির উপক্রম। আড্ডা বলে, 'ব্যাটা তুমি দুনিয়া ঠকিয়ে খাও, তোমাকে পুলিসে দেব।' প্লাস্তিরাস বলে, 'ও দামে সুট বানালে আমাকে আপন পাতলুন বন্ধক দিয়ে কাচ্চা-বাচ্চার জন্য আণ্ডারুটি কিনতে হবে।'

পাক্কা তিনঘণ্টা লড়াই চলেছিল। এর ভিতর প্লাস্তিরাস তিনবার রাগ করে কাপড়ের বস্তা নিয়ে চলে গেল, তিনবার ফিরে এল। আড্ডাও দল বাড়াবার জন্য কাফের ছোকরাকে পাঠিয়ে আমাদের গ্রীক সভ্য পাউলুসকে ডেকে আনিয়েছে। তখন লাগল গ্রীকে গ্রীকে লড়াই। সুড-এটেন্‌ নিয়ে হিটলার চেম্বারলেনে এর চেয়ে বেশী দর-কষাকষি নিশ্চয়ই হয়নি। যখন রফারফি হল তখন রাত এগারটা। আমি বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়েছিলুম—আড্ডা তাতে আপত্তি জানান নি, বরের উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। কাফের ছোকরা আমাকে বিছানা থেকে ডেকে নিয়ে গেল। মাপ দেওয়া হল। তিন দিন বাদে পয়লা ট্রায়েল—অবশ্য কাফেতেই।

তিন দিন বাদে আড্ডা ফুল স্ট্রেন্‌থে হাজির। আমি কাফের পিছনের কামরায় গিয়ে নূতন সুট পরে বেরিয়ে এলুম। সর্বত্র চকের দাগ আর তাঁতীবাড়ির মত আমার সর্বাঙ্গ থেকে সুতো ঝুলছে। সুটের চেহারা দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন 'মার লাগাও ব্যাটা প্লাস্তিরাসকে; এ কি সুট বানিয়েছে না মৌলবী সাহেবের জোব্বা কেটেছে? ও কি পাতলুন না চিমনির চোঙা? প্লাস্তিরাস দর্জি না হাজাম?' ইত্যাদি সর্বপ্রকারের কটুকাটব্য। প্লাস্তিরাসও হেঁকে বলল, সে স্বয়ং বাদশার সুট বানায়। সবাই বললে, 'কোন বাদশা? শাহারার?'

তারপর এ বলে আস্তিন কাটো, ও বলে কলার ছাঁটো। কেউ বলে পাতলুন

নামাও, কেউ বলে কোট তোলো। প্লাস্তিরাসও পয়লা নম্বরের ঘড়েল—সক্কলের কথায় কান দেয় আবার কারো কথায় কান দেয়ও না, অর্থাৎ যা ভালো বোঝে তাই করে।

এই করে কাফেতে আড্ডা জমানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ট্রায়েল পেরলুম। সুট তৈরী হল। আমি সেইটে পরে নব বরের মত লাজুক হাসি হেসে সবাইকে সেলাম করলুম। সুট দীর্ঘজীবী হোক বলে সবাই আশীর্বাদ করলেন। কাফের মালিক পর্যন্ত আমাদের পরবে সামিল হল। আমি সবাইকে একপ্রস্থ কফি খাওয়ালুম। সে-সুট পরে আজও যখন ফার্পোতে যাই, গুণীরা তারিফ করেন।।

আড্ডা

আড্ডা সম্বন্ধে সম্প্রতি কয়েকটি উত্তম উত্তম লেখা বাঙলায় বেরোনোর পর ইংরিজিতেও দেখলুম আড্ডা হামলা চালিয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপের ভশচায এবং জমিদার-হাভেলির মৌলবী যেন হঠাৎ কোট-পাতলুন-কামিজ পরে গট্‌গট করে স্টেটসম্যান অফিসে ঢুকলেন। আমার তাতে আনন্দই হল।

কিন্তু এ সম্পর্কে একটি বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আড্ডাবাজরা বলতে চান, বাঙলার বাইরে নাকি আড্ডা নেই। কথাটা ঠিকও, ভুলও। তুলনা দিয়ে নিবেদন করছি। সিন্ধুনদ উজিয়ে যে মাছ ধরা পড়ে তার নাম 'পল্লা'—অতি উপাদেয় মৎস্য। নর্মদা উজিয়ে ভরোচ শহরে যে মাছ ধরা পড়ে তার নাম 'মদার'—সেও উপাদেয় মৎস্য। আর গঙ্গা পদ্মা উজিয়ে যে মাছ বাঙালীকে আকুল করে তোলে, তার নাম ইলিশ—খোট্টা (মাফ কীজীয়ে) মুল্লুক পৌঁছনর পর তার নাম হয় হিল্‌সা।

উপর্যুক্ত সর্ব মৎস্য একই বস্তু—দেশভেদে ভিন্ন নাম। তফাৎ মাত্র এইটুকু যে সরষে বাটা আর ফালি ফালি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আমরা যে-রকম ইলিশ দেবীর পুজো দি বাদবাকীরা ওরকমধারা পারে না। অর্থাৎ আড্ডা বহু দেশেই আছে, শুধু আমাদের মত তরিবৎ করে রসিয়ে রসিয়ে চাখতে তারা জানে না। অপিচ ভুললে চলবে না সিন্ধীরা আমাদের সরষে-ইলিশ খেয়ে নাক সিঁটকে বলেন, 'কী উম্‌দা চীজকে বরবাদ করে দিলে।' ভৃগুকচ্ছের (ভরোচের) মহাজনগণও সিন্ধীর রান্না পাল্লা খেয়ে 'আল্লা আল্লা' বলে রোদন করেন।

কে সূক্ষ্ম নিরপেক্ষ বিচার করবে? এ যে রসবস্তু—এবং আমার মতে ভোজনরস সর্বরসের রসরাজ।

তাই কাইরোর আড্ডাবাজরা বলেন, একমাত্র তাঁরাই নাকি আড্ডা দিতে

জানেন।

কাইরোর আড্ডা কক্‌খনো কোনো অবস্থাতেই কারো বাড়িতে বসে না। আড্ডাবাজরা বলেন, তাতে করে আড্ডার নিরপেক্ষতা—কিংবা বলুন গণতন্ত্র—লোপ পায়। কারণ যাঁর বাড়িতে আড্ডা বসল, তিনি পানটা-আসটা, খিচুড়িটা ইলিশ-ভাজাটা (আবার ইলিশ! সুশীল পাঠক ক্ষমা করো। ঐ বস্তুটির প্রতি আমার মারাত্মক দুর্বলতা আছে। বেহশ্‌তের বর্ণনাতে ইলিশের উল্লেখ নেই বলে পাঁচ-বকৎ নামাজ পড়ে সেথায় যাবার কণামাত্র বাসনা আমার নেই) 'ফিরি' দেন বলে তাঁকে সবাই যেন একটু বড্ড বেশী তোয়াজ করে। আড্ডাগোত্রের মিশরী নিকষ্যি মহাশয়রা বলেন, বাড়ির আড্ডায় 'মেল' মেলে না।

অপিচ, পশ্য পশ্য, কোনো কাফেতে যদি আড্ডা বসে, তবে সেখানে কেউ কাউকে খয়ের খাঁ বানাতে পারে না—যেন পুরীর মন্দির, জাত-ফাত নেই, সব ভাই, সব বেরাদর।

এবং সবচেয়ে বড় কথা বাড়ির গিন্নী 'মুখপোড়া মিনষেরা ওঠে না কেন' কখনো শুনিয়ে, কখনো আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়ে অকারণে অকালে আড্ডার গলায় ছুরি চালাতে পারেন না। তার চেয়ে দেখো দিখিনি, দিব্যি কাফেতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছি, পছন্দ-মাফিক মমলেট কাটলেট খাচ্ছ, আড্ডা জমজমাট ভরভরাট, কেউ বাড়ি যাবার নামটি করছে না, কারো গিন্নী এসে উপস্থিত হবেন সে ভয়ও নেই—আর চাই কি?

শতকরা নব্বুই জন কাইরোবাসী আড্ডাবাজ এবং তার দশ আনা পরিমাণ অর্ধেক জীবন কাটায় কাফেতে বসে আড্ডা মেরে। আমাদের আড্ডা বসত 'কাফে দ্য নীল' বা 'নীলনদ কাফেতে'। কফির দাম ছ পয়সা, ফি পাত্তর। রাবড়ির মত ঘন কিন্তু দুধ চাইলেই চিত্তির। সবাই কালো কফি খায়, তাই দুধের কোনো ব্যবস্থা নেই। কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না, দু দিনেই অভ্যাস হয়ে যায়। কালো কফি খেলে রঙভী ফর্সা হয়।

আমাদের আড্ডাটা বসত কাফের উত্তর-পূর্ব কোণে, কাউন্টারের গা ঘেঁষে। হরেক জাতের চিড়িয়া সে আড্ডায় হরবকৎ মৌজুদ থাকত। রমজান বে আর সজ্জাদ এফেন্দি খাঁটি মিশরী মুসলমান, ওয়াহ্‌হাব আতিয়া কপ্ট খ্রীশ্চান অর্থাৎ ততোধিক খাঁটি মিশরী, কারণ তার শরীরে রয়েছে ফারাওদের রক্ত। জুর্নো ফরাসী কিন্তু ক'পুরুষ ধরে 'কাইরোর হাওয়া বিষাক্ত করছে' কেউ জানে না, অতি উত্তম আরবী কবিতা লেখে আর সে কবিতার আসল বক্তব্য হচ্ছে, সে তলওয়ার চালিয়ে আড়াই ডজন বেদুইনকে ঘায়েল করে প্রিয়াকে উটের উপর তুলে মরুভূমির দিগদিগন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, যদিও আমরা সবাই জানতুম, জুর্নো যেটুকু মরুভূমি দেখেছে সে পিরামিডে বেড়াতে গিয়ে, তাও জীবনে একবার মাত্র, যদিও পিরামিড কাইরো থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। উট কখনো চড়ে নি, ট্রামের ঝাঁকুনিতেই বমি করে ফেলে। আর

তলওয়ার? তওবা, তওবা! মার্কোস জাতে গ্রীক, বেশী নয় কুল্লে আড়াই হাজার বৎসর ধরে তারা মিশরে আছে। মিশর রাণী, গ্রীক রমণী ক্লিয়োপাত্রার সঙ্গে তার নাকি খেশকুটুম্বিতা আছে। হবেও বা, কারণ প্রায়ই ব্যবসাতে দাঁও মেরেছে বলে ফালতো এবং 'ফিরি' এক রোঁদ কফি খাইয়ে দিত। তাতে করে কাফের 'গণতন্ত্র' ক্ষুণ্ণ হত না, কারণ মার্কোসকে 'ক্যাটা ফাইলে'ও আড্ডার ঝগড়া-তাজিয়ায় সে কস্মিনকালেও হিস্যা নিত না, বেশীর ভাগ সময় চেয়ারের হেলানে মাথা রেখে আকাশের দিকে হাঁ করে ঘুমুত কিংবা খবরের কাগজ থেকে তুলোর ফটকা বাজারের তেজিমন্দির (বুল এ্যান্ড বিয়ার) হালহকিকৎ মুখস্ত করত।

আর বাঙলা দেশের তাবৎ চণ্ডীমণ্ডপ, বেবাক জমিদার-হাবেলীর আড্ডার প্রতিভূ হিসেবে আপনাদের আশীর্বাদে আর শ্রীগুরুর কৃপায় ধূলির ধূলি এ-অধম।

আমার বাড়ির নিতান্ত গা ঘেঁষে বলে নিছক কফি পানার্থে ঐ কাফেতে আমি রোজ সকাল-সন্ধ্যা যেতুম। বিদেশ বিভূঁই, কাউকে বড় একটা চিনি নে, ছন্নের মত হেথা-হোথা ঘুরে বেড়াই আর দেশ ভ্রমণ যে কি রকম পীড়াদায়ক 'প্রতিষ্ঠান' সে সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক কেতাব লিখব বলে মনে মন পাঁয়তারা কষি। এমন সময় হঠাৎ খেয়াল গেল কাফের কোণের আড্ডাটির দিকে। লক্ষ্য করি নি যে কফি পানটা ওদের নিতান্ত গৌণকর্ম, ওরা আসলে আড্ডাবাজ।

আম্মো যে আড্ডাবাজ সে তত্ত্বটা ওদের মনে ঝিলিক দিয়ে গেল একটি ব্রাহ্মমুহূর্তে। সে 'মহালগনের' বর্ণনা আমি আর কি দেব? সুরসিক পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো শ্রীহরি শ্রীরাধাতে, ইউসুফ জোলেখাতে, লায়লী মজনুতে, ত্রিস্তান ইজোল্‌দেতে কি করে প্রথম চারি চক্ষু বিনিময় হয়েছিল। কী ব্যাকুলতা কী গভীর তৃষা, কী মহা ভবিষ্যতের প্রগাঢ় সুখস্বপ্ন, কী মরুতীর পার হয়ে সুধাশ্যামলিম নীলাম্বুজে অবগাহনানন্দ সে দৃষ্টি বিনিময়ে ছিল! এক ফরাসী কবি বলেছেন, 'প্রেমের সবচেয়ে মহান দিবস সেদিন, যেদিন প্রথম বলেছিলুম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তত্ত্বটা হৃদয়ঙ্গম হল সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে।

তাঁবা-তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে আসুন, স্পর্শ করে বলব, তিন লহমাও লাগে নি, এই ব্রাত্যের উপনয়ন হয়ে গেল, বেদ, শাখা, ঋষি স্থির হয়ে গেলেন—সোজা বাঙলায় বলে, জাতে উঠে গেলুম। অমিয়া ছানিয়া, নয়ন হানিয়া বললুম, 'এক রোঁদ কফি?'

আড্ডার মেম্বাররা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে পরিতোষের স্মিত-হাস্য বিকশিত করলেন। ভাবখানা, ভুল লোককে বাছা হয় নি।

কাফের ছোকরাটা পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে। আমার ছন্নছাড়া ভাবটা তার চোখে বহুপূর্বেই ধরা পড়েছিল। রোজ পরিবেশন করার সময় নীলনদ-ডেল্টার মত মুখ হাঁ করে হেসে আমি যে অতিশয় ভদ্রলোক—অর্থাৎ জোর টিপ্‌স দি—সে

কথাটা বলে আড্ডার সামনে আমার কেস রেকমেন্ড করল।

জুর্নো তাড়া লাগিয়ে বললেন, 'যা, যা, ছোঁড়া, মেলা জ্যাঠামো করিস নে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাসা আরবী বলেন আপনি।'

রবিঠাকুর বলেছেন—

'এত বলি সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া
বিদেশীর অঙ্গ হতে—'

ঠিক সেই ধরনে আমার দিকে তাকিয়ে জুর্নো যেন আমার প্রবাস-লাঞ্ছনা এক থাবড়ায় ঝেড়ে ফেললেন, আমার অঙ্গ থেকে।

আমি কিন্তু মনে মনে বললুম, 'ইয়া আল্লা, তের দিনের আরবীকে যদি এরা বলে খাসা তবে এরা নিশ্চয়ই খানদানী মনিষ্যি।' করজোড়ে বললুম, 'ভারতবর্ষের নীতি, সত্য বলবে, প্রিয় বলবে, অপ্রিয় সত্য বলবে না; আপনাদের নীতি দেখছি আরো এক কদম এগিয়ে গিয়েছে, প্রিয় অসত্যও বলবে।'

আড্ডা তো—পার্লিমেন্ট নয়—তাই হরবকৎ কথার পিঠে কথা চলবে এমন কোনো কসমদিব্যি নেই। দুম্ করে রমজান বে বললে, আমার মামা (আমি মনে মনে বললুম, 'যগ্যিদাসের মামা') হজ করতে গিয়েছিলেন আর বছর। সেখানে জনকয়েক ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তারা নাকি পাঁচ বকৎ নামাজ পড়ত আর বাদবাকি তামাম দিনরাত এক চায়ের দোকানে বসে কিচির-মিচির করত। তবে তারা নাকি কোন এক প্রদেশের—বিঙ্গালা, বাঙালী—কি যেন—আমার ঠিক মনে নেই—'

উৎসাহে উত্তেজনায় ফেটে গিয়ে চৌচির হয়ে আমি শুধালুম, 'বাঙালা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

আমি চোখ বন্ধ করে ভাবলুম, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম বাঙালী। কিন্তু কই, কখনো তো এত গর্ব অনুভব করি নি যে, আমি বাঙালী। এই যে নমস্য মহাজনরা মক্কা শহরে আড্ডাবাজ হিসেবে নাম করতে পেরেছেন—নিশ্চয়ই বিস্তর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে—তাঁরা আলবৎ শ্রীহট্ট, নোয়াখালি, চাটগাঁ, কাছাড়ের বাঙালী খালাসী, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা নগরীর উপকণ্ঠে খিদিরপুরে আড্ডা মারতে শিখে হেলায় 'মক্কা করিলা জয়'।

আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে উঠে ডান হাত বুকের উপর রেখে মাথা নিচু করে অতিশয় সবিনয় কণ্ঠে বললুম, 'আমি বাঙালী।'

গ্রীক সদস্য মার্কোস প্রথম পরিচয়ের সময় একবার মাত্র 'সালাম আলাইক্' করে খবরের কাগজের পিছনে ডুব মেরেছিলেন। তাঁর কানে কিছু যাচ্ছিল কি না জানি নে। আমি ভাবলুম, রাশভারী লোক, হয়তো ভাবছেন, নূতন মেম্বর হলেই তাকে নূতন জামাইয়ের মত কাঁধে তুলে ধেই ধেই করেই নাচতে হবে একথা আড্ডার

কন্‌স্‌টিট্যুশানে লেখে না। মুখের উপর থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে বললেন, 'দাঁও মেরেছি। একটা শ্যাম্পেন হবে? আমাদের নূতন মেম্বর—' কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়েছিল মালিক; তার দিকে তাকিয়ে বাঁ হাত গোল করে বোতল ধরার মুদ্রা দেখিয়ে ডানহাত দিয়ে দেখালেন ফোয়ারার জল লাফানোর মুদ্রা। ম্যানেজার কুল্লে দুই ডিগ্রী কাৎ করে ঘাড় নাড়ল।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'এ দোকানে তো মদ বেচার লাইসেন্স নেই।'

মার্কোস বললেন, 'কাফের পিছনে, তার ড্রইংরুমে। ব্যাটা সব বেচে;—আফিম, ককেইন, হেরোইন, হশীশ যা চাও।'

ছোকরাকে বললেন, 'আর একটা তামাকও সাজিস।'

বলে কি? কাইরোতে তামাক! স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রম নু?

দিব্যি ফর্শী হুঁকো এল। তবে হনুমানের ন্যাজের মত সাড়ে তিনগজী দরবারি নল নয় আর সমস্ত জিনিসটার গঠন কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা। জরির কাজ করা আমাদের ফর্শী কেমন যেন একটু 'নাজুক', মোলায়েম হয়—এদের যেন একটু গাঁইয়া। তবে হ্যাঁ চিলিমটা দেখে ভক্তি হল—ইয়া ডাবর পরিমাণ। একপো তামাক হেসেখেলে তার ভিতর খানা গাড়তে পারে—তাওয়াও আছে। আগুনের বেলা অবিশ্যি আমি টিকের ধিকিধিকি গরম প্রত্যাশা করিনি, কারণ কাবুলেও দেখেছি টিকে বানাবার গুহ্যতথ্য সেখানকার রসিকরাও জানেন না।

আর যা খুশবাই বেরল তার রেশ দীর্ঘ চোদ্দ বছর পরও যেন আমার নাকে লেগে আছে।

পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো সুগন্ধী ইজিপশিয়ন সিগারেট ভুবনবিখ্যাত। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছ বিশেষ করে মিশরই সুগন্ধী সিগারেট তরিবৎ করে বানাতে শিখল কি করে? আইস, সে সম্বন্ধ ঈষৎ গবেষণা করা যাক্। এই সিগারেট বানানোর পিছনে বিস্তর ইতিহাস, এন্তার রাজনীতি এবং দেদার রসায়নশাস্ত্র লুক্কায়িত রয়েছে।

সিগারেটের জন্য ভালো তামাক জন্মায় তিন দেশে। আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে, গ্রীসের মেসেডোন অঞ্চলে এবং রুশের কৃষ্ণসাগরের পারে পারে। ভারতবর্ষ প্রধানত ভার্জিনিয়া খায়, কিছুটা গ্রীক। কিন্তু এই গ্রীক তামাক এদেশে টার্কিশ এবং ইজিপশিয়ন নামে প্রচলিত। তার কারণ একদা গ্রীসের উপর আধিপত্য করত তুর্কী এবং তুর্কী গ্রীসের বেবাক তামাক ইস্তাম্বুলে নিয়ে এসে কাগজে পেঁচিয়ে সিগারেট বানাত। মিশরও তখন তুর্কীর কব্জাতে, তাই তুর্কীর কর্তারা কিছুটা তামাক মিশরে পাঠাতেন। মিশরের কারিগররা সেই গ্রীক তামাকের সঙ্গে খাঁটি মিশরের খুশবাই মাখিয়ে দিয়ে এক অনবদ্য রসনালী নির্মাণ করলেন তারই নাম ইজিপশিয়ন সিগারেট।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন চায়ের টিন যদি রান্নাঘরে ভালো করে বন্ধ না রাখা হয়, তবে ফোড়নের ঝাঁঝে চা বরবাদ হয়ে যায়, অর্থাৎ আর আর কিছু না হোক

খুশবাইটি আঁতুড়ঘরে নুন-খাওয়ানো বাচ্চার মত প্রাণত্যাগ করে! মালজাহাজ লাদাই করা যে অপিসারের কর্ম তিনিও বিলক্ষণ জানেন, যে-জাহাজে কাঁচা তামাক লাদাই করা হয়েছে তাতে কড়া গন্ধওলা অন্য কোনো মাল নেওয়া হয় না—পাছে তামাকের গন্ধ এবং কিঞ্চিৎ স্বাদও নষ্ট হয়ে যায়।

তাই তামাকের স্বাদ নষ্ট না করে সিগারেটকে খুশবাইয়ে মজানো অতীব কঠিন কর্ম। সিগারেটে একফোঁটা ইউকেলিপ্‌টস্‌ তেল ঢেলে সেই সিগারেট ফুঁকে দেখুন, একফোঁটা তেল আস্ত সিগারেট একদম বরবাদ করে দিয়েছে। পাঁচ বছরের বাচ্চাও তখন সে সিগারেট না কেশে অনায়াসে ভস্‌ ভস্‌ করে ফুঁকে যেতে পারে (বস্তুত বড্ড বেশি ভেজা সর্দি হলে অনেকে এই পদ্ধতিতে ইউকেলিপ্‌টস্‌ সেবন করে থাকেন—যাঁরা সিগারেট সইতে পারেন না তাঁরা পর্যন্ত)।

বরঞ্চ এমন গুণী আছেন যিনি এটম বমের মাল মশলা মেশানোর হাড়হদ্দ হালহকিকৎ জানেন, কিন্তু তামাকের সঙ্গে খুশবাই! তার পিছনে রয়েছে গূঢ়তর, রহস্যাবৃত ইন্দ্রজাল।

কিচ্ছু বাড়িয়ে বলছি নে। অজন্তার দেওয়াল এবং ছবির রঙ কোন কোন মশলা দিয়ে বানানো হয়েছিল, পাঠানযুগে পাথরে পাথরে জোড়া দেবার জন্য কি মাল কোন পরিমাণে লাগানো হয়েছিল আমরা সে তত্ত্বগুলো মাথা খুঁড়েও বের করতে পারি নি এবং পারে নি বিশ্বসংসার বের করতে কি কৌশলে, কি মশলা দিয়ে মিশরীরা তাদের মমীগুলাকে পচার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

স্বীকার করি, মিশরীরা একদিন সে কায়দা ভুলে মেরে দিয়েছিল—পাঠান মোগল যুগে যে-রকম আমাদের অনেকখানি রসায়নবিদ্যা অনাদরে লোপ পায়। তবু তো আমরা আজও মকরধ্বজ, চবনপ্রাশ বানাতে পারি—ভেজাল তো শুরু হল মাত্র সেদিন, আমাদেরই চশমার সামনে।

মিশরীরাও ঠিক সেই রকম সুগন্ধ-তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুলে যায় নি। ঝড়তি-পড়তি যেটুকু এলেম তখনো তাদের পেটে ছিল তাই দিয়ে তারা সে সমস্যা সমাধান করল, তামাকে কি করে খুশবাই জোড়া যায়, তামাকের 'সোয়াদ'টি জখম না করে।

তাই যখন কোনো ডাকসাইটে তামাক-কদরদারের (হায়! এ গোত্র পৃথিবীর সর্বত্র কি কাবুল, কি দিল্লী, কি কাইরো—সুকুমারের ভাষায় বলি—হুশ হুশ করে মরে যাচ্ছে) তদারকিতে কাইরোর কাফেতে তামাক সাজা হয় এবং সেই কদরদার যখন সে তামাকের নীলাভ ধুঁয়োটি ফুরফুর করে নাকের ভিতর দিয়ে ছাড়েন এবং নীলনদের মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া যখন সেই ধুঁয়োটির সঙ্গে রসকেলি করে তাকে ছিন্নভিন্ন করে কাফের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়, তখন রাস্তার লোক পর্যন্ত উন্নাসিক হয়ে থমকে দাঁড়ায়, পাঁড় সিগারখেকো, পাইকারি সিগারেট-ফোঁকো পর্যন্ত বুকের উপর হাত রেখে আসমানের দিকে তাকিয়ে 'অলহমদুলিল্লা অলহমদুলিল্লা' (খুদাতালার

তারিফ) বলে।

আর ইলিশের বেলা যে-রকম হয়েছিল, এ অধম ঠিক সেই রকম তাজ্জব মানে, বেহশ্‌তের বর্ণনায় এ তামাকের বয়ান নেই কেন? তা হলে পাপ করে নরকে যেত কোন মূর্খ?

* * *

বাঙালী তার চুলটিকে কেতাদুরস্ত করে রাখতে ভালোবাসে, কাবুলী বেলা-অবেলা মোকা পেলেই তার পায়জারে গুটিকয়েক পেরেক ঠুকিয়ে নেয়, ইংরেজ আয়না সামনে পেলেই টাইটা ঠিক মধ্যিখানে আছে কি না, তার তদারকিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, পেশাওয়ারী পাঠানের প্রধান শিরঃপীড়া তার শিরাভরণ নিয়ে, আর মিশরীর চরম দুর্বলতা তার জুতো জোড়াটিকে 'বালিশ' (আরবী ভাষায় 'প' অক্ষর নেই, তাই ইংরিজি 'পালিশ' কথাটা মিশরীতে 'বালিশ' রূপ ধারণ করেছে) রাখার জন্যে।

অতএব কাফেতে ঢোকামাত্রই কাফের 'বুৎ-বালিশ' (অর্থাৎ বুট পালিশ করনেওয়ালা) ছোকরা এসে আপনাকে সেলাম ঠুকবে। আপনি তাকে বিলক্ষণ চেনেন, তাই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলবেন, 'যা, যা'—তার অর্থ 'আচ্ছা পালিশ কর'। সে বত্রিশখানা ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে আপনার 'বুৎ-বালিশ' কর্মে নিযুক্ত হবে।

সদস্যদের কেউ বলবেন, 'শুভ দিবস,' কেউ 'এই যে', কেউ একটু মৃদু হাস্য করবেন, আর কেউ মুখ খবরের কাগজের আড়ালে রেখেই কাগজখানা ঈষৎ দুলিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে আপনার কফি এসে উপস্থিত। ওয়েটার ঠিক জানে, আপনি কতটা কড়া, কতখানি চিনি আর কোন ঢঙের পেয়ালার কফি খেতে পছন্দ করেন। আপনি বলবেন, 'চিঠিপত্র নেই?'

অর্থাৎ গৃহিণীর ভয়ে আপনি প্রিয়াকে কাফের ঠিকানা দিয়েছেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'ফোন?'

'আজ্ঞে না। তবে ইউসুফ বে আপনাকে বলতে বলেছেন, তিনি একটু দেরিতে আসবেন। আপনি যেন চলে না যান।'

'চুলোয় যাক গে ইউসুফ বে। আমি জিজ্ঞেস করছি চিঠি বা ফোন নেই?'

কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'আজ্ঞে না।' জানে আজ আপনি দরাজ হাতে বখশিশ দেবেন না।

'যাও চিঠির কাগজ নিয়ে এস।'

কাফের নাম-ঠিকানা-লেখা উত্তম চিঠির কাগজ, খাম, ব্লটিং প্যাড যাবতীয় সাজসরঞ্জাম এক মিনিটের ভিতর উপস্থিত হবে। আপনি পাশের টেবিলে গিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রেমপত্র লিখে যখন ঘণ্টাখানেক পরে আড্ডার টেবিলে ফিরে ওয়েটারকে বলবেন, চিঠিটা ডাকে ফেলতে, তখন হঠাৎ রমজান বে শুধাবে 'কাকে লিখলে?' যেন কিছুই জানে না।

চটে গিয়ে বললেন, 'তোমার তাতে কি?'

রমজান বে উদাস সুরে বলবে, 'না আমার তাতে কি। তবু বলছিলুম, সকালে বিল্‌কিসের সঙ্গে দেখা। সে তোমাকে বলে দিতে বললে, তুমি যেন সাড়ে এগারোটায় 'ফামিনা সিনেমা'র গেটে তাঁর সঙ্গে দেখা করো।'

আরো চটে গিয়ে বলবেন, 'তাহলে এতক্ষণ ধরে সেটা বলো নি কেন?'

'সাড়ে এগারোটা বাজতে তো এখনো অনেক দেরি।'

'আঃ সে কথা হচ্ছে না। আমি যে মিছিমিছি এক ঘণ্টা ধরে চিঠিটা লিখলুম।'

রমজান বে আরো উদাস সুরে বলবে, 'জানি নে ভাই, তোমাদের দেশে প্রেমের রেওয়াজ কি। এদেশে তো জানি প্রিয়া পাশের ঘরে আর এ-ঘরে বসে প্রেমিক পাতার পর পাতা প্রেমপত্র লিখে যাচ্ছেন।

এতক্ষণ একটা মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থিত হল। রেশন শপ খোলা মাত্রই মেয়ে মদ্দে যে রকম দোকানের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তামাম আড্ডা ঠিক সেই রকম প্রেমপত্র লেখার সময় অসময়, মোকা বে মোকা, কায়দা-কেতা সম্বন্ধে আলোচনা জুড়ে দেবে।

ক্রমে ক্রমে আলোচনার বিষয়বস্তু হটতে হটতে পৌঁছবে সেই সনাতন প্রশ্নে, কোন দেশের রমণী সবচেয়ে সুন্দরী হয়।

অবান্তর নয়, তাই নিবেদন করি, দেশ বিদেশ ঘুরেছি, অর্থাৎ ভ্যাগাবন্ড হিসাবে আমার ঈষৎ বদনাম আছে। কাজেই আমাকে কেউ শুধান, কোন দেশের রান্না সবচেয়ে ভাল, কেউ শুধান, তুলনাত্মক কাব্যচর্চার জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশস্ততম, আর অধিকাংশ শুধান, কোন দেশের রমণী সবচেয়ে সুন্দরী?

আমি কলির পরশুরামের স্মরণে উত্তর দি, 'এনারা আছেন, ওনারাও আছেন।' কারণ যাঁরা দেশ বিদেশ ঘোরেন নি, তাঁদের সঙ্গে এ-আলোচনাটা দানা বাঁধে না, বড্ড একতরফা বক্তৃতার মত হয়ে যায়, আর সবাই জানেন, বক্তৃতা আড্ডায় সবচেয়ে ডাঙর দুশমন।

এ সংসারে যদি কোনো শহরের সত্যকার হক্ক থাকে, উপযুক্ত প্রাণাভিরাম বিষয় নিয়ে আলোচনা করার তবে কসম খেয়ে বলতে পারি সে শহর কাইরো। কারণ কাইরোতে খাঁটি বাসিন্দারূপে যুগ যুগ ধরে আছে গ্রীক, আরব, তুর্কী, হাবশী, সুদানী, ইতালীয়, ফরাসিস্ ইহুদী, এবং আরো বিস্তর চিড়িয়া। এদের কেউ কেউ বোরকা পরেন বটে, তবু অক্লেশে বলা যেতে পারে, কাফের দরজার দিকে মুখ করে বসে আড্ডা অনায়াসে নিজের মুখে ঝাল খেয়ে নিতে পারে।

আর শীতকাল হলে তো পোয়া বারো। কাইরোতে বছরে আড়াই ফোঁটা বৃষ্টি হয়, সাহারার শুকনো হাওয়া যক্ষ্মারোগ সারিয়ে দেয়, পিরামিড কাইরোর বাইরেই ঠায় বসে, ফুর্তি ফার্তির নামে কাইরো বে এক্তিয়ার, মসজিদ কবর কাইরো শহর বে শুমার

শীতকালে না-গরম না-ঠাণ্ডা আবহাওয়া, সবসুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে কাইরো টুরিস্টজনের ভূস্বর্গ এবং টুরিস্টদেরও বটে।

তদুপরি মার্কিন লক্ষপতিরা আসে নানান ধান্দায়। তাঁদের সন্ধানে তাবৎ দুনিয়ার ডাকসাঁইটে সুন্দরীরা। তাঁদের সন্ধানে আসেন হলিউডের ডিরেক্টররা এবং তার সঙ্গে নিয়ে আসেন আরেক ঝাঁক সুন্দরী।

কিন্তু থাক, সুশীল পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো, কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে আলোচনা শাস্ত্রে নিষেধ। গুরুর বারণ।

* * *

মিশরী আড্ডাবাজরা (দাঁড়ান ব্যাকরণে ভুল হয়ে গেল। মিশরী মাত্রই আড্ডাবাজ ঃ এমন কি সাদ্ জগলুল্ পাশা পর্যন্ত দিনে অন্তত একবার আড্ডার সন্ধানে বেরতেন। তবে, হাঁ, তিনি কোনো টেবিলে গিয়ে বসলে কেউ সাহস করে সে টেবিলের ত্রিসীমানায় ঘেঁষত না। সেখান থেকে তিনি চোখের ইশারায় এঁকে ওঁকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আড্ডা জমাতেন) দৈবাৎ একই আড্ডায় জীবন কাটান। বিষয়টা সবিস্তর, বুঝিয়ে বলতে হয়।

এই মনে করুন, আপনি রোজ আপিস ফেরার পথে 'কাফে দ্য নীলে'র ওতরপুব কোণে বসেন। সে টেবিলটায় আপনার জন-পাঁচেক দোস্ত বসেন। আড্ডার ফুল স্ট্রেনথ্ জন দশ—সবাই কিন্তু সব দিন এ আড্ডাতেই আসেন না। তাই হরে-দরে আপনার টেবিলে জন পাঁচ-সাত নিয়মিত উপস্থিত থাকেন।

এ ছাড়া আপনি সপ্তাহে একদিন—জোর দু'দিন, বাড়ির পাশের সেমিরামিস কাফেতে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বসেন। এ আড্ডার সদস্যরা কিন্তু আপনার 'কাফে দ্য নীলে'র সদস্যদের বিলকুল চেনে না। এরা হয়তো চ্যাংড়ার দল, কলেজে পড়ে, কেরানীগিরি করে, বেকার, কিংবা, ইনসিওরেন্স এজেন্ট (তার অর্থও বেকার)। এদের আলোচনার বিষয়বস্তু রাজনীতি, অর্থাৎ কোন পাশার বউ কোন মিনিস্টারের সঙ্গে পরকীয়া করেন বলে তাঁর বোনপো পার্টিতে ভালো নোকরি পেয়ে গেল, কিংবা আলোচনার বিষয়বস্তু সাহিত্য, অর্থাৎ কোন প্রকাশক এক হাজারের নাম করে তিন হাজার ছাপিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া অবশ্যই দুনিয়ার হাজারো জিনিস নিয়ে আলোচনা হয়, তা না হলে আড্ডা হবে কেন। এ আড্ডার সদস্যদের সবাই সবজান্তা। এরা মিশর তথা তাবৎ দুনিয়ার এত সব গুহ্য এবং গরম গরম খবর রাখেন যে এদের কথাবার্তা, হাবভাব দেখে আপনার মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না যে এদের প্রত্যেকের চোখের সামনে এক অদৃশ্য, অশ্রুত টেলিপ্রিন্টার খবর জানিয়ে যাচ্ছে এবং সে খবরের যোগান দিচ্ছেন রাশার বেরিয়া, জর্মনীর হিমলার আর কলকাতার টেগার্ট। রোজ বাড়ি ফেরার সময় আপনি তাজ্জব মানবেন, এদের সাহায্য ছাড়া মিশর তথা দুনিয়ার বাদবাকী সরকারগুলো চলছে কি করে। আপনার মনে আর

কোনো সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না যে, এদের যদি মস্কো, বার্লিন, লন্ডন, দিল্লীর বড় কর্তা বানিয়ে দেওয়া হয়, তবে দুনিয়ার কুল্লে সমস্যার সাকুল্য সমাধান এক লহমায়ই হয়ে যাবে। মনে মনে বললেন, 'হায় দুনিয়া, তুমি জান না তুমি কি হারাচ্ছ।'

আপনি এদের চেয়ে বছর দশেক বড়, তাই এরা আপনাকে একটুখানি সমীহ করে, যদিও আড় না হয়েই বিড়ি টানে কারণ এদেশে সে আদবটা তেমন নেই। আপনি নিতান্ত বিদেশী বলেই এ আড্ডায় ছিটকে এসে পড়েছেন। এদের কাউকে পয়লা আড্ডায় নিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি নিয়ে গিয়েছিলুম; বেচারী সেখানে রা'টি কাড়ে নি, যদ্যপি দুসরা আড্ডাতে সে-ই তড়পাত সবচেয়ে বেশী।

তাছাড়া আপনি মাসে একদিন কিংবা দু'দিন শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা কাফেতে যান। আপনার এক বন্ধু সে কাফেটারই উপরতলায় থাকেন। খাসা জায়গা—সামনেই নীলনদ বয়ে যাচ্ছে। আপনারই বন্ধু এখানকার আড্ডার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে প্রথম খুঁজবেন কাফেতে—সেখানে না পেলে অবশ্য তাঁর ফ্ল্যাটে যেতে পারেন, তাতে কিন্তু কোনো লাভ নেই।

এ কাফে আপনাকে উদ্বাহু হয়ে অভ্যর্থনা করবে যেন আপনি অনেক দিনের হারিয়ে-যাওয়া ফিরে-পাওয়া ভাই। কারণ আপনি এখানে আসেন কালেভদ্রে। আপনাকে পেয়ে এঁদের বিশেষ আনন্দ কারণ পক্ষাধিক কাল ধরে তাঁরা যে সব বিষয় কেটেকুটে ঘষেপিষে চাটনি বানিয়ে ফেলেছিলেন সেগুলো তাঁরা নূতন করে হাড়কাটে ঢুকিয়ে রামদা ওঁচাবেন। আপনার রায় জানতে চাইবেন। যে রায়ই দিন না কেন আপনার উদ্ধার নেই। আপনি যদিও গাঁধীর দেশের লোক—আপনি অবশ্য একশ'বার ওঁদের বলেছেন যে, গাঁধীর সঙ্গে আপনার কোনো প্রকারে সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই, কিন্তু তাতে করে কোনো ফায়দা ওৎরায় না—যদিও আপনার জ্ঞানগম্যিতে কারো কোনো সন্দেহ নেই, কারণ আপনি গুহ্য ষষ্ঠেন্দ্রিয় ধারণ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি তবু স্বীকার করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনি নির্ঘাৎ শেষ বাস্ মিস করবেন। বন্ধুর ফ্ল্যাটে সোফার উপর চতুর্থ যাম যাপন করে পরদিন সকালবেলা বাড়ি ফিরবেন।।

দেশে বিদেশে বহুবার দেখেছি যে, ইংরাজ বা ফরাসীর প্রশ্নে ভারতীয় সদুত্তর দিতে পারিতেছেন না। তাহার প্রধান কারণ (১) ভারতীয়রা স্বীয় ঐতিহ্য ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সুপরিচিত নহেন—ইহার জন্য প্রধানতঃ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিই দায়ী। (২) বিদেশী রীতিনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা—সে জ্ঞান থাকিলে ভারতীয় তৎক্ষণাৎ বিদেশীকে চক্ষে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া দেখাইয়া দিতে পারে যে, সে যাহা করিতেছে তাহা অন্যরূপে বা অল্প কিয়দ্দিন পূর্বে বিদেশীরাও করিত। নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে ও আশা করি কোনো কোনো ভারতীয়ের উপকারও হইবে।

বিদেশী ঃ তোমাকে সেদিন ফির্পোতে দাওয়াত করিয়াছিলাম। তুমি টালবাহানা দিয়ে পলাইলে। শুনিলাম শেষটায় নাকি আমজদীয়া হোটেলে খাইতে গিয়াছিলে। ফির্পোর খানা রাঁধে ত্রিভুবনবিখ্যাত ফরাসীস শেফ্ দ্য কুইজিন। সেই শেফকে উপেক্ষা করিয়া তুমি কোন জঙ্গলীর রান্না খাইতে গেলে!

ভারতীয় ঃ তোমাদের রান্নার অন্য গুণাগুণ বিচারের পূর্বে একটি অত্যন্ত সাধারণ বস্তুর দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লক্ষ্য করিয়াছ কি না জানি না যে, তোমাদের রান্নায় তিক্ত টক ও ঝাল এই রসের অভাব। অর্থাৎ ছয় রসের অর্ধেক নাই—ঝাল কিছু কিছু দাও বটে কিন্তু তাও বোতলে পুরিয়া টেবিলে রাখ, কারণ ঐ রসটির প্রতি তোমাদের সন্দেহ ও ভয় এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই। কাজেই তোমাদের খানা না খাইয়াই বলা যায় যে আর যে গুণই থাকুক বৈচিত্র্য তোমাদের রান্নায় থাকিবে না। শুধু লবণ আর মিষ্টি এই সা, রে লইয়া তোমরা আর কি সুর ভাঁজিবে? দুই-তারা লইয়া বীণার সঙ্গে টক্কর দিতে চাও? আমজদীয়ার 'জঙ্গলী'ও তাই তোমার শেফকে অনায়াসে হারাইয়া দিবে। দ্বিতীয়তঃ, তোমাদের ডাইনিং টেবিল ও রান্নাঘরে কোনো তফাত নাই। তোমরা ক্রুয়েট নামক ভাঙা-বোতল-শিশিওয়ালার একটা ঝুড়ি টেবিলের উপর রাখ। নিতান্ত রসকষহীন সিদ্ধ অথবা অগ্নিপক্ক বস্তু যদি কেহ গলাধঃকরণ না করিতে পারে তবে তাহাকে ডাইনিং টেবিলে পাকা রাঁধুনী সাজিতে হয়। স্নেহজাতীয় পদার্থ সংযোগ করিতে গিয়া অলিভ ওয়েল ঢাল, উগ্রতা উৎপাদনের জন্য রাই সরিষার (মাস্টার্ড) প্রলেপ দাও, কটু করিবার জন্য গোলমরিচের গুঁড়া ছিটাও,—বোতলটার আবার ছিদ্র রুদ্ধ বলিয়া তাহাকে লইয়া ধস্তাধস্তি করিতে করিতে স্কন্ধদেশস্থ অস্থিচ্যুতি ও ধৈর্যচ্যুতি যুগপৎ অতি অবশ্য ঘটে—, ভীতু পাচক বড় সাহেবের ভয়ে লবণও দিয়াছে কম,—লক্ষ্য করিয়াছ কি শতকরা আশীজন সুপ মুখে দিবার পূর্বেই নুন ছিটাইয়া লয়?—অতএব লবণ ঢালো। তৎ-সত্ত্বেও যখন দেখিলে

যে ভোজ্যদ্রব্য পূর্ববৎ বিস্বাদই রহিয়া গিয়াছে তখন তাহাতে সস্ নামক কিম্ভূতকিমাকার তরল দ্রব্য সিঞ্চন কর। তোমার গাত্রে যদি পাচক রক্ত থাকে তবে অবশ্য তুমি তাবৎ প্রলেপ-সিঞ্চন অনুপান-সম্মত বা মেকদার মাফিক করিতে পার, কিন্তু আমি, বাপু, 'ভদ্রলোকের' ছেলে, বাড়িতে মা-মাসীরা ঐ কর্মটি রান্নাঘরে রন্ধন করিবার সময় করিয়া থাকেন। খানার ঘর আর রান্নাঘরে কি তফাত নাই?

সায়েব ঃ রুচিভেদ আছে বলিয়াই তো এত বায়নাক্কা।

ভারতীয় ঃ ঐ সব জ্যেষ্ঠতাতত্ত্ব আমার সঙ্গে করিও না। তাই যদি হইবে তবে খানাঘরেই আগুন জ্বালাইয়া লইয়া মাংস সিদ্ধ করো না কেন, গ্রিল কবাব ঝলসাও না কেন? কেহ অর্ধপক্ক মাংস পছন্দ করে, কেহ পূর্ণপক্ক। সেখানেও তো রুচিভেদ; তবে পাচকের হাতে ঐ কর্মটি ছাড়িয়া দাও কেন? আসল কথা এই রুচিভেদ স্বীকার করিয়াও পাচক বহুজনসম্মত একটি মধ্য পন্থা বাহির করিয়া লহে ও গুণীরা সেইটি স্বীকার করিয়া অমৃতলোকে পৌঁছেন। রুচিভেদ থাকা সত্ত্বেও গুণীরা শেক্স্পিয়ার কালিদাস পছন্দ করেন। কবি কখনো যমক, অনুপ্রাস, উপমা আখ্যান বস্তুর পৃথক পৃথক নির্ঘণ্ট পৃথক পৃথক পুস্তকে দিয়ে বলেন না রুচিমাফিক মেকদার-অনুপানযোগে কাব্যসৃষ্টি করিয়া রসাস্বাদন করো।

সায়েব ঃ সে কথা থাকুক। কিন্তু আমজদীয়ার খানা খাইলে তো হাত দিয়া; সেখানে তো ছুরি-কাঁটার বন্দোবস্ত নাই।

ভারতীয় ঃ না, আছে। ভারতবর্ষ তোমাদের পাল্লায় পড়িয়া দিন দিন এমনি অসভ্য হইয়া পড়িতেছে যে, ভারতীয়রাও ছুরি কাঁটা ধরিতে শিখিবার চেষ্টা করিতেছে। এ নোংরামি করিবার কি প্রয়োজন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

সায়েব ঃ নোংরামি! সে কি কথা?

ভারতীয় ঃ নিশ্চয়ই। ঐ তো রহিয়াছে তোমার ছুরি, কাঁটা, চামচ; ঐ তো ন্যাপকিন। ঘষো আর দেখ, কটা ময়লা বাহির হয়। আর যেটুকু বাহির হইবে না, তাহা খাদ্যরস সংযোগে অগোচরে পেটে যাইবে। আর আমি আমারি আঙুল ঘষি, দেখ কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যদি আমার আঙুল ময়লা হয়ই, তবে আমি এখনই টয়লেট ঘরে গিয়ে আচ্ছা করিয়া হাত ধুইয়া লইব। তুমি যদি ছুরি-কাঁটা লইয়া ঐ দিকে ধাওয়া কর তবে ম্যানেজার পুলিস ডাকিবে, ভাবিবে চৌর্যবৃত্তিতে তোমার হাতেখড়ি হইয়াছে মাত্র। আর শেষ কথাটিও শুনিয়া লও, আমারি আঙুল আমি আমারি মুখে দিতেছি; তুমি যে কাঁটা-চামচ মুখে দিতেছ সেগুলি যে কত লক্ষ পায়োরিয়াগ্রস্তের অধরোষ্ঠে এবং আস্যগহ্বরেও নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে তাহার সন্দেশ চাখো কি? চীনারা তোমাদের তুলনায় পরিষ্কার। খাইবার কাঠি সঙ্গে লইয়া হোটেলে প্রবেশ করে।

সায়েব ঃ সে কথা থাকুক (ধুয়া)।

ভারতীয় ঃ হ্যাঁ, আলোচনাটি আমার পক্ষেও মর্মঘাতী। আমারি এক বাঙালী ক্রীস্টান বন্ধু কাঁটা দিয়া ইলিশ মাছ খাইতে যান—বেজায় সাহেব কিনা—ফলে ইলিশস্থি তাঁহার গলাস্থ হয় এমনি বেকায়দা বেদুরস্তভাবে যে, তাঁহার শরীরের অস্থিগুলি এখন গোরস্তানে চিরতরে বস্তি গাড়িয়াছে (অশ্রু বর্ষণ)।

সায়েব ঃ আহা! তবে ইলিশ না খাইলেই হয়।

ভারতীয় ঃ ইংরাজ হইয়া বেকন-আণ্ডা না খাইলেই হয়; ফরাসী হইয়া শ্যাম্পেন না খাইলেই হয়; জর্মন হইয়া সসিজ না খাইলেই হয়; বাঙালী হইয়া ইলিশ না খাইলেই হয়, অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেও হয়; আত্মহত্যা করিলেও হয়। লজ্জা করে না বলিতে? বাংলার বুকের উপর বসিয়া হোম্ হইতে টিনস্থ বেকন না পাইলে 'ব্রিটিশ ট্রেডিশন ইন্ ডেঞ্জার' বলিয়া কমিশন বসাইতে চাও, আর আমি গঙ্গার পারে বসিয়া গঙ্গার ইলিশ খাইব না? তাজ্জব কথা!

সায়েব ঃ সে কথা থাকুক (ধুয়া)। কিন্তু ঐ যে বলিলে তোমাদের মেয়েরা রান্না করেন, তাঁহারা কি শুধুই রান্না করেন? তাঁহারা এই নির্মম পর্দাপ্রথা মানেন কেন?

ভারতীয় ঃ সে যাঁহারা মানেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।

সায়েব ঃ তাঁহাদিগের সঙ্গে তো দেখাই হয় না।

ভারতীয় ঃ সে আমাদের পরম সৌভাগ্য।

সায়েব ঃ (চিন্তিত মনে) কথাটা কি একটু কড়া হইল না? আমরা কি এতই খারাপ?

ভারতীয় ঃ খারাপ ভালোর কথা জানি না সায়েব। তবে ১৭৫৭ সালে তোমাদের সাথে পীরিতিসায়রে সিনান করিতে গিয়া শুধু যে আমাদের সকলি গরল ভেল তাহা নয়, স্বরাজগামছাখানা হারাইয়া ফেলিয়া দুই শত শীত বৎসর ধরিয়া আকণ্ঠ দৈন্য-দুর্দশা-পঙ্কে নিমগ্ন—ডাঙায় উঠিবার উপায় নাই। পুরুষদের তো এই অবস্থা তাই মেয়েরা অন্দরমহলে তোমাদিগকে quit করিয়া বসিয়া আছেন।

সায়েব ঃ এ সব তো বাইরের কথা; তোমাদের কৃষ্টি ঐতিহ্য—

ভারতীয় ঃ আরেকদিন হইবে। উপস্থিত আমাকে Quit India গাহিতে রাস্তায় যাইতে হইবে।—সত্যপীর॥

ডিসেম্বর ১৯৪৫।

বেজো না চরণে চরণে

বিখ্যাত সাহিত্যিকদের কাছে নাকি নবীন সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখা নিয়ে গিয়ে চাঁইদের সার্টিফিকেট চান। বেচারীদের বিশ্বাস, চাঁইরা উত্তম সার্টিফিকেট দিলে তাঁরা সাহিত্যিক হিসেব খ্যাতি-প্রতিপত্তি পেয়ে যাবেন।

চাঁইদের কেউ কেউ সার্টিফিকেট দেন, কেউ লেখককে অন্য চাঁইদের কাছে পাঠিয়ে দেন, কেউ বা অসুখের ভান করে দেখাই করেন না। এ বাবদে পূজনীয় রাজশেখরবাবু রাজসিক পন্থাটি বের করে আরামসে দিন কাটাচ্ছেন। তিনি সবাইকে অকাতরে সার্টিফিকেট দেন—এমন কি মাঝে-মধ্যে না চাইলেও দেন। তাঁর বয়স হয়েছে। শেষের কটি দিন শান্তিতে কাটাতে চান। সোজাসুজি 'দেব না' বললে তাঁকে আর বাঁচতে হবে না, এবং 'দেব-দিচ্ছি' 'দেব-দিচ্ছি' করে টালবাহানা দেবার মতো শক্তিও তাঁর নেই। রবীন্দ্রনাথ অমিতবীর্য পুরুষসিংহবৎ ছিলেন, উমেদওয়ারদের ঠেকাবার মতো তাঁর সেক্রেটারিও ছিলেন—তবু তিনিও অকাতরে সার্টিফিকেট দিতেন। প্রাণের প্রতি তাঁর অহেতুক কোনো মায়াও ছিল না—'মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান' এ গান তিনি রচেছেন অল্প বয়সেই—তবু তিনি 'না-চাহিতে যারে দেওয়া যায়' ভাবখানা মুখে মেখে পিলপিল করে সার্টিফিকেট বিলোতেন। আমাকে পর্যন্ত তিনি একখানা দিয়েছিলেন।—অবশ্য সাহিত্যের জন্য নয়, চাকরির জন্য। আমি তাঁর 'কৃতী ছাত্র' এ ধরনের বহুবিধ আগড়ম-বাগড়ম লিখে তিনি আমাকে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু বিচক্ষণ লোক; তিনি আমাকে চাকরি দেননি। অন্যত্র চেষ্টা করার জন্য সার্টিফিকেটখানা ফেরত পেলুম না—কারণ চিঠিখানা ছিল নিতান্ত প্রাইভেট এবং পার্সনাল। শ্যামাপ্রসাদবাবু রবিবাবুর সার্টিফিকেটের মূল্য না দিলেও রবিবাবুর হাতের লেখা চিঠির মূল্য জানতেন। চিঠিখানা সযত্নে শিকের হাঁড়িতে তুলে রেখে দিয়েছিলেন।

এবং যাঁরা কিছুতে সার্টিফিকেট দিতে রাজী হন না, তাঁদের দু-একজনকে আমি চিনি। এবং এ কথাও বিলক্ষণ জানি, তাঁরা যে-সব বইয়ের সার্টিফিকেট দেওয়া দূরে থাক, গাল্-গালাজ পর্যন্ত করেছেন, তারই অনেকগুলো বাজারে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছে, রাজশেখরবাবুর 'দুই সিংহ' গল্পে আছে কোনো লেখক তাঁর বই কিছুতেই বিক্রি হচ্ছে না দেখে কোনো এক বাঘা সাহিত্যিককে ঘুষ দিয়ে লিখিয়ে নেয়, বইখানা অতিশয় অশ্লীল এবং কদর্য। ফলে নাকি সে বইয়ের প্রচুর কাটতি হয়েছিল।

কিন্তু এ-সব শোনা কথা কিংবা কাল্পনিক। রবিবাবু টাকের ওষুধের প্রশংসা করাতে ওষুধের বিক্রি বেড়েছিল কি না তার সঠিক স্টাটিস্টিক্স্ এখনো দেখিনি।

উল্টোটাও সঠিক জানবার উপায় নেই। এ যেন আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো। বেতারে আলিপুর বললে, 'সন্ধ্যায় বৃষ্টি হবে।' আপনি অবিশ্বাস করে ছাতা না নিয়ে বেরলেন। ফিরলেন ভিজে ঢোল হয়ে। তবেই দেখুন, এমনি লক্ষ্মীছাড়া দফ্‌তর যে, অবিশ্বাস করেও নিষ্কৃতি নেই, বিশ্বাস তো করা যায়ই না।

* * *

কিন্তু একখানা বই পড়ে আমি এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ হদিস পেয়েছি।

বইখানার নাম 'লিমিট অব্ আর্ট'। চল্লিশ টাকা দাম। ঢাউস মাল। কপিকল দিয়ে শেলফ্ থেকে ওঠাতে নাবাতে হয়।

কবিতার চয়নিকা। গ্রীক-লাতিন থেকে আরম্ভ করে, ফরাসী-জর্মন ইংরিজি-স্পানিশ-রুশ তাবৎ ইয়োরোপীয় ভাষা থেকে কবিতা-সঞ্চয় করে এ-চয়নিকাটি নির্মাণ করা হয়েছে।

গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক সবিনয় নিবেদন করেছেন, তিনি এ-চয়নিকার মাধুকরী করার সময় নিজের ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করেননি। তবে কি তিনি বন্ধুবান্ধবদের রুচির উপর নির্ভর করেছেন? তাও নয়। তিনি লিখেছেন, বিখ্যাত প্রখ্যাত কবিরা যে-সব অন্যান্য কবির কবিতার প্রশংসা করেছেন তাই দিয়ে তিনি এ-'সঞ্চয়িতা' নির্মাণ করেছেন। যেমন মনে করুন, বায়রন বলেছেন, 'পেত্রার্কের এ ছত্র কটি কী চমৎকার, কি অনির্বচনীয়!' চয়নিকার সেই কবিতাটি তুলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার বায়রনের প্রশস্তিটিও তুলে দিয়েছেন। ঠিক এই ভাবেই, শেক্‌স্‌পিয়ার আছেন গ্যোটের প্রশংসাসহ, কীট্‌স আছেন শেলির তারিফ যুক্ত, এবং আরো বিস্তর চেনা-অচেনা কবি।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এর চেয়ে আর উত্তম ব্যবস্থা কি হতে পারে?

কিন্তু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এ রকম রদ্দি, ওঁচা কবিতার সঙ্কলন আমি জীবনে কোনো ভাষাতে কখনো দেখিনি।

এবং শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সর্বোত্তম বেশ কয়েকটি কবিতা তাতে বাদ পড়েছে। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, একবার এই বঙ্গভূমিতেই এ-ঘটনা ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতা বাঙালী পাঠকের ভালো লাগে তারই ভোট নিয়ে একখানি 'চয়নিকা' রচিত হয়েছিল। তাতে এত বেশী ভালো কবিতা বাদ পড়ে গিয়েছিল এবং অপেক্ষাকৃত কাঁচা লেখা ঢুকে গিয়েছিল যে এর পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে চয়ন করেন সেটিই 'সঞ্চয়িতা' এবং বাজারে সেইটেই চালু। এস্থলে পাঠক অবশ্য বলবেন, 'রাস্তার লোকের ভোট নিয়ে কি আর উত্তম কবিতা-সঞ্চয়ন হয়? ওদের কীই বা বুদ্ধি, কীই বা রুচি।' অতএব যে বিদেশী চয়নিকা দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম সেইটেতেই ফিরে যাই।

অর্থাৎ ভালো ভালো বাংলা কবি কর্তৃক নির্মিত সঞ্চয়নও উত্তম হল না কেন?

তার প্রধান কারণ, সাধারণ এবং সুরুচিসম্পন্ন পাঠক কবিতা পড়ে কিংবা গান শুনে যদি আনন্দ পায় তবেই সে বলে, কবিতা কিংবা গানটি ভালো। অর্থাৎ তার কাছে যে-কোনো বস্তু রসোত্তীর্ণ হলেই হল। কিন্তু কবি যখন অন্য কবির কবিতা পাঠ করেন তখন তাঁর নজর যায় কবিতার গঠন, ভাষা, ছন্দ, মিল—এক কথায় আঙ্গিকের দিকে। কবিতাটি রচনা করতে গিয়ে কবিতাকার কি কি মালমশলা নিয়ে আরম্ভ করেছেন, তাঁকে কোন কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে, সেগুলো তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন কি না পাঠক-কবির দৃষ্টি থাকে প্রধানতঃ সেই দিকে। কিংবা মনে করুন, আপনি আমি যখন গান শুনি তখন গানটি মিষ্ট এবং মর্মস্পর্শী হলেই হল। পক্ষান্তরে আকছারই দেখবেন, বদখদ গলা নিয়ে, বিদকুটে মান্ধাতার আমলের একটা সম্পূর্ণ অজানা রাগ ধরলে এক হাড়-চিমসে গাওয়াইয়া। তবলচীও বাজাতে লাগলো এমন এক তাল যে তার কোথায় সম, কোথায় ফাঁক কিছুই মালুম হচ্ছে না। আপনি বিরক্তিতে উঠি-উঠি করছিলেন, এমন সময় দেখেন হঠাৎ মহফিলের অন্য গাওয়াইয়া শ্রোতারা 'আহা, আহা, ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ' বলে অচৈতন্যি প্রায়! কি হল? ব্যাপারটা কি? না ওই ওস্তাদস্য ওস্তাদ এক অ্যাসান অতি-অতি-কোমল এমন এক কঠিনস্য কঠিন জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে অ্যাসা এক পানি পথ নাকি জয় করছেন যা পূর্বে নাকি কেউ কখনো করতে পারেনি—না, তানসেন নাকি মাত্র দু'বার পেরেছিলেন, ওস্তাদ আব্দুল করীম কুল্লে এবার। ব্যস হয়ে গেল!

অবশ্য সব পাঠক-কবি কিংবা শ্রোতা-গাওয়াইয়াই যে সুদ্ধমাত্র আঙ্গিক এবং টেক্‌নিকল স্কিলের দিকে এক চোখা দৈত্যের মতো তাকিয়ে থাকেন সে কথা বলছি না—তবে ঐ হল গিয়ে নিয়ম, এবং পূর্বোল্লিখিত 'লিমিট্ অব্ আর্ট' ঐ পর্যায়ের বই।

সমসাময়িক লেখক যখন অন্য লেখকের লেখা পড়েন তখন আরেক মুশকিল। দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা খোলসা করি।

এই মনে করুন, গৌরকিশোর ঘোষ রম্য-রচনা লিখে দেশে নাম করে ফেলেছেন। আমারও বাসনা গেল, ঐ লাইনে যখন খ্যাতি আছে, পয়সাও থাকতে পারে, তখন আমিই বা বাদ যাই কেন? গৌরকিশোরের লেখার অনুকরণে আমিও কয়েকটি রম্য-রচনা লিখে নিয়ে গেলুম তাঁর কাছে। তিনি দেখলেন, তাঁর এক নবীন শাকরেদ্ জুটলো, তাঁর অনুকরণে এবার একটা 'স্কুল' 'ঘরানা' গড়ে উঠতে চললো। আমার রচনা যে আদপেই 'রম্য' হয়নি, এমন কি এরে 'রচনা'ও কওয়া যায় না—সেদিকে তাঁর নজরই গেল না। তিনি সার্টিফিকেট দিলেন, 'তোফা লেখা, খাসা লেখা, বেড়ে লেখা!' আমিও খুশী। অবশ্য এ সার্টিফিকেট আমি এখনো কাজে লাগাইনি। সাহিত্যিকের সার্টিফিকেট হাল-পাঠকের পানি পাবে কিনা সে বাবদে আমার মনে এখনো ধোঁকা রয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে ফরাসী কবি সম্রাট মলিয়ের নাকি তাঁর তাবৎ কৌতুকনাট্য পড়ে

শোনাতেন তাঁর নিরক্ষরা বাড়িউলীকে। বাড়িউলী যে-সব রসিকতা শুনে হাসতো, তিনি সে-সব রসিকতার মাত্রা বাড়িয়ে দিতেন, যেগুলো শুনে গম্ভীর মূর্তি ধারণ করতো সেগুলো তিনি নির্মমভাবে কেটে দিতেন। অথচ আজ এতো গুণীমূর্খ সবাই তাঁর নাট্য দেখে আনন্দ লাভ করে। এই কয়েকদিন মাত্র হল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃত তাঁর বাঙলা অনুবাদ কলকাতার রসিক সমাজকে যা হাসালো তা দেখল স্বয়ং মলিয়েরেই অবাক হতেন।

তবে কি ঐ বাড়িউলী অতিশয় সুরসিকা ছিলেন? এ-পর্যন্ত কেউ তো তা বলেননি। তবে কি ওঁকে না শুনিয়ে সে যুগের নাম করা সমঝদারকে শোনালে মলিয়রের কাব্য আরো রসোত্তীর্ণ হত? বলা অসম্ভব।

* * *

যে নল চালিয়েছিলুম, সে তবে এখন এসে খাড়া হল কোথায়, পাকড়ালো কাকে? অর্থাৎ হরে-দরে দাঁড়ালো কি?

আমার বিশ্বাস এ-নল কোথাও দাঁড়াবে না। এ-আলোচনায় কস্মিন্‌কালেও কোনো হদিস পাওয়া যাবে না।

তবে যদি শোধান, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস কি, তবে আমি নবীন লেখককে অকুণ্ঠ ভাষায় বলবো সার্টিফিকেট কুড়োতে যেয়ো না। ওতে কানাকড়ির লাভ নেই। ঐ যে পাঠক-সম্প্রদায় নামক কিম্ ভূত কিম্ আকার জীব আছে সে যে কখন কার প্রতি সদয়, কার প্রতি নির্দয়, কখন কাকে আশা-গাছের শাখায় চড়ায়, আর কখন কাকে নির্মম ভাবে জিল্‌ট্ করে তার হদিস কেউ কখনো পায়নি।

অবশ্য আপনি যদি ভবিষ্যৎ যুগের পাঠকের জন্য লেখেন তবে আপনার কোনো ভাবনা নেই। তবে সে-কথাটা পুস্তকের অবতরণিকায় বলে দিলেই সাধু আচরণ হয়। এ বছরের তাজা মাছকে আসছে বছরের শুঁটকি বলে চালানোটা জোচ্চুরির শামিল। পঞ্চাশ বছর পরে যে র মাল মেচ্যোর লিক্যোর হবে সেটা আজ বাজারে ছাড়া ধাপ্পা। তার জন্য আজ যে লোক সার্টিফিকেট দেয় সেও ধাপ্পাবাজ।

* * *

হালে আকাশে এ নয়া চিড়িয়ার উদয় হয়েছে।

নিজের সার্টিফিকেট নিজে লিখে কিংবা এবং চেলা-চামুণ্ডাদের সামনে নিজের লেখার গুণকীর্তন করতে গিয়ে পয়েন্ট বাৎলে বিজ্ঞাপন লিখিয়ে নিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের অন্যান্য লেখাতে সে লেখা সম্বন্ধে দারুণ-দারুণ রেফরেনস ঝেড়ে—সব-কিছু প্রকাশককে দিয়ে বিজ্ঞাপনরূপে ছাপিয়ে দেওয়া।

এ সিস্টেমের সঙ্গে 'আধুনিক বাঙলা কবিতা'র বেশ মিল আছে। বাঙলা ভাষায় লেখা দেখে পড়তে গিয়ে মালুম হল যে কিছুই মালুম হচ্ছে না—এ ভাষার শব্দরূপ, ধাতুরূপ কৃৎ তদ্ধিত আপনি কিছুই জানেন না। অর্থাৎ বন্ধু বাঙলা ভাষার

মুখোশ পরে অজানাজন এসে মেরেছে চাক্কু।

প্রকাশকের মুখোশ পরে এখানে আসে লেখক—হাতে চাক্কু। পাঠক, সাবধান!

রবীন্দ্রনাথ কি যেন গেয়েছেন, দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমাকে ডরাবো না? এ তার উল্টো পিঠ; মিত্রের বেশে এসেছে বলে তোমারেই যত ভয়।

এ সিস্টেম পাঠক-ব্যাঙ্কারের চালানো জুয়ো-ভূমি মন্টে কার্লোর ব্যাঙ্ক ভাঙতে পারবে কি না, সেই খবরের প্রত্যাশায় আছি। এ-যাবৎ তো কোনো সিস্টেম পারেনি।

আর যা করুন, করুন কিন্তু পাঠকসাধারণকে আহাম্মুখ ঠাউরে আপন আহাম্মুখির পচা ডিম হাটের মধ্যিখানে ফাটাবেন না!!

খোশগল্প

যখন তখন লোকে বলে, 'গল্প বলো।'

এ বাবদে স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেনের একাধিক রসাল উত্তর আছে। তিনি বাঙাল উচ্চারণে তখন বলতেন, 'ঘর লেপ্যা মুছ্যা, আতুড় ঘর বানাইয়া, মা ষষ্ঠীর গেছে বাচ্যা চাইলেই তো আর বাচ্যা পয়দা হয় না! নয় মাস দশ দিন সময় লাগে।' অর্থাৎ গল্পের সময় এলে তবে গল্প বেরবে।

ইহুদিদের গল্প এর চেয়ে একটু ভালো। কেন, সে-কথা পরে বলছি।

এক ভালো কথক রাব্বী (ইহুদিদের পণ্ডিত পুরুৎ) অনেকখানি হাঁটার পর অতিথি হয়ে উঠেছেন এক পরিচিত চাষার বাড়িতে। চাষা-বৌ জানতো, রাব্বী গল্প বলাতে ভারী ওস্তাদ। পাদ্য-অর্ঘ্য না দিয়েই আরম্ভ করেছে, 'গল্প বলুন, গল্প বলুন।' ইতিমধ্যে চাষা ভিন গাঁয়ের মেলা থেকে ফিরছে একটা ছাগী কিনে। চাষা-বৌ সঙ্গে সঙ্গেই গল্পের বায়না বন্ধ করে দুইতে গেছে ছাগীকে—ইহুদি তো! এক ফোঁটা দুধ বেরল না দেখে চাষা-বৌ বেজার মুখে স্বামীকে শুধালো, 'এ কি ছাগী আনলে গা?' বিচক্ষণ চাষা হেসে বললে, 'ওটা হেঁটে হেঁটে হয়রান হয়ে গিয়েছে। দানাপানি দাও—দুধ ঠিকই দেবে।' রাব্বী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। দানাপানি না পেলে আমিই বা গল্প বলি কি করে?'

ক্ষিতিমোহনবাবু ইহুদি ছিলেন না বলে, নিজের সুবিধেটা উত্তরের মারফতে গুছিয়ে নিতে পারেন নি—ইহুদি পারে।

এ গল্পটা মনে রাখবেন। কাজে লাগবে। অন্তত চা-টা পাঁপড়ভাজাটা আসবে নিশ্চয়ই।

সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি, স্কটম্যান সাইক্‌ল্ চালাতে আরম্ভ করে দেবেন। সে আবার

কি? এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ, অর্থাৎ এক চিন্তার খেই ধরে অন্য চিন্তা, সেটা থেকে আবার অন্য চিন্তা, এই রকম করে করে মোকামে পৌঁছে যাবেন। এখনো বুঝতে পারলেন না? তবে একটা গল্প দিয়েই বোঝাই।

সেই যে বাঁদর ছেলে কিছুতেই শটকে শিখবে না, এ ছেলে তেমনি পেটুক—যা-কিছু শিখতে দেওয়া হয়, পৌঁছে যাবেই যাবে মিষ্টি সন্দেশে। তাকে একং দশং শিখতে দেওয়া হয়েছে। বলছে,

'একং, দশং, শতং, সহস্র, অযুত, লক্ষ্মী, সরস্বতী—'

(মন্তব্য ঃ 'লক্ষ্য' না বলে বলে ফেলেছে 'লক্ষ্মী' এবং তিনি যখন দেবী তখন তাঁর এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ থেকে চলে গেছে আরেক দেবী সরস্বতীতে ঃ তার পর বলছে,)

'লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, অগ্রহায়ণ—'

(মন্তব্য ঃ 'কার্তিক' মাসও বটে, তাই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজে চলে গেল অগ্রহায়ণ পৌষে)

'অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাগ, ছেলে-পিলে—'

(মন্তব্য ঃ 'মাঘ'কে আমরা 'মাগ'ই উচ্চারণ করে থাকি। তার থেকে 'ছেলে-পিলে')

'পিলে, জ্বর, শর্দী, কাশী—'

মন্তব্য ঃ তার থেকে যাবতীয় তীর্থ!—

'কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া, পুরী—'

'পুরী, সন্দেশ, রসগোল্লা, মিহিদানা, বোঁদে, খাজা, লেডিকিনি—'

ব্যাস! পুরী তো খাদ্য এবং ভালো খাদ্য, অতএব তার এসোসিয়েশনে বাদবাকি উত্তম উত্তম আহারাদি! পৌঁছে গেল মোকামে।

এই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ থেকে গল্পের খেই ধরে নেওয়া যায়। ইহুদির কথা যখন উঠেছে তখন ইহুদির কঞ্জুসী, স্কটম্যানের কঞ্জুসী তাবৎ কঞ্জুসীর গল্প আরম্ভ করে দিতে পারেন।

এগুলোকে আবার সাইক্লও বলা হয়। এটা হল কঞ্জুসীর সাইক্ল—অর্থাৎ দুনিয়ার যত হাড়কিপটেমির গল্প এই সাইক্লে ঢুকে যাবে। ঠিক সেইরকম আরো গণ্ডায় গণ্ডায় সাইক্ল আছে। স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর উপর অত্যাচার, স্ত্রীকে লুকিয়ে পরস্ত্রীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি, ট্রেন লেটের সাইক্ল, ডেলি পেসেঞ্জারের সাইক্ল, চালাকির সাইক্ল—

চালাকির সাইক্লকে এদেশে গোপালভাঁড় সাইক্লই বলা হয়—অর্থাৎ চালাকির যে কোনো গল্প আপনি গোপালের নামে চালিয়ে যেতে পারেন, কেউ কিছু বলবে না। ইংরিজিতে এটাকে 'ব্ল্যাঙ্কেট' 'অমনিবাস' গল্পগুষ্টিও বলা চলে।

গোপালের অপজিট নাম্বার অর্থাৎ তাঁরই মত চালাক ছোকরা প্রায় সব দেশেই

আছে। প্রাচীন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির রাজদরবারে ছিলেন মিকশ, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর অধিকাংশ গল্পই সমাজে কঙ্কে পায় না, ভিয়েনার ভাষায় গেজেল-শাফ্‌ট্‌ফেইষ নয় (সমাজে অচল)। সেদিক দিয়েও গোপালের সঙ্গে তাঁর গলাগলি।

কিন্তু এ সংসারে বুদ্ধিমানের চেয়ে আহাম্মুখের সংখ্যাই বেশী, তাই আহাম্মুখীর সাইক্লই পাবেন দুনিয়ার সর্বত্র। অধুনা কেন্দ্রের এক প্রাক্তন মন্ত্রীকে কেন্দ্র করে এক বিরাট সাইক্ল তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। এঁর জুড়ি ভিয়েনাতে গ্রাফ ফন ববে, পশ্চিম ভারতে শেখ চিল্লি (আমার ঠিক মনে নেই, তবে বোধ করি শ্রীযুক্তা সীতা শাস্তার হিন্দুস্থানী উপকথাতে এঁর গল্প আছে), এবং সুইটজারল্যান্ডে পল্‌ডি।

পল্‌ডির গল্প অফুরন্ত। আমি গত দশ বছর ধরে একখানা সুইস পত্রিকার গ্রাহক। প্রতি সপ্তাহে পল্‌ডি নিয়ে একটি ব্যঙ্গচিত্র থাকে। চলেছে তো চলেছে। এখনো তার শেষ নেই। কখনো যে হবে মনে হয় না।

কিছুমাত্র না ভেবে গোটা কয়েক বলি ঃ—

বন্ধু ঃ জানো পল্‌ডি অক্‌সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। ১৭৭০-এ ওটা আবিষ্কৃত হয়।

পল্‌ডি ঃ তার আগে মানুষ বাঁচতো কি করে?

কিংবা

পল্‌ডি ঃ (আমেরিকান টুরিস্টকে এক কাস্‌ল্‌ দেখিয়ে) ঐ ওখানে আমার জন্ম হয়। আপনার জন্ম হয় কোন্‌খানে?

টুরিস্ট ঃ হাসপাতালে।

পলডি ঃ সর্বনাশ! কি হয়েছিল আপনার?

কিংবা

বাড়িউলী ঃ সে কি মিঃ পল্‌ডি? দশ টাকার মনিওর্ডার, আর আপনি দিলেন পাঁচ টাকা বখশিশ!

পল্‌ডি ঃ হেঁ, হেঁ, ঐ তো বোঝো না আর কিপ্টেমি করো। ঘন ঘন আসবে যে!

কিংবা

পল্‌ডি ঘোড়ার রেসে গিয়ে শুধোচ্ছেন ঃ ঘোড়াগুলো এরকম পাগল-পারা ছুটছে কেন?

বন্ধু ঃ কি আশ্চর্য, পল্‌ডি, তাও জানো না! যেটা ফার্স্ট হবে সেটা প্রাইজ পাবে যে।

পল্‌ডি ঃ তাহলে অন্যগুলো ছুটছে কেন?

এর থেকে আপন রেসের গল্পের মাধ্যমে কুট্টি সাইক্লে অনায়াসে চলে যেতে পারেন। যেমন,

কুট্টি রেসে গিয়ে বেট্‌ করেছে এক অতি নিকৃষ্ট ঘোড়া। এসেছে সর্বশেষে। তার

এক বন্ধু—আরেক কুট্টি—ঠাট্টা করে বললে, 'কি ঘোড়া (উচ্চারণ অবশ্য 'গোরা'—আমি বোঝবার সুবিধের জন্য সেগুলো বাদ দিয়েই লিখছি) লাগাইলায় মিয়া! আইলো সকলের পিছনে!'

কুট্টি দমবার পাত্র নয়। বললে, 'কন্ কি কত্তা! দ্যাখলেন না, যেন বাঘের বাচ্চা—বেবাকগুলিরে খ্যাদাইয়া লইয়া গেল!'

কুট্টি সম্প্রদায়ের সঙ্গে পুব-পশ্চিমে উভয় বাঙলার রসিকমণ্ডলীই একদা সুপরিচিত ছিলেন। নবীনদের জানাই, এরা ঢাকা শহরের খানদানী গোষ্ঠী। মোগল সৈন্যবাহিনীর শেষ ঘোড়সওয়ার বা ক্যাভালরি। রিক্শার অভিসম্পাতে এরা অধুনা লুপ্তপ্রায়। বহুদেশ ভ্রমণ করার পর আমি নির্ভয়ে বলতে পারি, অশিক্ষিত জনের ভিতর এদের মত witty (হাজির-জবাব এবং সুরসিক বাক্-চতুর) নাগরিক আমি হিল্লী-দিল্লী কলোন-বুলোন কোথাও দেখিনি।

এই নিন একটি ছোট ঘটনা। প্রথম পশ্চিম বাঙলার 'সংস্করণ'টি দিচ্ছি। এক পয়সার তেল কিনে ঘরে এনে বুড়ি দেখে তাতে একটা মরা মাছি। দোকানীকে গিয়ে অনুযোগ জানাতে সে বললে, 'এক পয়সার তেলে কি তুমি মরা হাতি আশা করেছিলে!' এর রাশান সংস্করণটি আরো একটু কাঁচা। এক কপেকের (প্রায় এক পয়সা) রুটি কিনে এনে ছিঁড়ে দেখে তাতে এক টুকরো ন্যাকড়া। দোকানীকে অনুযোগ করাতে সে বললে, 'এক কপেকের রুটির ভিতর কি তুমি আস্ত একখানা হীরের টুকরো আশা করেছিলে?' এর ইংরিজি 'সংস্করণে' আছে, এক ইংরেজ রমণী এক শিলিঙে এক জোড়া মোজা কিনে এনে বাড়িতে দেখেন তাতে একটি ল্যাডার (অর্থাৎ মই—মোজার একটি টানা সুতো ছিঁড়ে গেলে পড়েনের সুতো একটার পর একটা যেন মইয়ের এক একটা ধাপ-কাঠির মত দেখায় বলে ওর নাম ল্যাডার)। দোকানীকে অনুযোগ জানাতে সে বললে, 'এক শিলিঙের মোজাতে কি আপনি, ম্যাডাম, একখানা রাজকীয় মার্বেল স্টেয়ারকেস্ আশা করেছিলেন!'

এবার সর্বশেষ শুনুন কুট্টি সংস্করণ। সে একখানা ঝুরঝুরে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে পুলিসের এস আই'কে। বর্ষাকালে কুট্টিকে ডেকে নিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন, এখানে জল ঝরছে, ওখানে জল পড়ছে,—জল জল, সর্বত্র জল পড়ছে। পুলিসের লোক বলে কুট্টি সাহস করে কোনো মন্তব্য বা টিপ্পনী কাটতে পারছে না—যদিও প্রতি মুহূর্তেই মাথায় খেলছে বিস্তর। শেষটায় না থাকতে পেরে বেরবার সময় বললে, 'ভাড়া তো দ্যান্ কুল্লে পাঁচটি টাকা। পানি পড়বে না তো কি শরবৎ পড়বে?'

কুট্টি সম্বন্ধে আমি দীর্ঘতর আলোচনা অন্যত্র করেছি—পাঠক সেটি পড়ে দেখতে পারেন। আমার শোক-পরতাপের অন্ত নেই যে, এ সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চললো। আমি জানি এদের উইট্, এদের রিপোর্ট লেখাতে ও ছাপাতে সঠিক প্রকাশ করা যায় না; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ সম্প্রদায় সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ার পূর্বে পুব

বাঙলায় কোনো দরদী জন যদি এদের গল্পগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে তিনি উভয় বাঙলার রসিকমণ্ডলীর ধন্যবাদার্হ হবেন।

* * *

পাঠক ভাববেন না, আমি মিষ্ট মিষ্ট গল্প বলার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা করেছি। আদপেই না। তাহলে আমি অনেক উত্তম উত্তম গল্প পেশ করতুম। এখানে গল্পের সাইক্‌ল্‌ ও এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ, কিংবা বলতে পারেন এসোসিয়েশন অব স্টরিজ বোঝাবার জন্য যে সব গল্পের প্রয়োজন আমি তারই কাঁচা পাকা সব কিছু মিশিয়ে কয়েকটি গল্প নিবেদন করেছি মাত্র। (এবং সত্য বলতে কি আসলে কোনো গল্পই কাঁচা কিংবা পাকা, নিরেস কিংবা সরেস নয়। মোকা-মাফিক জুৎসই করে যদি তাগমাফিক গল্প বলতে পারেন, তবে অত্যন্ত কাঁচা গল্পও শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তহরণ করতে সমর্থ হবে, পক্ষান্তরে তথাকথিত শ্রেষ্ঠ গল্পও যদি হঠাৎ বেমক্কা বলে বসেন, তবে রসিকমণ্ডলী বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকাবেন।)

গল্প বলার আর্ট গল্প লেখার আর্টেরই মত বিধিদত্ত প্রতিভা ও সাধনা সহযোগে শিখতে হয়—এবং দুই আর্টই ভিন্ন। অতি সামান্য, সাধারণ গল্পও পূজনীয় স্বর্গত ক্ষিতিমোহন অতি সুন্দর রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে পারতেন—অথচ তাঁর লেখা রচনায় সে-জিনিসের কোনো আভাসই পাবেন না; পক্ষান্তরে শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রাজশেখরবাবু লিখে গিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটা শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প, অথচ বৈঠক মজলিসে ছিলেন রাসভারী প্রকৃতির। গল্প বলার সময় কেউ কেউ অভিনয়ও যোগ করে থাকেন। সুলেখক অবধূত এ বাবদে একটি পয়লা নম্বরী ওস্তাদ। যদি কখনো তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয় তবে চন্দননগর চুঁচড়ো অঞ্চলের বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক কিভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন তার বর্ণনা দিতে বলবেন। কিন্তু এ প্রবন্ধের গোড়াতে যে সাবধান বাণী দিয়ে আরম্ভ করেছি সেটি ভুলবেন না। বেমক্কা যখন তখন অনুরোধ করেছেন কি মরেছেন। অবধূত তেড়ে আসবে। অবধূত কেন, রসিকজন মাত্রই তেড়ে আসে। এই তো সেদিন অবধূত বলছিল, 'জানেন, মাস কয়েক পূর্বে ১১০ ডিগ্রির গরমে যখন ঘণ্টাতিনেক আইঢাই করার পর সবে চোখে অল্প একটু তন্দ্রা লেগে আসছে এমন সময় পাড়া সচকিত করে টেলিগ্রাফ পিয়ন ঢঙের সজোরে কড়া নাড়া। দরজা খুলতে দেখি দুই অচেনা ভদ্রলোক। কড়া রোদ্দুর, রাস্তার ধুলোমুলোয় জড়িয়ে চেহারা পর্যন্ত ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। কি ব্যাপার?' "আজ্ঞে, আদালতে শুনতে পেলুম, আমাদের মোকদ্দমা উঠতে ঘণ্টাদুয়েক বাকি, তাই আপনার সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করতে এলুম।" আমি অবধূতকে শুধোলুম 'আপনি কি করলেন?' অবধূত উদাস নয়নে ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। 'আমি আর বেশি ঘ্যাঁটালুম না। কারণ মনে পড়ে গেল, মোটামুটি ঐ সময়ে চুঁচড়োর জোড়াঘাটের কাছে, সদর রাস্তার উপর দুটো লাশ পাওয়া যায়। খুনী ফেরার। এখনো

ব্যাপারটার হিল্যে হয়নি।'

ভালো করে গল্প বলতে হলে আরো মেলা জিনিস শিখতে হয়—এবং সেগুলো শেখানো যায় না। আমি স্বয়ং তো আদৌ কোনো প্রকারের গল্প বলতে পারিনে। প্লট ভুলে যাই, কি দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম, কি দিয়ে শেষ করবো তার খেই হারিয়ে ফেলি, গল্প আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই খিল খিল করে হাসতে আরম্ভ করি, 'ঐয্যা কি বলছিলুম' প্রতি দু'সেকেন্ড অন্তর অন্তর আসে, ইতিমধ্যে কেউ হাই তুললে তাকে তেড়ে যাই, শেষটায় সভাস্থ কেউ দয়াপরবশ হয়ে গল্পটা শেষ করে দেন—কারণ যে গল্পটি আমি আরম্ভ করেছিলুম সেটি মজলিসে ইতিপূর্বে, আমারই মুখে, ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে অন্তত পঞ্চাশবার শুনে জোড়া-তাড়া দিয়ে খাড়া করতে পেরেছেন। তদুপরি আমার জিভে ক্রনিক বাত, আমি তোৎলা এবং সামনের দুপাটিতে আটটি দাঁত নেই।

তাহলে শুধোবেন, তবে তুমি এ প্রবন্ধ লিখছ কেন? উত্তর অতি সরল। ফেল করা স্টুডেন্ট ভালো প্রাইভেট ট্যুটর হয়। আমি গল্প বলার আর্টটা শেখার বিস্তর কস্ত করে ফেল মেরেছি বলে এখন এর ট্যুটরি লাইনে আমিই সম্রাট।

* * *

কিন্তু এ আর্ট এখন মৃতপ্রায়; কারণটা বুঝিয়ে বলি।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, গল্পের কাঁচা পাকা কিছুই নেই, মোকা-মাফিক বলতে পারা, এবং বলার ধরনের উপর ঐ জিনিস সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

এ তত্ত্বটি সব চেয়ে ভালো করে জানেন, বিশ্ব-গল্পকথক-সম্প্রদায় (ওয়ার্ল্ড স্টরি-টেলারস্ ফেডারেশন)। মার্কিন মুল্লুকে প্রতি বৎসর এঁদের অধিবেশন হয় এবং পৃথিবীর সর্বকোণ থেকে ডাঙর ডাঙর সদস্যরা সেখানে জমায়েত হন। এঁরা বিলক্ষণ জানেন, গল্প মোকা-মাফিক এবং কায়দা-মাফিক বলতে হয়। চীনের ম্যান্ডারিন সদস্য যে গল্পটি বলতে যাচ্ছেন সেটি হয়তো সবচেয়ে ভালো বলতে পারেন বঙ্গো-ইন-কঙ্গোর সদস্য লুসাবুবু। ওদিকে পৃথিবীর তাবৎ সরেস গল্পই এঁরা জানেন। কি হবে চীনার কাঁচা ভাষায় পাকা দাড়িওয়ালা ঐ গল্প তিনশ তেষট্টি বারের মত শুনে! অতএব এরা একজোটে বসে পৃথিবীর সব কটি সুন্দর সুন্দর গল্প জড়ো করে তাতে নম্বর বসিয়ে দিয়েছেন। যেমন মনে করুন, কুট্টির সেই পানি পড়ার বদলে শরবৎ পড়ার গল্পটার নম্বর ১৯৮।

এখন সে অধিবেশনে গল্প বলার পরিস্থিতিটা কিরূপ?

যেমন মনে করুন, কথার কথা বলছি, সদস্যরা অধিবেশনের গুরু গুরু কর্মভার সমাধান করে ব্যানকুয়েট খেতে বসেছেন। 'ব্যানকুয়েট' বললুম বটে, আসলে অতি সস্তা লাঞ্চ—'লাঞ্চনা'ও বলতে পারেন, একদম দা'ঠাকুরের পাইস হোটেল মেলের। এক মেম্বর ডালে পেলেন মরা মাছি। অমনি তাঁর মনে পড়ে গেল 'সেই বুড়ির এক

পয়সার তেলে মরা মাছি,' কিংবা 'পানি না পড়ে শরবৎ পড়বে নাকি' গল্প। তিনি তখন গল্পটি না বলে শুধু গম্ভীরকণ্ঠে বললেন নম্বর '১৯৮'!

সঙ্গে সঙ্গেই হো হো অট্টহাস্য। একজন হাসতে হাসতে কাৎ হয়ে পাশের জনের পাঁজরে খোঁচা দিয়ে বার বার বলছেন, 'শুনলে? শুনলে? কি রকম একখানা খাসা গল্প ছাড়লে!' আরেকজনের পেটে খিল ধরে গিয়েছে—তাকে মাসাজ করতে শুরু করেছেন আরেক সদস্য।

* * *

অতএব নিবেদন, এসব গল্প শিখে আর লাভ কি? এদেশেও কালে বিশ্ব-গল্পকথক-সম্প্রদায়ের ব্রাঞ্চ-আপিস বসবে, সব গল্পের কপালে কপালে নম্বর পড়বে, আপনি আমি কোনো-কিছু বলার পূর্বেই কেউ না কেউ নম্বর হেঁকে যাবে। তারপর নীলাম। ১৯৮ নম্বর বলতে না বলতেই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজে কারো মনে পড়ে যাবে অন্য গল্প—তিনি হাঁকবেন ২৭২। তারপর ৩১৮—আর সঙ্গে সঙ্গে হাসির হররা, রগড়ের গড়িয়াহাট—আপনি আমি তখন কোথায়?

হ্যাঁ, অবশ্য যতদিন না ব্রাঞ্চ-আপিস কায়েম হয় ততদিন অবশ্য এইসব টুটা-ফুটা গল্প দিয়ে ত্রি-লেগেড রেস রান করতে পারেন। কিংবা দুষ্ট ছেলেকে শাসন করার জন্য গুরুমশাই যে রকম বলতেন, 'যতক্ষণ বেত না আসে ততক্ষণ কানমলা চলুক।'

বাই দি উয়ে—এ গল্পটাও কাজে লাগে। নেমন্তন্ন-বাড়িতে চপ কটলেট না আসা পর্যন্ত লুচি দিয়ে ছোলার ডাল খেতে খেতে বলতে পারেন, 'যতক্ষণ বেত না আসে ততক্ষণ কানমলা চলুক।'

নিরলঙ্কার

একটি লোকের কাছে আমি নানা দিক দিয়ে কৃতজ্ঞ ছিলুম। মাসাধিক কাল আমি যখন টাইফয়েডে অজ্ঞান, সে তখন আমার সেবা করে বাঁচিয়ে তোলে। ভালো করেছে, কি মন্দ করেছে, সে অবশ্য অন্য কথা। আর শুধু আমিই না, আমাদের পার্কসার্কাস পাড়ার বিস্তর লোক তার কাছে নানান দিক দিয়ে ঋণী। মাঝারি রকমের পাস টাস দিয়েছে—পরীক্ষার ঠিক আগে তার জোর চাহিদা। বেশ দু'পয়সা কামায়—ধার চাইতে হলে ও-ই ফার্স্ট চইস। আর বললুম তো, রুগীর সেবায় ঝানু নার্সকে হার মানায়।

তার যে কেন হঠাৎ শখ গেল সাহিত্যিক হবার বোঝা কঠিন!

একটা ফার্স লিখেছে। তার বিষয়বস্তু ঃ ধনী ব্যবসায়ী তাঁর ম্যানেজারের উপর ভার দিয়েছেন, কলেজ-পাস মেয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে ইন্টারভ্যু নিয়ে বর বাছাই করতে। নাটকের আরম্ভ ইন্টারভ্যু দিয়ে। কেউ কবি, কেউ গবিতা লিখে গবি, কেউ ফিলিম স্টার—আরো কত কি।

পড়ে আমার কান্না পেল। দুই কারণে। অত্যন্ত প্রিয়জনের নিষ্ফল প্রচেষ্টা দেখলে যে রকম কান্না পায়, এবং দ্বিতীয়ত ঐ কথাটি ওকে বলি কি প্রকারে? ওটা কিছুই হয়নি, ওকে বলতে গেলে আমার মাথা কাটা যাবে। শেষটায় মাথা নিচু করে, ঘাড় চুলকে বললুম, 'বুঝলে, মামা, আমি ফার্স-টার্স বিশেষ পড়িনি, দেখিনি আদপেই, অথচ এসব জিনিস স্টেজে দেখার এবং শোনার।'

মামা সদানন্দ পুরুষ। একগাল হেসে বললে, 'যা বলেছিস। আমিও তাই ভাবছিলুম।'

সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

ওমা, কোথায় কি! হঠাৎ পাড়ার চায়ের দোকানে শুনি মামার ফার্স ট্যাংরা না বেনেপুকুরে কোথায় যেন রিহার্সেল হচ্ছে। সর্বনাশ! বলি, 'ও চাটুয্যে, এখন উপায়?'

সোমেন যদিও নিকষ্যি, তবু কথা কয় কলকাতার খাস বাসিন্দা বনেদি সোনার বেনেদের মত। অর্থাৎ আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারে 'হুতোম' 'আলাল'কে আড়াই লেন্‌থ্ পিছনে ফেলে। দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত বের করে বললে, 'উপায় নদারদ্। দেখি নসিবে কি কি গর্দিশ আছে?'

তারপর মামা একদিন ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে ফার্স-অভিনয়ের লগ্ন রাঁদেভু বাৎলে গেলেন। ট্যাংরা গোবরায় নয়। রাজাবাজারের কোন এক গলির ভিতরে।

চাটুয্যের বাড়ি মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটে। ওখানে কখনো যাইনি। ভাবলুম সেদিন ওখানেই আশ্রয় নেব। মামা সময় পেলেও আমাকে খুঁজে পাবে না।

চাটুয্যে তো আমাকে দেখে অবাক। ব্যাপার শুনে বললে, 'তা আপনি চা পাঁপড় খান আমাকে তো যেতেই হবে।' চাটুয্যে চাণক্যের সেই আইডিয়াল বান্ধব—রাজদ্বারে শ্মশানে ইত্যাদি। আর এটা যে মামার ফ্যুন্‌রেল্ সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দ ছিল না।

ঘণ্টা দুই দাঁত কিড়িমিড়ি দিয়ে বার বার রাজাবাজারের দৃশ্যটা মনশ্চক্ষু থেকে তাড়াবার চেষ্টা করলুম। কিছুতেই কিছু হল না। কোথাকার কে এক কবি বলেছে, সদ্য লাঞ্ছিত জন যে রকম বার বার চেষ্টা করেও অপমানের কটুবাক্য মন থেকে সরাতে পারে না।

এমন সময় চাটুয্যে এক ঢাউস প্রাইভিট গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। তার সর্বাঙ্গ থেকে উত্তেজনা ঠিকরে পড়ছে। মুখে শুধু 'এলাহি ব্যাপার, পেল্লায় কাণ্ড।' বুঝলুম, মামাকে উদ্ধারের সৎকার্যে, কিংবা নিমতলার সৎকারে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু চাটুয্যে

ঢাউস গাড়ি পেল কোথায়—পায় তো কুল্লে পঞ্চাশ টাকা, খাদি প্রতিষ্ঠানে।

গলির বাইরে থেকে শুনতে পেলুম তুমুল অট্টরব। বুঝলুম, গর্দিশ পেল্লায়।

ওমা, এ কি? কোথায় না দেখব, মামা লিন্‌চ্‌ট্‌ হচ্ছে—দেখি হাজার দুই লোক হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে, হেথা হোথা কেউ কেউ পেটে খিল ধরেছে বলে ডান দিকে চেপে ধরে কাতরাচ্ছে, আরেক দঙ্গল লোক হাসতে হাসতে মুখ বিকৃত করে কাঁদছে। সে এক ম্যাস্‌ হিস্টিরিয়ার হাসির শেয়ার-বাজার কিংবা এবং রেসের মাঠ। ইস্তেক চাটুয্যে হেঁড়ে গলায় চেঁচাচ্ছে, 'চাক্কু মারছে, চাক্কু মাইরা দিচ্ছে।'

ইতিমধ্যে ফার্স শেষ হয়েছে। মামাকে স্টেজে দাঁড় করানো হয়েছে। মামা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'এ সম্মান সম্পূর্ণ আমার প্রাপ্য নয়। বস্তুত সবটাই পাবেন, সুসাহিত্যিক আকাদেমি কর্তৃক সম্মানিত শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রশঙ্কর সান্যাল। একমাত্র তাঁরই পরামর্শে আমি এটা স্টেজ করি। পাড়ার আর সবাই বলেছিল, এটা সাপ ব্যাঙ, কিছুই হয়নি।'

বুঝতেই পারছেন, আমার নাম গজা সান্যাল। তখন আরেক ধুন্দুমার। আমার গলা জিরাফের মত হলেও অত মালার স্থান হত না। নিতান্ত রঙ্গদর্শী গৌরকিশোর সেখানে সেদিন উপস্থিতবুদ্ধি খাটিয়ে আমাকে সময়মত না সরালে, বঙ্গীয় পাঠক-মণ্ডলী মল্লিখিত 'কলকাতার কাছেই কবির মহাপ্রস্থান' বই থেকে বঞ্চিত হত।

বাড়ি ফেরার পরও আমার মাথা তাজ্জিম-মাজ্জিম করছিল। নল ছেড়ে তলায় মাথা রেখে মনে মনে বললুম, 'অয়ি বাগেশ্বরী, তোমার সৃষ্টিরহস্য আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো তো। মামার ঐ ফার্স পড়ে এ-পাড়ার সক্কলের তো কান্না পেয়েছিল। তবে কি এ-পাড়ার মেধো ও পাড়ার মধুসূদন?'

বিস্তর অলঙ্কার শাস্ত্র পড়ে আমার মনে একটা আত্মম্ভরিতা হয়েছিল, আমি বলতে পারি কোন রচনা রসোত্তীর্ণ হয়েছে, কোনটা হয়নি। এখন দেখি ভুল।

ভামহ, বামন, ক্রোচে, বের্গসোঁ, তাহা হোসেন, আবু সঈদ্‌ অইয়ুব সবাইকে পরের দিন বস্তা বেঁধে শিশি-বোতলওলার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলুম।

আমি জানি, আমার পাঠকমণ্ডলী অসহিষ্ণু হয়ে বলবেন, 'তোমার যেমন বুদ্ধি! পার্ক সার্কাসের রদ্দি বই পেল রাজাবাজারে সম্মান। আর তুমি তাই করলে বামন ভামহকে প্রত্যাখ্যান! জৈসন্‌কে তৈসন্‌ শুঁটকিসে বৈগন—যার সঙ্গে যার মেলে—শুঁটকির সঙ্গে বেগুনই তো চলে। রাজাবাজার পার্কসার্কাসে গলাগলি হবে না?

কথাটা ঠিক। ফার্সীতেও বলে,

স্বজাতির সনে স্বজাতি উড়িবে মিলিত হয়ে
পায়রার সাথে পায়রা শিকরে শিকরে লয়ে!
The same with same shall take its flight,
The dove with dove and kite with kite.

কুনদ্ হম্ জিন্‌স্ ব্ হম্-জিন্‌স্ পরওয়াজ
কবুতর্ ব্ কবুতর্ বাজ্ ব্ বাজ্।

এসব অতিশয় খাঁটি কথা। কিন্তু প্রশ্ন, শেক্‌স্‌পিয়ার মলিয়ের জনসাধারণের—রাজা-উজির গুণীজ্ঞানীর কথা হচ্ছে না—চিত্ত জয় করেছিলেন যে রস দিয়ে সেটি কি খুব উচ্চাঙ্গের রস? মাঝে মাঝে তো রীতিমত অশ্লীল। এবং শেক্‌স্‌পিয়ার যে আজও খাতির পাচ্ছেন তার কারণ জনসাধারণ তিনশ' বছর ওঁর নাটক দেখতে চেয়ে চেয়ে ওগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছিল বলে। শুধুমাত্র গুণীজ্ঞানীর কদর পেলে ওঁর নাট্য আজ পাওয়া যেত লাইব্রেরি টপ শেলফে—সেটা উচ্চাসন হলেও অপ্রয়োজনীয় বই-ই রাখা হয় সেখানে।

আরেকটা উদাহরণ দি ঃ ওস্তাদ মরহুম ফৈয়াজ খানের শিষ্য শ্রীমান সন্তোষ রায়ের কাছে শোনা। রাস্তায় এক ভিখিরির গাঁইয়া গান শুনে ফৈয়াজ তাকে আদরযত্ন করে বাড়ি নিয়ে গিয়ে, তার সেই গাঁইয়া গানের এক অংশ শিখে নিয়ে, তাকে 'গুরুদক্ষিণা' দিয়ে বিদায় দিলেন। কয়েক দিন পরে সেই টুকরোটি তাঁর অতিশয় উচ্চাঙ্গ ওস্তাদী গানে বেমালুম জুড়ে দিয়ে বড় বড় ওস্তাদের কাছে শাবাশী পেলেন—এরকম ভয়ঙ্কর অরিজিনাল অলঙ্কার কেউ কখনো শোনেনি!

আরেকটি নিবেদন করি ঃ মেজর জেনরল শ্লীমান গেল শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক রাত্রি কাটান দিল্লী থেকে মাইল দশেক দূরের এক গ্রামে। রাত্রে শোনেন ইঁদারা থেকে বলদ দিয়ে জল তোলার সময় এক চাষা অন্য চাষাকে মিষ্টি টানা সুরে 'হুঁশিয়ার', 'খবরদার', 'সবুর' বলছে। পরদিন সে কথা এক ভারতীয় কর্মচারীর সামনে উল্লেখ করাতে সে বলল, 'তানসেন মাঝে মাঝে এখানে এসে এসব সুর শিখে নিয়ে আপন সৃষ্টিতে জুড়ে দিতেন।'

মামার ফার্সটা চেয়ে নিয়ে আবার নূতন করে পড়লুম। নাঃ! আমি ফৈয়াজ নই তানসেনও নই। এর কোনো বস্তুই আমার কোনো কাজে লাগে না। মামাকে দোষ দেওয়া বৃথা।

সমস্তটা ডাহা অন্‌রিয়েল, কোনো প্রকারের বাস্তবতা নেই কোনোখানে।

তখন মনে পড়লো ওস্কার ওয়াইল্ডের একটি গল্প। তিনি সেটি তাঁর সখা এবং শিষ্য আঁদ্রে জিদ্‌কে বলেছিলেন। তিনি সেটি ওয়াইল্‌ড সম্বন্ধে লেখা তাঁর 'ইন মেমোরিয়াম (সুভ্‌নীর)' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। নিজের ভাষায় গল্পটা বলি—ও বই পাই কোথায়?'

গ্রামের চাষাভুষোরা এক কবিকে খাওয়াতো পরাতো। কবির একমাত্র কাজ ছিল সন্ধ্যের পর আড্ডাতে বসে গল্প বলা। চাষারা শুধতো, 'কবি আজ কি দেখলে?' আর কবি সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাতো। রোজ একই প্রশ্ন। একদিন যখন ঐ শুধোলে, তখন কবি বললে, 'আজ যা দেখেছি তা অপূর্ব। ঐ পাশের বনটাতে গিয়েছিলুম বেড়াতে।

বেজায় গরম। গাছতলায় যখন জিরোচ্ছি তখন, ওমা কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ দেখি, একটা গাছের ফোকর থেকে বেরিয়ে এল এক পরী। তারপর আরেকটি, তারপর আরেকটি, ক'রে ক'রে সাতটি। আর সর্বশেষে বেরুলেন রানী। মাথায় হীরের ফুলে তৈরি মুকুট, পাখনা দুটি চরকা-কাটা বুড়ির সুতো দিয়ে তৈরী। হাতে সোনার বাঁশী। তারপর নাচতে নাচতে তারা এগিয়ে চলল সাগরের দিকে। আমিও ঘাপটি মেরে পিছনে পিছনে। সেখানে গিয়ে এরা গান গেয়ে বাঁশী বাজিয়ে কাদের যেন ডাকলে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল সাত সমুদ্র কন্যা। সবুজ তাদের চুল তাই আঁচড়াচ্ছে সোনার চিরুনি দিয়ে। সন্ধ্যা অবধি, ভাই, তাদের গান শুনলুম, নাচ দেখলুম—তারপর তারা চাঁদের আলোয় মিলিয়ে গেল।'

সবাই বললে, 'তোফা, খাসা, বেড়ে।'

কবি রোজই এরকম গল্প বলে।

একদিন হয়েছে কি, কবি গিয়েছে ঐ বনে, আর সত্য সত্যই একটা গাছের ফোকর থেকে বেরলো সাতটি পরী, তারা নাচতে নাচতে গেল সমুদ্রপারে, সেখানে জল থেকে বেরিয়ে এল সমুদ্রকন্যা। কবি একদৃষ্টে দেখলে।

সেদিন সন্ধ্যায় চাষারা নিত্যিকার মতো শুধোলে, 'কবি আজ কি দেখলে, বলো?'

কবি গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'কিচ্ছু দেখিনি।'

অর্থ সরল। যে বস্তু মৃন্ময় রূপে চোখের সামনে ধরা দিল, সেটাকে নিয়ে কবি করবে কি? কবির ভুবন তো চিন্ময় কল্পনার রাজ্য। বাস্তবে যে জিনিস দেখা হয়ে গেল তার ঠাঁই কল্পনা রাজ্যে, কাব্যের জগতে আর কোথায়? চার চক্ষু মিলনের পর বধূকে তো আর কল্পনা-কল্পনায় তিলোত্তমা বানিয়ে বেহশ্‌তের হুরী-পরীর শামিল করা যায় না।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে ওয়াইল্‌ডের আরেকটি ফরিয়াদ, সৃষ্টিতে আছে শুধু একঘেয়েমি। প্রকৃতি বিস্তর মেহন্নৎ করে যদি একটি ফুল ফোটায় (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে/ধরণীর তলে ফুটিয়াছে এ মাধবী/) তবে বার বার তারই পুনরাবৃত্তি করে, অপিচ কবির সৃষ্টি নিরঙ্কুশ একক সৃষ্টিকর্তারই মত একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক জিনিস সে দু'বার করে না, অন্যের নকল তো করেই না, নিজেরও কার্বনকপি হতে চায় না।

ওয়াইল্‌ডের বহুপূর্বে জর্মন কবি শিলার বলেছিলেন, 'প্রকৃতি প্রবেশ করা মাত্র কবি অন্তর্ধান করেন।'

আর রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে কি বলেছেন, সেকথা অন্যত্র বলার সুযোগ আমার হয়েছে। পুনরাবৃত্তির ভয়ে বাধ্য হয়ে বর্জন করে বলছি, তিনি প্রকৃতির সওগাৎ কদম ফুল দেখে বলেছেন, ওটা ঋতুস্থায়ী আর আমার সৃষ্টি অজরামর,

আজ এনে দিলে হয়তো দেবে না কাল
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল
এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে
তব বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী
বহি তব সম্মান।

এ আবার কি রকমের সম্মান হল!

প্রকৃতিকে সব কবি হেনস্তা করার বর্ণনা দেবার পর, আবার ক্ষণতরে ওয়াইল্‌ডে ফিরে যাই।

আচ্ছা, মনে করুন ওয়াইল্‌ডের সেই গ্রাম্য কবি যদি চাষাদের একদিন বলতো, 'আজ ভাই, আবার সেই বনে গিয়েছিলুম। দেখি গাছতলায় বসে এক পথিক তার সঙ্গীকে বলছে, সে তার পুরনো চাকরকে নিয়ে তীর্থ করতে যায়, সেখানে চাকরটা মারা যায়; তাই নিয়ে সে বিস্তর আপস-আপসি করছিল।'

চাষারা নিশ্চয় ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতো, 'এতে আবার বলার মত কি আছে—এ আকছারই হচ্ছে।'

কিন্তু মনে করুন, তখন যদি কবি 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি আবৃত্তি করতো? বিষয়বস্তু উভয় ক্ষেত্রে একই।

কবিতাটিতে যে অতি উত্তম রসসৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে এ যাবৎ কেউ কখনো সন্দেহ করেনি।

অথচ ওয়াইল্‌ড বর্ণিত কবির 'পরী-সিন্ধুবালা' অবাস্তব, 'পুরাতন ভৃত্য'র বিষয়বস্তু অতিশয় বাস্তব। 'পুরাতন ভৃত্য' মনে না ধরলে 'দেবতার গ্রাস' নিন। সেটা তো অতিশয় বাস্তব—আইন করে বন্ধ করতে হয়েছিল, পরীর নাচ বন্ধ করবার জন্য আইন তৈরী হয় না।

তা হলে দাঁড়ালো এই, বাস্তব হোক, কাল্পনিক হোক—প্রাকৃত হোক, অতিপ্রাকৃত হোক—যে-কোনো বিষয়বস্তু রসোত্তীর্ণ হতে পারে যদি—

এইখানেই আলঙ্কারিকদের ওয়াটারলু। কি সে জিনিস, কি সে যাদুর কাঠি, কি সে ভানুমতী মন্ত্র যার পরশ পেয়ে পুরাতন ভৃত্য আর বনের পরী কাব্য রসাঙ্গনে একই তালে, একই লয়ে চটুল নৃত্য আরম্ভ করে? কিংবা বাস্তবে না নেচেও কাব্যেতে নাচা হয়ে যায়? যথা—

জোন বললে,—'চ্যাটার্জি, এই আনন্দের দিনে তুমি অমন প্লাম হয়ে বসে থেকো না, আমাদের নাচে যোগ দাও।'

বললুম,—'মাদার লক্ষ্মী, আমার কোমরে বাত। নাচতে কবিরাজের বারণ আছে।'

(শুনুন কথা! পৃথিবীর উপরে—হাউ অন্ আর্থ—কবিরাজ কি করে কল্পনা করতে পারে যে, ষাট বছরের বুড়ো গাঁইয়া চাটুয্যের বলড্যান্সের অভাস আছে; আগে-ভাগে বারণ করে দিতে হবে!)

'ভানুমতী' বলে ভালোই করেছি। ম্যাজিকের জোরেই শরৎকালে আম ফলানো যায়। দীপক গেয়ে আগুন ধরানো যায়, মল্লার গেয়ে বৃষ্টি নামানো যায়। কিন্তু সত্য সঙ্গীতজ্ঞ নাকি তাতে কণামাত্র বিচলিত না হয়ে বলেন, 'এর চেয়ে ঢের বেশী সার্থক হবে সঙ্গীত যদি সদ্য-বিধবাকে সান্ত্বনা দিতে পারে, স্বাধিকারপ্রমত্তকে শান্ত করতে পারে।[১] এবং কিছু না করেও যে সার্থক সঙ্গীত হতে পারে সে তো জানা কথা।

আর্টে এই ম্যাজিক জিনিসটির সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঃ—

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি,
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর
সাতটি যেন পোষা পাখি।
শাণিত তরবারি গলাটি যেন,
নাচিয়া ফিরে দশদিকে,
কখন কোথা যায় না পাই দিশা,
বিজুলি হেন ঝিকিমিকে।
আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল
আপনি কাটি দেয় তাহা।
সভার লোকে শুনে অবাক মানে,
সঘনে বলে, বাহা বাহা।।

---

১. ধর্মজগতেও এই ম্যাজিকের বড় সম্মান। সাধু সম্বন্ধে যদি গ্রামে রটে তিনি লোহাকে সোনা করতে পারেন, তবে এবিষয়ে নির্লোভজনও তার কাছে ধর্মোপদেশ চায়—যেন যে ম্যাজিক দেখায়, সে বুঝি ধর্মও বোঝে। রাজা রামমোহনের সঙ্গে খৃষ্টানদের ঐ নিয়ে বেধেছিল। তিনি খৃষ্টের অলৌকিক কর্মে (জলকে মদে পরিবর্তন করা ইত্যাদি) বিশ্বাস করতেন না। মুসলমানদের ভিতর দুই দল আছেন। একদল বলেন, হজরৎ মুহম্মদ অলৌকিক কর্ম দেখাতে রাজী হতেন না; বলতেন, 'আমি যা বলেছি সেইটা সত্য না মিথ্যা যাচাই করে নাও।' কোনো এক সাধু নাকি ত্রিশ বৎসর সাধনার পর পায়ে হেঁটে নদী পেরোতে পারতেন। তাই শুনে কবীর বলেছিলেন, 'এক পয়সা দিয়ে যখন খেয়া পার হওয়া যায়, তখন ঐ মুর্খের ত্রিশ বৎসরের সাধনার দাম তো এক পয়সা।'

রস বিচারেও বলা যেতে পারে, একটি কাঠি দিয়েই যখন সব কটা প্রদীপ জ্বালানো যায়, তখন ওর জন্যে সঙ্গীতে ত্রিশ বৎসর সাধনা করার কি প্রয়োজন?

এখানে বিশেষ করে লক্ষ্য করবার জিনিস, সভার লোকে 'বাহা বাহা' বলছে কেউ কিন্তু 'আহা আহা' বলেনি।

পার্থক্যটা কোথায়?

দড়ির উপর নাচ দেখে বলি 'বাঃ', যাদুকর যখন চিরিতনের টেক্কাকে ইস্কাপনের দুরি বানায় তখন বলি 'বা রে—', কাশীনাথ যখন গানের টেকনিকাল স্কিল (ম্যাজিক) দেখায় তখন বলি, 'বাঃ', কিন্তু যখন কবি গান,

'তোমার চরণে আমার পরানে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি—'

তখন মনে হয়, যেন আমারই বিরহতপ্ত শ্রান্ত ভালে প্রিয়া তাঁর আপন্ কণ্ঠের যুথীরমালে আমার সব দহনদাহ ঘুচিয়ে দিলেন। চরম পরিতৃপ্তিতে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে বেরিয়ে আসে, 'আ—আ—হ্।'

আশ্চর্য হলে বলি 'বাঃ' পরিতৃপ্ত হলে বলি 'আহ্'। ম্যাজিকে 'বাব্বা-বাব্বা', আর্টে 'আহাহা'!

'হাঁ'-কে 'না'-করা, 'না'-কে 'হাঁ'-করা কঠিন নয়, কিন্তু উভয়কে মধুরতর করাই আর্ট, সেইটি কঠিন, ঐটেই আলঙ্কারিকদের ওয়াটারলু। এবং সবচেয়ে কঠিন, মধুরকে মধুরতর করা। ফুল তো সুন্দর তাকে সুন্দরতর করা যায় কি করে? স্বয়ং খৃষ্ট বলেছেন, 'লিলিফুলকে তুলি দিয়ে রং মাখায় কে?'

অথচ জাপানী শ্রমণ রিয়োকোয়ান রচলেন—

কি মধুর দেখি রেশমের গাছে
ফুটিয়াছে ফুলগুলি
কোমল পেলব করিল তাদের
ভোরের কুয়াশা তুলি।

কি সে ভোরের কুয়াশা তুলি যা সব-কিছুকে মধুর মেদুর, কোমল পেলব করে দেয়?

দৃষ্টান্ত দেই ঃ—

প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে পবন আসিয়া আমাকে দোদুল্যমান করাতে আমি মুগ্ধ হইয়া 'আ মরি, আ মরি' বলিতেছি—

কবির তুলির পরশ পেয়ে হয়ে যায় ঃ 'পূব হাওয়াতে দেয় দোলা মরি মরি'—

আমি বললুম, সব বনে ছায়া ক্রমে ক্রমে ঘন হইতে ঘনতর হইতেছে—

কবির তুলি লাগাতে হল, 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে'।

কিংবা আমি বললুম, শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী রাত্রে পথ দিয়া যাইবার সময় যখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে, তখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাহাকে কি শুভলগ্ন বলিব, জানি না।

'যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে
চাঁদ উঠেছিল গগনে।
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে
কী জানি কী মহা লগনে।'

পাঠক হয়তো বলবেন, 'তুমি বলেছ গদ্যে—সে যেন পায়ে চলা; আর কবি বলেছেন ছন্দে—সে যেন নাচা।'

উত্তম প্রস্তাব। ছন্দে বলি,

পথিমধ্যে তোমার সঙ্গে
পূর্ণিমাতে দেখা
বলবো একে মহা লগন
ছিল ভালে লেখা।

আর নিখুঁত, নিটোল ছন্দ মিল হলেই যদি কবিতা হয় তবে নিচের কবিতাটির নোবেল প্রাইজ পাওয়ার কথা ঃ—

হর প্রতি প্রিয় ভাষে কন হৈমবতী
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি!
কোন গ্রহ রাজা হৈল কেবা মন্ত্রিবর
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ দিগম্বর!

অলঙ্কারের দিক দিয়ে কবিতাটি দিগম্বরই বটে।

এই যে তুলি সব-কিছু মধুময় করে তোলে, কি দিয়ে এ বস্তু তৈরী, কি করে এর ব্যবহার শিখতে হয়? এ কি সম্পূর্ণ বিধিদত্ত না পরিশ্রম করে এর খানিকটে আয়ত্ত করা যায়?

ঘটিতে টোল দেখলে চট করে টের পাই, কিন্তু নিটোল ঘটি বানাই কি করে?

আর এই তো সেই তুলি সে যখন আপন মনে চলে তখন সে গীতিকাব্য—লিরিক 'মেঘদূত'। যখন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, চরিত্রের ক্রমবিকাশের উপর এর ছোঁয়া লাগে সে তখন কাব্য—'রঘুবংশ'। যখন ধর্মকে ছুঁয়ে যায় সে তখন 'গীতা', 'কুরান', 'বাইবেল'।

সম্পাদক লেখক পাঠক

শ্রীযুক্ত জলসা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়,

সচরাচর আমি পাঠকদের জন্যই আপনার কাগজে লিখে থাকি (এবং আপনার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, যে প্রতি সংখ্যায়ই কিছু লেখা দেব)। অবশ্য আপনার পড়ার জন্য নয়। কারণ আমি নিন্দুকের মুখে শুনেছি সম্পাদকেরা এত ঝামেলার ভিতর পত্রিকা প্রকাশ করেন যে তারপর প্রবন্ধগুলো পড়ার মত মুখে আর তাঁদের লালা থাকে না। কথাটা হয়তো একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ যেদিন আমি

তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লঙ্কা লয়ে সযতনে
উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিড়ম্বিত
প্রপঞ্চ ফোঁড়ন লয়ে

রন্ধন কর্ম সমাধান করি সেদিন আমারও ক্ষিদে সম্পূর্ণ লোপ পায়। কাজেই আপনার বিরুদ্ধে যে প্রিমা ফাসি কেস্ একেবারেই নেই, সে কথা বলতে পারবেন না। অন্তত আমার লেখা যে আপনি একেবারেই পড়েন না, সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চয়—কারণ পড়া থাকলে দ্বিতীয় বারের জন্য লেখা চাইতেন না। ন্যাড়া একাধিক বার যেতে পারে বেলতলা—নিমতলা কিন্তু যায় একবারই।

ইতিমধ্যে আমি কথা দিয়েও কথা রাখতে পারিনি। অথচ দোষটা পড়েছে নিশ্চয়ই আপনার ঘাড়ে। বাঙলাতে বলে

খেলেন দই রমাকান্ত
বিকারের বেলা গোবদ্দন!

অর্থাৎ জবান খেলাপ করলুম আমি, বিকারটা হল আপনার।

'অয়, অয় জানতি পারো না'—আকছারই হয়। তার কারণটাও সরল। যে দোষ আপনি করেছেন, তার গালমন্দ আপনিই খাবেন, এ তো হক্ কথা, এ তো আপনার ন্যায্য প্রাপ্য। তাই তাতে আপনার ক্ষোভ থাকাটা অশোভন, কিন্তু সংসারটা তো ন্যায়ের উপর চলে না, সে কথা তো আপনি বিলক্ষণ জানেন—তাই মাঝে মাঝে অন্যায় অপবাদও সইতে হয়। আপনারই কাগজে দেখলুম এক পাঠক আপনাদের টাইট দিয়েছেন, রাবিশ লেখা ছাপেন কেন? উত্তরদাতা বেচারী মুখ শুকনো করে (আমি হরফগুলোর মারফতেই তাঁর চেহারাটি স্পষ্ট দেখতে পেলুম) বলছেন, 'নাচার, নাচার, স্যর! নামকরা লেখক। অনুরোধ জানিয়েছিলুম, একটি লেখা দিতে—অজানা জনকে তো আর অনুরোধ করতে পারিনে, বৃষ্টিতে ভেজার ভয়ে পুকুরে তো আর

ডুব মারতে পারিনে—তারপর এসে উপস্থিত এই খাজা মাল। না ছাপিয়ে করি কি?'

বিলকুল সচ্চী বাৎ (আপনার কাগজে হিন্দী উর্দুশব্দের বগ্‌হার দিতে আমার বাধে না, কারণ আপনার পাঠক সম্প্রদায় পাইকিরি দরে হিন্দী ফিলিম দেখে দেখে হিন্দী বুঝতে পারেন)! কারণ ফ্রান্স জর্মনিতেও বলে, বরঞ্চ রদ্দি মাল খেয়ে পেটের অসুখ করবো, তবু শা—হোটেলওলাকে ফেরৎ দেব না, পয়সা যখন দিতেই হবে—পাছে অন্য খদ্দেরকে বিক্রী করে ডবল পয়সা কামায়!' অতএব আমার মতে ছাপিয়ে দেওয়াটাই সুবুদ্ধিমানের কর্ম।

এ হেন অবস্থায় একটা মাস যে মিস্ গেছে, সেটা কি খুব খারাপ হল? বুঝলেন না? তা হলে একটি সত্যি ঘটনা বলি ঃ

ফিল্মাকাশের পূর্ণচন্দ্র শ্রীযুক্ত দেবকী বসু আমার বন্ধু। দিল্লীতে যখন তাঁর 'রত্নদীপে'র হিন্দী কার্বন কপি দেখানো হয়, তখন দিল্লীর ফিল্ম সম্প্রদায় তাঁকে সেখানে নিমন্ত্রণ করে অভ্যর্থনা জানায়। স্বাগতাভিভাষণটি বলবার অনুরোধ আমাকেই করা হয়েছিল। কেন, তা জানিনে। এ তো ছাই-ফেলতে ভাঙা কুলো নয়। দেবকীবাবু যদি চটকদার রাবিশ ফিল্ম বানাতেন, তবে আমি ডাক পেলে আশ্চর্য হতুম না। তখন বুঝলুম, 'মুক্তো তুলতে ডুবুরি'—অর্থাৎ জউরী, যে সত্যই মুক্তোর মূল্য জানে, সে জলে নামে না—নামে মুক্তো বাবদে আনাড়ি ডুবুরি। কারণ আমি ফিল্ম দেখতে যাইনে, এ রকম একটা বদনাম তরুণদের মধ্যে আমার আছে। বৃদ্ধেরা অবশ্য খুশী হয়ে বলবেন, 'বা, বা, বেড়ে ছেলে, খাসা ছেলে।' আমি কিন্তু বৃদ্ধের প্রশংসার চেয়ে তরুণের নিন্দাই কামনা করি। সংস্কৃতেও বলে, 'বৃদ্ধার আলিঙ্গনের চেয়ে তরুণীর পদাঘাত শ্রেয়।'

যাক্ সে কথা। সেই সূত্রে দেবকীবাবুর পুত্র দিলীপের সঙ্গেও পরিচয় হয়। তদ্দণ্ডেই সে আমার ন্যাওটা হয়ে যায়। খাসা ছেলে। ফিল্ম দেখেও বেড়ে ছেলে—তরুণ বৃদ্ধ এক সুরেই বলবেন।

সে ডাক্তারি প্রাকটিসে নামার কয়েক বৎসর পর—আমি তখন ঘরের ছেলে কলকাতায় ফিরে এসেছি—দেবকীবাবু আমাকে একদিন শুধোলেন, 'দিলীপ কি রকম ডাক্তার?'

মিত্রপুত্রের প্রশংসা করতে সবাই আনন্দ পায়; এক গাল হেসে বললুম, 'চৌকশ, তালেবর।'

'মানে?'

'অতি সরল। এই দেখুন না মাস ছয় আগে আমার হল দারুণ আর্ত-রাইটিস—আর্তরব ছেড়ে ডাকলুম ডাকসাইটে অমুক ডাক্তারকে। তিনি ওষুধ দেওয়ার পর আমার এমনই অবস্থা যে আর্তরব স্মার্তরব কোনো রবই আর ছাড়তে পারিনে। তখন এলেন আরেক বাঘা ডাক্তার। তিনি নাকি মড়াকে জ্যান্ত করতে পারেন। আমার বেলা

হল উল্টো; জ্যান্তকে মড়া করতে লাগলেন। যাই যাই। সেই যে,

এক দুই তিন,
নাড়ি বড় ক্ষীণ।
চার পাঁচ ছয়,
কি হয় না হয়।
সাত আট নয়,
মরিবে নিশ্চয়।
দশ এগারো বারো,
খাট যোগাড় করো।
আঠারো উনিশ কুড়ি
বল "হরি হরি"।

কী আর করি? মরি তো মরি, মরবো না হয় দিলীপেরই হাতে। আর যা হোক হোক, আমাকে মানে। ভোঁতা নীড্‌ল দিয়ে শেষ ইন্‌জেকশনটা দেবে না।'

আমি থামলুম। দেবকীবাবু রুদ্ধশ্বাসে, শঙ্কিত কণ্ঠে শুধোলেন, 'তারপর কি হল? আপনি বেঁচে উঠেছিলেন কি?'

আমি বললুম, 'দিলীপ বাড়িতে ছিল না, তাই আসতে পারল না। আমি সেরে উঠলুম।

তবেই দেখুন, সে ভালো ডাক্তার কি না।'

সম্পাদক মশাই, আপনাদেরও কি সেই অবস্থা নয়? ডাকসাইটে অমুক লেখকের লেখা ছাপালেন। কাগজ নাবলো নিচে। বাঁচাতে গিয়ে ডেকে পাঠালেন আরেক বাঘা লেখককে। আপনাদের অবস্থা হল আরো খারাপ। তখন আমি দিলীপ—কাঁচা লেখক—চাইলেন আমার লেখা। আমি বরদায়। লেখা পাঠাতে পারলুম না। হুশ করে আপনার কাগজের মান উঁচু হয়ে গেল। বিশ্বাস না হয়, আপনার সেলস ডিপার্টমেন্টে খবর নিন—যে সংখ্যায় আমার লেখা ছিল না সেটি শুধু ইন্ডো পাকিস্তান ক্রিকেট টিকিটের মত বিক্রী হয়নি, ডাকে বিস্তর বিস্তর খোয়া যায়নি, হয়তো বা আপনার অজানতে কালোবাজারও হয়েছে। বলতে কি, ঐ সংখ্যাটি আমারও বড্ড ভালো লেগেছে। বিশেষ করে রঞ্জনের লেখাটি এবং বোম্বে থেকে ভৌমিকের 'প্রশ্নবান'। বস্তুত, আমি আজ ঠিক করেছিলুম এ সংখ্যাটি নিয়েই আলোচনা করবো কিন্তু উপস্থিত মাত্র দু'একটি মন্তব্য করে সে আলোচনা মুলতুবী রাখি।

যেমন মনে করুন, রঞ্জন লিখেছেন, 'বম্বের চিত্রনির্মাতা ঠিকই ধরেছেন যে অধিকাংশ দর্শক আড়াই ঘণ্টার জন্য (যখন ছবি ওই সময়ে শেষ হয়) আপন আসন্ন

পরিবেশ থেকে অব্যাহতি পেতে চায়।' সত্যই কি তাই? তবে আমার প্রশ্ন বৃদ্ধের আসন্ন পরিবেশ মৃত্যুর। এবং মৃত্যুভয় সব চেয়ে বড় ভয়। তবে বৃদ্ধেরা সিনেমা দেখতে যায় না কেন? আবার দেখুন, লড়াই যখন চলতে থাকে তখন ছুটি ফেরা জোয়ান সেপাই জোর সিনেমা যায়। চল্লিশ এবং পঞ্চাশের মাঝামাঝি সময়েই এদেশের পরিবেশ সর্বাপেক্ষা নিরানন্দময়। ছেলেদের পড়াবার পয়সা নেই, মেয়েরা বড় হয়েছে অথচ বর জুটছে না, চাকরিতে আর যে একটা মহৎ পদোন্নতি হবে সে সম্ভবনাও আর নেই—তবু ঐ বয়সের লোক সিনেমায় যায় কম। অথচ তার কলেজী ছেলে—যার ঘাড়ে এখনো সংসারের চাপ পড়েনি, খেলাধুলো সে করতে পারে, রকবাজিও তোফা জিনিস, তার আসন্ন পরিবেশ প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের তুলনায় অনেক কম ভয়াবহ—সেই বা ড্যাং ড্যাং করে সিনেমায় যায় কেন? না, আমার মন সাড়া দিচ্ছে না।

মঞ্জু বসু আমাদের ভৌমিক সায়েবকে শুধিয়েছেন, 'বারাঙ্গনার বীরাঙ্গনাতে রূপান্তরিতের একটি উদাহরণ দিন।' ভৌমিক ঠিক উত্তরই দিয়েছেন—'বাজিরাও প্রেমিকা মস্তানা বেগম।'

আমি উল্টোটার বিস্তর উদাহরণ দিতে পারি। বীরাঙ্গনা কি করে বারাঙ্গনা হয়। যে-কোনো খবরের কাগজে যে-কোনো দিন দেখতে পাবেন। আমি তো প্রথম দিনে হকচকিয়ে উঠেছিলুম। এক বিখ্যাত বাঙলা দৈনিকের প্রথম পাতার এক কোণে দেখি, একটি সৌম্যদর্শন মহিলার ফটোগ্রাফ এবং নিচে লেখা 'বারাঙ্গনা—অমুক।' এদের কি মাথা খারাপ, না এরা পাগল যে বারাঙ্গনার ছবি কাগজের পয়লা পাতায় ঘটা করে ছাপায়! তলায় আবার পরিচয় 'মহিলাটি বঁটি হাতে একা একটা ডাকাতকে ঘায়েল করে প্রাণ হারান।' তখন আমার কানে জল গেল। বাঙলা হরফের উপরের ও নীচের দিকের অংশ প্রায়ই ভেঙে যায়। দীর্ঘঈকারের উপরের লুপটি ভেঙে যাওয়াতে 'বী' বদলে হয়ে গিয়েছে 'বা'। এটা এক দিনের নয়। উপরের লুপ, ('বঞ্চিত' শব্দের উপর হুক ভেঙে গেলে আরো মারাত্মক), নিচের হ্রস্বউকার গণ্ডায় গণ্ডায় নিত্য নিত্য ভাঙে। আমরা অভ্যাসবশে পড়ে যায় বলে লক্ষ্য করিনে। যদি ঠিক যে রকম ছাপাটি হয়েছে—ভাঙাচোরার পর—সে রকমটি পড়েন তবে দেখবেন বিস্তর বীরাঙ্গনা বারাঙ্গনা হচ্ছে, এবং আরো অনেক সরেস উদাহরণ পাবেন যেগুলি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ছাপলে আমি সমাজে মুখ দেখাতে পারতুম না। আপনাকে বলে রাখি, এখনো পারিনে—তবে সেটা পাওনাদারের ভয়ে।

অরুণ গুহ শুধিয়েছেন, 'এমন একটি আশ্চর্য জিনিসের নাম বলুন, যা আজ আছে কিন্তু ত্রিশ বৎসর আগে ছিল না।' ভৌমিক উত্তর দিয়েছেন, 'শচীন ভৌমিক।' সরেস উত্তর।

তারপর অরুণ গুহ ফের শুধিয়েছেন, 'এমন একটি জিনিসের নাম বলুন যা না

থাকলে বিশ্বের কোনো ক্ষতি হত না।'—ভৌমিক উত্তর দিয়েছেন, 'অরুণ গুহ।' আমি শচীন ভৌমিক হলে লিখতুম, 'শচীন ভৌমিক'—এবারেও। কারণটা বুঝিয়ে বলি—

রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী চলেছে, সেই সুবাদ নিয়েই বলছি—

বিলাতের বিখ্যাত স্ট্র্যান্ড ম্যাগজীন একবার পৃথিবীর সেরা সেরা গুণী জ্ঞানীদের প্রশ্ন শোধান,

১। আপনার সবচেয়ে প্রিয় পাপমতি কি (হোয়াট ইজ ইয়োর বেস্ট ফেভরিট ভাইস?)?

২। আপনার সবচেয়ে প্রিয় পুণ্যমতি কি (হোয়াট ইজ ইয়োর মোস্ট ফেভরিট ভার্চু?)?

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

১। ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সি (অর্থাৎ কোনো জিনিসে অবিচল থাকতে পারিনে—অর্থাৎ মত বদলাই)

২। ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সি (অর্থাৎ কোনো জিনিসে অবিচল থাকতে পারিনে—অর্থাৎ মত বদলাই)।

একবার চিন্তা করলেই দেখবেন, ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সি জিনিসটা পাপ বটে, পুণ্যও বটে।

যখন আমি স্বার্থের বশে কিংবা শত্রুভয়ে কাপুরুষের মত আপন সত্য মত বদলাই (কুলোকে বলে এ ব্যামোটা রাজনৈতিকদের ভিতরই বেশী—'টার্নকোট্' এর নাম) তখন আমার ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সি পাপ। আবার যখন বুঝতে পারি আমার পূর্বমত ভুল ছিল, তখন লোকলজ্জাকে ড্যাম কেয়ার করে, এমন কি প্রয়োজন হলে স্বার্থত্যাগ করেও যখন মত বদলাই তখন আমার ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সি সাতিশয় পুণ্যকর্ম।

ঠিক সেইরকম ভৌমিক সায়েব যখন বলেন তিনি ত্রিশ বৎসরের আশ্চর্য জিনিস, আমরা সানন্দে সায় দিই। কারণ তিনি সুন্দর সুন্দর এবং চোখাচোখা মৌলিক এবং চিন্তাশীল উত্তর দিতে পারেন। কখনো আনন্দিত হয়ে বলি 'বাঃ' কখনো মার খেয়ে বলি 'আঃ'।

আর তিনি না থাকলেও কোনো ক্ষতি হত না। ইংরিজিতে বলে, 'যা তোমার অজানা সে তোমাকে বেদনা দিতে পারে না।' কিংবা বলবো, 'আমরা জানলাম না, আমরা কি হারাইতেছি।'

একটু চিন্তা করে দেখুন, কথাটা শুধু ভৌমিক সাহেব না, টলস্টয় কালিদাস, আপনি আমি সকলের বেলায়ই খাটে কিনা।

* * *

রবীন্দ্রনাথ ও ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সির সুবাদে আমাদের দুটি নিবেদন আছে।

গেল মাসে মিস গেছে তার জন্যই আমি সম্পূর্ণ দায়ী নই। বড় লেখক হলে আমি অনায়াসে বলতে পারতুম, 'মশাই, ইন্‌স্‌পিরেশন্‌ আসেনি—আমি কি দর্জি না ছুতোর, অর্ডার-মাফিক মাল দেব? তা নয়। আমি সাধারণ লেখক। আমি আজ পর্যন্ত কখনো ইন্‌স্‌পায়ার্ড হয়ে লিখিনি। আমি লিখি পেটের ধান্দায়। পূর্বেই বলেছি, চতুর্দিকে আমার পাওনাদার। কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝিনে? যতবার ফুরিয়ে গিয়েছে ততবারই হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। একটু বেশি ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে তবু না বলে উপায় নেই, আপনি হয়তো লক্ষ্য করেন নি, আমি চাকরিতে থাকাকালীন আমার কোনো প্রকারের 'সাহিত্য-সৃষ্টি' করিনে—চাকরিতে থাকাকালীন আমার কোনো বই বেরয়নি। তখন তো পকেট গরম, লিখতে যাবে কোন মূর্খ! অতএব ইন্‌স্‌পিরেশনের দোহাই কাড়লে অধর্ম হবে।

আমি গিয়েছিলুম বরদা। সেখানে আমি মধ্য যৌবনে আট বছর কাজ করি। ১৯৪৪-এ বরদা ছাড়ি। সেখানে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উদ্বোধন করতে আমাকে আহ্বান জানানো হয়, পুরনো চেনা লোক বলে, অন্য কোনো কারণে নয়। না গেলে নেমকহারামী হত। ট্রেনে লেখা যেত না? না। আপনি যদি গবেষণামূলক উচ্চাঙ্গ উন্নাসিক গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ চাইতেন সে আমি গণ্ডায় গণ্ডায় ট্রেনে-বাসে, ভেস্‌টিবুলে তরুমূলে যেখানে সেখানে বসে—না বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও লিখে দিতে পারি। কিন্তু একটুখানি রসের ভিয়েন দিতে গেলেই চিত্তির। তার জন্য ইন্‌স্‌পিরেশন্‌ না হোক, অবকাশটি চাই। সাধে কি আর জি.কে. চেস্টারটন বলেছিলেন, 'টাইম্‌স্‌ কাগজের গুরুগম্ভীর সম্পাদকীয় কলম আমি দিনের পর দিন আধঘণ্টার ভিতর লিখে দিতে পারি, কিন্তু ঐ যে ট্রাম বাসের কাগজ 'টিট্‌বিট্‌স' —তার পয়লা পাতার বিশটি রসিকতার চুটকিলা গল্প একসঙ্গে আমি কখনো রচনা করতে উঠতে পারবো না।' অথচ কে না জানে, চেস্টারটন ছিলেন সে যুগের প্রধান সুরসিক লেখক। আর আমি? থাকগে।

দ্বিতীয় ঐ ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সির কথা। ওটার বাড়াবাড়ি করলে লোকে ভাববে পাগল। গল্পটা তাই নিয়ে।

ট্রেনে ফেরার মুখে এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে শোনা। ওটা উনি কোনো ছাপা বই থেকে পড়ে বলেছেন কি না হলপ করতে পারবো না, তবে এইটুকু বলতে পারি, সেই থেকে যাকে বলেছি, তিনি উত্তরে বলেছেন, এটা তিনি আগে কখনো শোনেননি। আজ দোলপূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ ছিল—তার সঙ্গেও এর কিঞ্চিৎ যোগ (অর্থাৎ এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ) রয়েছে।

ক্লাস টীচার বললেন, 'গত শতাব্দীর সূর্যগ্রহণ সংখ্যা থেকে চন্দ্রগ্রহণ সংখ্যা বিয়োগ করে, তোমার কলারের সাইজের সঙ্গে এ বাড়ির থামের সংখ্যা যোগ দিয়ে, পদীপিসির নামকে ক্ষান্তমাসির নাম দিয়ে ভাগ করে বল দিকিনি আমার বয়স কত?'

ছেলেরা তো অবাক! এ কখনো হয়?

একটি চালাক ছোকরা হাত তুলে বললে, 'আমি পারি স্যার।'

টীচার বললেন, 'বল।'

'চুয়াল্লিশ'।

টীচার ভারী খুশী হয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছিস। কিন্তু স্টেপগুলো বাৎলা তো, কি করে তুই সঠিক রেজাল্টে পৌঁছলি!'

ছেলেটি তিন গাল হেসে বললে, 'মাত্র তিনটি স্টেপ, স্যর। অতি সোজা ঃ—

আমাদের বাড়িতে একটা আধ পাগলা আছে;

তার বয়স বাইশ;

অতএব আপনার বয়স চুয়াল্লিশ।।'

"ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার
সম্মুখে ঘন আঁধার—"

খাচ্ছে, দাচ্ছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, কখনো হতাশ হয়, কখনো বা খুশী, বউ বাপের বাড়ি গেল তো মুখে ব্যাজার ভাব, এমন সময়ে চ্যারিটি ম্যাচের একখানা টিকিট ফোঁকটে পাওয়াতে সে বেদনা না পাত্তা ঘুচে গেল—এই নিয়ে আমরা পাঁচজন আছি। সৃষ্টিকর্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই আমরাই পৃথিবীতে ম্যাজরিটি। আমাদের বেদনা সামান্য, সেটা ঘুচতেও বেশীক্ষণ লাগে না।

অথচ মুনিঋষি পীর প্যাকম্বর বলেন, 'তোমরা অমৃতের সন্তান, অমৃতের সন্ধান করো। একফোঁটা একটি মেয়েও নাকি বিস্তর ধনদৌলত পাবার পর বলেছিল, 'যা দিয়ে আমি অমৃত হব না, তাতে আমার কি প্রয়োজন!'

চাকরি বজায় রাখার জন্য আমাকে সমস্ত জীবন ধরে দুনিয়ার তাবৎ ধর্মের (বেশী না, আল্লার দয়ায় মাত্র সাতটি) বিস্তর বই পড়তে হয়েছে। কিন্তু আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি, এই আমরা সাধারণ পাঁচজন তো অমৃত না পেয়েও দিব্যি বেঁচে আছি, ওর পিছন ছুটোছুটি করার আমাদের কী প্রয়োজন! আর বাঙলা কথা বলতে কি, আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত মত, তখন ঐ অমৃতটা আমাদের ঘাড়ে চাপানোই অন্যায়। অন্তত একটি মহাপুরুষ—আমাদের মতে—এ খাতায় একটি মুক্তো জমা রেখে গেছেন; তিনি বলেছেন, 'শূয়রের সামনে মুক্তো ছড়িয়ো না।' তাই সই। গালাগালটা বরদাস্ত করে নিলুম। আর, মহাপুরুষ এ কথাটা বলার সময় ক্ষণেকের তরে আমার দিকে একবার তাকিয়ে ছিলেন তো? —তাতেই হয়ে যাবে। 'মোক্ষ' নামক 'অমৃত' বলে কোনো পদার্থ যদি থাকে তবে ঐ একটি চাউনিতেই সকলং

হস্ততলং। অবশ্য সে 'অমৃতে'র জন্য কোনো অসম্ভব ভবিষ্যতে যদি আমার প্রাণ আদৌ কাঁদে!

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এঁরা দেখতে মানুষের মত বটেন, কিন্তু আসলে এঁরা মানুষ নন। নইলে বলুন দেখি, তুমি কবি, দু' পয়সা তোমার আছে, পদ্মায় বোটে ভাসতে তুমি ভালোবাসো, কী দরকার তোমার ইস্কুল করার আর তার খাঁই মেটাবার জন্য বৃদ্ধবয়সে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দিল্লি, বোম্বাই চষার? কিংবা বিবেকানন্দ! অসাধারণ জিনিয়স। পঁচিশ হতে না হতেই প্রাচীন অর্বাচীন দিশী-বিদিশী সর্বশাস্ত্র নখাগ্রদর্পণে! কী দরকার ছিল সেই সুদূর আমেরিকায় গিয়ে—শেক্‌স্‌পিয়ারের ভাষায়—টু টেক আর্মস, এগেন্‌স্‌ট্ এ সী অব্ ট্রাবল্‌স্?* কী দরকার ছিল অরবিন্দের নির্জনে ধ্যানে ধ্যানান্তরে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর লোকে ব্রহ্মের কাছ থেকে অমৃতবারি আহরণ করে, নিম্নে, তারো নিম্নে এসে এই ভস্মীভূত ভারতসন্তানকে পুনর্জীবিত করার?

এঁদের কথা বাদ দিলুম। এঁরা আমাদের মত নন।

কিন্তু—এখানেই একটা বিরাট কিন্তু!

এই যে আমরা রামাশামা, আমাদের ভিতর বিবেকরবি নেই, কিন্তু তাই বলে আমাদের সক্কলেরই কি ওঁদের চেয়ে স্পর্শকাতরতা কম? ওঁদের মত কীর্তি আমরা রেখে যাই না, তাই বলে বেদনাবোধ কি আমাদের সক্কলেরই ওঁদের চেয়ে কম? বরঞ্চ বলবো, বিধিপ্রসাদাৎ কিংবা আপন সাধনবলে তাঁরা চিত্তজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে বেদনা-বোধ তাঁদের ভেঙে ফেলতে পারেনি। কিন্তু আমাদের কেউ কেউ যেন টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যেন জীবন্ত অবস্থায়ই হঠাৎ তাদের জীবন-প্রদীপ নিবে যায় আর চোখের সামনে সে যেন শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। যেন বিরাট নবাব বাড়ি আধ ঘণ্টার ভিতর চোখের সামনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। আমার যে ক'টি অকর্মণ্য গাছ তার চতুর্দিকে ছিলুম—যাবার সময় আমাদেরও ঝলসে দিয়ে গেল।

হয়তো ঠিক অতখানি না। আমার এক অতি দূর সম্পর্কের ভাগ্নে ছিল। ডিগডিগে লম্বা পাতলা, কাঁচা সোনার বর্ম, ভারী লাজুক। বিধবা মায়ের এক ছেলে। তাঁর মানা না শুনে পড়াশুনো করতে এসেছে শহরে। সে গাঁয়ের আর কোনো ছেলে কখনো বাইরে যায়নি। এর বোধ হয় উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল। ছেলেটি কিন্তু তোৎলা। হয়তো সেই কারণেই বেশী লাজুক।

এক মাসও যায়নি। ইন্‌স্‌পেক্টর এসেছেন ইস্কুল দেখতে। তাকে শুধিয়েছেন কি

---

* ইদানীং রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ নিয়ে তুলনাত্মক আলোচনা হচ্ছে। অন্য কেউ দেখিয়ে না দিয়ে থাকলে আমি একটি মিল দেখাই। দুজনেই প্রথমেই আমেরিকা গিয়েছিলেন ভারত-সেবার জন্য অর্থ আনতে। দুজনাই নিরাশ হয়েছিলেন।

একটা প্রশ্ন। উত্তরটা সে খুব ভালো করেই জানে। কিন্তু একে তো তোৎলা, তার উপর উত্তর জানে বলেই হয়ে গেছে বেজায় নার্ভাস্। 'তোৎ তোৎ' করে আরম্ভ করতে না করতেই ইন্‌স্‌পেক্টর তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ফেলে চলে গেলেন এগিয়ে।

ব্যাপারটা হয়েছিল বেলা তিনটেয়।

রাত সাতটায় পাওয়া গেল তার লাশ। গাছ থেকে ঝুলছে।

ভাবুন তো, ইস্কুল থেকে ফিরে যাবার পথে, তার মায়ের স্নেহের আঁচল থেকে দূরে, সেই আপন নির্জন কক্ষে ঘণ্টা তিনেক তার মনের ভিতর কী ঝড় বয়ে গিয়েছিল? অপমানের কালনাগিনীর বিষ যখন তার মস্তিষ্কের স্নায়ুর পর স্নায়ু জর্জর করে করে শেষ স্নায়ু কালো বিষেই রূপান্তরিত করেছে তখনই তো দড়িগাছা হাতে তুলে নেয়। সে তখন সহ্য অসহ্যের সীমার বাইরে চলে গিয়েছে। আচ্ছা, সে কি তখন তার বিধবা মায়ের কথা একবারও ভাবেনি? কিন্তু, দয়াময়, আমাকে মাফ করো, আমি বিচারকের আসনে বসবার কে?

অতি গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের মৌলিক কায়েত, আমার প্রতিবেশী হাতে যেন স্বর্গ পেল যখন তার সাদা-মাটা মেয়েকে বিয়ে করলে এক 'মহাবংশের ঘোষ'—বিনা পণে। ছেলেটি গরীব এই যা দোষ কিন্তু ভারী বিনয়ী আর বড়ই কর্মঠ। প্রেসের কাজ জানে। আমরা হিন্দু-মুসলমান সবাই শতহস্ত তুলে তাকে আশীর্বাদ করেছিলুম।

বিয়ের কিছুদিন পরে কি জানি কি করে ধরে নিয়ে এল এক পার্টনার। খুললো ছোট্ট একখানা প্রেস। হ্যান্ডবিল বিয়ে-শ্রাদ্ধের চিঠি ছাপায়, কখনো বা মুন্সেফী আদালতের ফর্ম ছাপবারও অর্ডার পায়। জল নেই, ঝড় নেই, দুই দুপুরই বরাবর, সর্বত্রই তাকে দেখা যায় প্রুফের বোন্দা বগলে। হেসে বলে, 'এই হয়ে এল।' অর্থাৎ শিগ্‌গিরই ব্যবসাটা পাকা ভিতে দড় হয়ে দাঁড়াবে। একটু যাকে দরদী ভাবতো তাকে বলতো, 'মাকে নিয়ে আসছি।' গরীব মা গাঁয়ে থাকে। হয়তো বা গতর খাটিয়ে দু'মুঠো অন্ন জোটায়।

দশ বৎসর পর দেশে ফিরেছি। বাড়ি পৌঁছবার পূর্বেই রাস্তায় সেই ছোকরা—না, এখন বুড়োই বলতে হবে, অকালে—দেখি উল্টো দিক থেকে আসছে। পরনে মাত্র শতচ্ছিন্ন গামছা। বগলে ছেঁড়া খবরের কাগজের বোন্দা। ছন্নের মত চেহারা। আমার কাছ থেকে সিগরেট চাইলে। আমি তো হতভম্ব। তার স্ত্রী আমার ছোটবোনের ক্লাসফ্রেন্ড। আমি তার মুরুব্বী। সিগারেট দিলুম। সেটা ধরিয়ে আমার দেশলাইটা ফেলে দিলে নর্দমায়! এক গাল হেসে বললে, 'মাকে নিয়ে আসছি।' মনটা বিকল হয়ে গেল। দশ বৎসর পর আমার শহর এই দিয়ে আমায় ঘরে তুলছে?

বোন বললে, 'প্রেস যখন রীতিমত পয়সা কামাতে আরম্ভ করেছে তখন তার পার্টনার তাকে দিলে ফাঁকি। একটা আদালত পর্যন্ত লড়েছিল। তারপর পয়সা

কোথায়? পাগল হয়ে গেছে।'

তবু এখনো তার 'মাকে শহরে এনে পাকা বাড়িতে তুলছে।' মা কবে মরে ভূত হয়ে গিয়েছে। গাঁয়ের আর পাঁচটা বিধবা যে-রকম দুঃখ-দুশ্চিন্তায় মরে।

আর মাধবী? আবার বোন শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে সে তাকে দেখতে আসে। আমি তখন মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে বৈঠকখানায় আশ্রয় নিই।

আর যে আত্মহত্যা করল না, পাগলও হল না, তার অবস্থা যে আরও খারাপ।

সরকার আমাকে অনর্থক একটা টেলিফোন দিয়েছিল। তবে সেটা কাজে লাগতো তেতলার একটি মেয়ের। আমরা যৌবনে যে সুযোগ পেলুম না তা যদি ঐ মেয়েটি পেয়ে থাকে তবে, আহা, ভোগ করুক না সে আনন্দ—তার ইয়ংম্যান প্রায়ই তাকে ফোন করে।

তারপর হঠাৎ মাসাধিক কাল কোনো ফোন নেই। ভাবলুম, আমি যখন আপিসে তখন বোধ হয় ফোন করে। তারপর একদিন বাথরুমের দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা আর আমার চাকরের ভীত কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি খুলে দেখি, তেতলার মেয়েটি মেঝেতে পড়ে—ভিরমি গেছে—পাশে টেলিফোনের রিসীভার।

সন্ধ্যাবেলা আমার লোকটা বললো, 'ভিরমি কাটতে বেশীক্ষণ লাগেনি, তবে কিছু খেলেই সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যাচ্ছে।'

আমার ঘরে এসে টেলিফোন করতো বলে আমি ইচ্ছে করেই কোনো কৌতূহল দেখাইনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও খবরটা কানে এসে পৌঁছল। এসব ব্যাপার পাড়াতে জানাজানি হয়ে যায়। মেয়েটির পরিবারের ডাক্তারও আমার ভালো করে চেনা। ইংরিজিতে বললেন, 'He walked out on her to another girl !'

কেমন যেন চোখের সামনে দেখতে পেলুম, ঐ ভিরমি-যাওয়া মেয়েটার উপর পা দিয়ে যেন সেই ছেলেটা পার হয়ে আরেকটা মেয়ের হাত ধরে চলে গেল। Walk on তো তাই মানে হয়, না?

আজ আর মনে নেই কতদিন ধরে মেয়েটা কিছু খেলেই বমি করতো।

দু'বছর তাকে দেখিনি। তারপর একদিন সিঁড়িতে দেখা। আগেকার মতই সেই সাজগোজ করেছে। মনে হল চীনে ফানুস দেখছি, কিন্তু প্রদীপটি নিবে গেছে।

ঐ বেদনাই তো সবচেয়ে বড় বেদনা।

মা যখন বাচ্চাকে মারে তখন সে বার বার ঐ মায়ের কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আশ্রয়ের জন্য—যেখান থেকে আঘাত আসছে সেখানেই। আশ্চর্য, কিন্তু আশ্চর্য হবার কীই বা আছে, কারণ মারুক আর নাই মারুক অজানার মাঝেও অবুঝ জানে সে তার মা-ই! কিন্তু যখন দয়িত walk out on her, তখন বেচারী আশ্রয় খুঁজবে কোথায়? সে দয়িত তো এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক, সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা। এতদিন ধরে তার সামান্যতম বেদনা যখনই কোনো জায়গা থেকে এসেছে—বাপ, মা, সমাজ

যেখান থেকেই হোক---তখনই ছুটে গিয়ে বলেছে দয়িতকে। ঐ বলাটুকুতেই পেয়েছে গভীর সান্ত্বনা। আর আজ? আজ তার সেই শেষ নির্ভর গেল। বরঞ্চ পাষাণ-প্রাচীরের উপর বল ছুঁড়লেও সেটা ফিরে আসে। কথা বললেও প্রতিধ্বনি আসে। কিন্তু এখন শূন্যে, মহাশূন্যে সব বিলীন। (অবশ্য মডার্নরা বলবেন, 'ওসব রোমাণ্টিক প্রেম আজ আর নেই। আজ এক মাস যেতে না যেতেই সবাই অন্য লাভার পেয়ে যায়।' তাই হোক্, আমি তাই কামনা করি। আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ তাদের উপর)।

ধর্মের সমুখে উপস্থিত হলুম এই তিনটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিয়ে। কেউ বলেন, 'এসব মায়া। তুমিও নেই, আমিও নেই, এই পৃথিবীও নেই, তদপি কেন শোকাতুর হও।' কেউ বলেন, 'লীলা। ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করো। সান্ত্বনা পাবে।' কেউ বলেন; 'মনই সর্ব-দুঃখের উৎপত্তিস্থল। সেই চিত্তের বৃত্তি নিরোধ করো। তাতেই শান্তি।' আরো অনেক মত আছে।

আমি নতমস্তকে সব কটাই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু মা-ঠাকুমারা এসবে বিশ্বাস করতেন, কিংবা আরো ভাল হয় যদি বলি, ধর্ম তখন সজীব ছিল, সে তখন সে-বিশ্বাস জাগাতে পারতো—তাই তাঁরা শান্তি পেয়েছেন।

ধর্ম কেন আমার সেই ভাগ্নেকে চিত্তবল দিল না আত্মহত্যা না করার জন্য, প্রেসের পাগলকে রুকলো না সেই দারুণ দুর্দৈব থেকে, প্রতিবেশীর মেয়েকে দিল না শক্তি সইবার---ফের স্বাভাবিক সুস্থ সবল হওয়ার? শুধু তাদেরই দোষ? ধর্মের আত্মশক্তি কমে যায় নি কি? কিংবা দোষ উভয়ের?

কম্যুনিজম তাই বুঝি। সে বলে রাষ্ট্রই সব। তোমার ব্যক্তিগত শোক কিছুই না। তুমি বেশী গম ফলাও বেশী কামান বানাও রাষ্ট্র রক্ষার জন্য। সব ভুলে যাবে। কম্যুনিস্টরা এ ধর্মে বিশ্বাস করেন কি না তা জানিনে, কিন্তু এ-কথা জানি, রাষ্ট্র এ-বিশ্বাস তাদের হৃদয়-মনে দৃঢ় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। অন্য ধর্মেরা করে?

* * *

আমরা কয়েকজন মিলে চা খাচ্ছিলুম। নানা রকম দুঃখ-সুখের কথা হচ্ছিল। আমাদের মধ্যে একজন অল্পবয়সী বড়ই স্পর্শকাতর ডাক্তার। হঠাৎ বললে, 'জানেন, আলী সাহেব, আমাদের হাসপাতালে একটি চার বছরের ছেলে বড় ভুগে খানিকটা সেরে বাড়ি গিয়েছিল, আজ আবার ফিরে এসেছে। ও সারবে না। অমি যখন ইন্‌জেক্‌শন তৈরি করছিলুম তখন আমার গা ঘেঁষে যেন করুণা জাগাবার জন্য বললে, "দাত্তার, দিয়ো না, বদ্দো লাগে।" '

হে ধর্মরাজগণ, এ শিশুকে কি দিয়ে কে বোঝাবে?

দুপুর রাতে যখন তার ঘুম ভেঙে যায়, ইন্‌জেক্‌শনের ভয়ে শিউরে উঠে—চেয়ে দেখে, এই বিশাল পুরীতে কেউ নেই, তার কেউ নেই—তখন?

হয়তো বা বিজ্ঞান পারবে। বিজ্ঞান একদিন তাকে সারিয়ে দেবে। না পারলেও হয়তো বা তাকে কোনো প্রদোষ নিদ্রায় (আমি এসব জিনিস জানি না, তবে Twilight sleep না কি যেন একটা আছে এবং আশা, সেটা আরো উন্নতি করবে) ঘুম পাড়িয়ে দেবে। হাসপাতালে গিয়ে দেখব, সে ঘুমিয়ে আছে, পুতুলটি বুকে চেপে ঘুমিয়ে আছে, নন্দনকাননের অপ্সরীদের আদর পেয়ে তার মুখে মিঠে হাসি।

জয় বিজ্ঞানের!

কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে তো জীবনের কোনো comprehensive philosophy নেই যা ভাগ্নেকে রুকবে প্রতিবেশীর মেয়েকে নর্মাল করে তুলবে।

হে ধর্মরাজগণ, বিজ্ঞানের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে, তাকে আশীর্বাদ দিয়ে এবং আপন আত্মশক্তি দৃঢ়তর করে আমাদের বাঁচাও।

আমি জানি, আমার জীবনে সেদিন আমি দেখে যেতে পারবো না।

এই নির্জন প্রান্তরে এ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত থেকে থেকে 'নিশির ডাকে'র মত শুনতে পাবো, 'দাত্তার দিয়ো না, বদ্দো লাগে—', দেখতে পাবো সেই প্রদীপহীন চীনা ফানুস।।

মৃত্যু

বুড়ো হওয়াতে নাকি কোনো সুখ নেই।

আমি কিন্তু দেখলুম, একটা মস্ত সুবিধা তাতে আছে। কোনো কিছু একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটলে—যেমন ধরুন প্রিয় বিয়োগ—মনকে এই বলে চমৎকার সান্ত্বনা দেওয়া যায়—'যাক্! এটার তিক্ত স্মৃতি আর বেশিদিন বয়ে বেড়াতে হবে না। মৃত্যু তো আসন্ন।' যৌবনে দাগা খেলে তার বেদনার স্মৃতি বয়ে বেড়াতে হয় সমস্ত জীবন ধরে। কিংবা এই যে বললুম, প্রিয় বিয়োগ—আমার যখন বয়স চৌদ্দটাক তখন আমার ছোট ভাই দু'বছর বয়েসে ওপারে চলে যায়। কালাজ্বরে। তার ছ'মাস পরে ব্রহ্মচারীর ইন্‌জেক্‌শন বেরোয়। তারপর যখন গণ্ডায় গণ্ডায় লোক তারই কল্যাণে কালাজ্বরের যমদূতগুলোকে ঠাস ঠাস করে দু'গালে চড় কষিয়ে ড্যাং ড্যাং করে শহরময় চষে বেড়াতে লাগলো তখন আমার শোক যেন আরো উথলে উঠল। বার বার মনে পড়তে লাগল, ঐ চৌদ্দ বছর বয়সেই আমি তার জন্য কত না ডাক্তার, কবরেজ, বদ্যি, হেকিমের বাড়ি ধন্না দিয়েছিলুম ; ইস্কুল থেকে ফিরেই ছুটে যেতুম মায়ের কাছে, শুধাতুম 'আজ জ্বর এসেছিল?' মা মুখটি মলিন করে ঘাড় ফিরিয়ে নিতেন। একটু পরে বলতেন, 'আজ আরো বেশী।'

আমি চুপ করে বারান্দায় বসে ভাবতে বসতুম—'নাঃ, এ কবরেজটা কোনো

কর্মের নয়। কিন্তু শহরের এই তো নাম করা শেষ কবরেজ। তবে দেখি হেকিম সায়েবকে দিয়ে কিছু হয় কি না—'

আপনারা হয়তো ভাবছেন, 'চৌদ্দ বছরের ছেলে করবে এসব ডিসিশন! বাড়ির কর্তারা করছিলেন কি?'

আসলে আমি বুঝতে পারতুম না, কর্তারা, দাদারা এমন কি মা পর্যন্ত অনেক আগেই বুঝে গিয়েছিলেন, আমার ভাইটি বাঁচবে না। তাঁরা আমাকে সে খবরটি দিতে চাননি। আমার জন্মের পূর্বে আমার এক দাদা আর দিদিও ঐ ব্যামোতে যায়।

ডাক্তার কবরেজরাও আমার দিকে এমন ভাবে তাকাতেন যে তার অর্থটা আজ আমার কাছে পরিষ্কার—তখন বুঝতে পারিনি। তবু তাদের এই চৌদ্দ বছরের ছেলেটির প্রতি দরদ ছিলো বলে আসতেন, নাড়ী টিপতেন, ঔষধ দিতেন।

এই দুই বছরের ভাইটি কিন্তু আমাকে চিনতো সবচেয়ে বেশী—কি করে বলতে পারবো না। আমাকে দেখা মাত্রই তার রোগজীর্ণ শুকনো মুখে ফুটে উঠতো ম্লান হাসি।

সে হাসি একদিন আর রইল না। আমাকে সে ডরাতে আরম্ভ করলো। আমাকে দেখলেই মাকে সে আঁকড়ে ধরে রইত। আমার কোলে আসতে চাইতো না। আমার দোষ, আমি কবরেজের আদেশমত তার নাক টিপে—তাকে জোর করে তেতো ওষুধ খাইয়েছিলুম।

ঐ ভয় নিয়েই সে ওপারে চলে যায়।

তার সেই ভীত মুখের ছবি, আমি বয়ে বেড়াচ্ছি, বাকি জীবন ধরে।

* * *

ঠিক এক বছর পূর্বে আমার এক প্রিয়-বিয়োগ হয়। এবারেরটা নিদারুণতর কিন্তু ঐ যে বললুম, এটা আর বেশীদিন ধরে বয়ে বেড়াতে হবে না।

কিন্তু প্রশ্ন, আমি এসব করুণ কথা পাড়ছি কেন? বিশ্বসংসার না জানুক, আমার যে ক'টি পাঠক-পাঠিকা আছেন তাঁরা জানেন আমি হাসাতে ভালোবাসি। কিন্তু উল্টোরথের পাঠক-পাঠিকারা নিত্যি নিত্যি সিনেমা দেখতে যান—সেখানে করুণ দৃশ্যের পর করুণ দৃশ্য দেখে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলেন। ভগ্নহৃদয় নায়ক কি রকম খোঁড়াতে খোঁড়াতে দূর দিগন্তে বিলীন হয়ে যান, আর সুস্থ হৃদয় নায়িকা কি রকম ড্যাং ড্যাং করে ক্যাডিলিয়াক গাড়ী চড়ে হানিমুন ক ত মণ্টিকার্লো রওয়ানা হন। আমার করুণ-কাহিনী তো তাঁদের কাছে ডাল-ভাত।

তবু আমি ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে এ রচনা আরম্ভ করেছি মহত্তর আদর্শ নিয়ে।

আমাদের সবচেয়ে বড় কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি আর পাঁচটা রসের সঙ্গে হাস্যরসও আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন, অথচ কেউ কি কখনো চিন্তা করে, তাঁর জীবনটা কি রকম বিষাদবহুল ঘটনায় পরিপূর্ণ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস অন্য যে-

কোনো সাধারণজন এরকম আঘাতের পর আঘাত পেলে কিছুতেই আর সুস্থ জীবনযাপন করতে পারতো না। অথচ রবীন্দ্রনাথকে দেখলে বোঝা যেত না, কতখানি শোক তিনি বুকের ভিতর বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি ভেঙে তো পড়েনইনি, এমন কি তীব্র শোকাবেগে কখনো কখনো অধর্মাচরণ করেননি—অর্থাৎ কাব্য সাহিত্য সৃষ্টি, যা তার 'ধর্ম' সেটি থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর ঋষিতুল্য সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলেন, 'আমাদের সকলেরই পা পিছলিয়েছে—রবির কিন্তু কখনো পা পিছলোয়নি।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের আদর পাননি। কিন্তু তাঁর বয়েস যখন ৭/৮ তখন তাঁর দাদা বিয়ে করে আনলেন কাদম্বরী দেবীকে। বয়সে দুজনাই প্রায় সমান। কিন্তু মেয়েদের মাতৃত্ব বোধটি অল্প বয়েসেই হয়ে যায় বলে তিনি তাঁর মায়ের অভাব পূর্ণ করে দেন। এই সমবয়সী দেবরটিকে তিনি দিয়েছিলেন সর্বপ্রকারের স্নেহ ভালোবাসা। প্রভাত মুখোর রবীন্দ্র জীবনীতে তার সবিস্তার পরিচয় পাবেন।

এই প্রাণাধিকা বৌদিটি আত্মহত্যা করেন রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বাইশ। কী গভীর শোক তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁর কাব্যে বার বার প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীর ভ্রাতা আত্মহত্যা করলে পর বৃদ্ধ কবি তাঁকে তখন সান্ত্বনা দিয়ে একখানি চিঠি লেখেন। সেটিও রবীন্দ্র জীবনীতে উদ্ধৃত হয়েছে। পাঠক পড়ে দেখবেন। কী আশ্চর্য চরিত্রবল থাকলে মানুষ এমনতরো গভীর শোককে আপন ধ্যানলোকে শান্ত সমাহিত করে পরে রসরূপে কাব্যরূপে নানা ছন্দ নানা গানে প্রকাশ করতে পারে,—পাঠক, শ্রোতার হৃদয় অনির্বচনীয় দুঃখে সুখে মেশানো মাধুর্যে ভরে দিতে পারে। কবির ক্ষয়ক্ষতি বাঙলা কাব্যের অজরামর সম্পদে পরিবর্তিত হল। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গত হলেন, পিতা গত হলেন—এগুলো শুধু বলার জন্যে বললুম, হিসেব নিচ্ছি না।

তারপর পুরো কুড়ি বছর কাটেনি—আরম্ভ হল একটার পর একটা শোকের পালা।

প্রথমে গেলেন স্ত্রী[১]। তাঁর বয়স তখনো ত্রিশ পূর্ণ হয়নি। (বড় মেয়ে মাধুরীলতার বিয়ের কয়েক মাস পরেই।) তিন কন্যা আর দুই পুত্র রেখে। সর্বজ্যেষ্ঠর বয়স পনেরো, সর্বকনিষ্ঠের সাত। মাধুরীলতা ছাড়া আর সব ক'টি ছেলেমেয়ে মানুষ করার ভার রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের শিষ্য অজিত চক্রবর্তীর ('কাব্য পরিক্রমা'র লেখক) মাতা কবিজায়ার মৃত্যুর কুড়ি বৎসর পর আমাকে বলেন, মৃণালিনী দেবী তাঁর রোগশয্যায় এবং অসুস্থাবস্থায় তাঁর স্বামীর কাছ থেকে যে সেবা

---

১. ইনি কি রোগে গত হন জানা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'উদরের পীড়া, খুব সম্ভব এপেণ্ডিসাইটিস।' আমি বাল্যকালে গুরুজনদের মুখে শুনেছি সুতিকা।

পেয়েছিলেন তেমনটি কোনোকালে তার স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছে বলে তিনি জানেন না। তিনি বলেন, স্ত্রীর মানা অনুরোধ না শুনে তিনি নাকি রাত্রির পর রাত্রি তাঁকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাই জানেন, স্পর্শকাতর কবিকে এই মৃত্যু কী নিদারুণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তাঁকে জীবনের রহস্য শেখায়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৪০/৪১। দেখাতো ৩০/৩১। অটুট স্বাস্থ্য। কিন্তু তিনি পুনরায় দারগ্রহণ করেননি।

এর কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় মেয়ে রেণুকা বারো বছর বয়সেই পড়ল শক্ত অসুখে। যখন ধরা পড়লো, ক্ষয় রোগ, তখন কবি তাকে বাঁচাবার জন্য যে কী আপ্রাণ পরিশ্রম আর চেষ্টা দিয়েছিলেন তার বর্ণনা দেওয়া আমার শক্তির বাইরে। কিছুটা বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দিয়েছেন—তখনো তিনি জানতেন না, মেয়েটি কিছুদিন পরেই তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে। অসুস্থ অবস্থায়ও এই মেয়েটির প্রাণ ছিল আনন্দরসে চঞ্চল। পিতা-কন্যায় গাড়িতে করে স্বাস্থ্যকর জায়গা যাবার সময় যে মধুর সময় যাপন করেন তার কিছুটা আভাস পাঠক পাবেন 'পলাতকা'র 'ফাঁকি' কবিতাতে।

বছর দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জর জর
তখন বললে 'হাওয়া বদল করো'।

পাঠক, এই 'তখন' শব্দটির দিকে লক্ষ্য রাখবেন। রোগের প্রথম অবস্থায় নয়, যখন মৃত্যু আসন্ন। এ নিদারুণ অভিজ্ঞতা ক্ষয়-রুগীর অনেক আত্মীয়স্বজনের হয়েছে।

দু' বছরের ভিতরই দুইটি অকালমৃত্যু—অর্থহীন সামঞ্জস্যহীন যেন মানুষকে নিছক পীড়া দেবার জন্য ভগবান তাঁকে পীড়া দিচ্ছেন। তারপর চার বছর যেতে না যেতেই সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ তেরো বছর বয়েসে এক বন্ধুর সঙ্গে ছুটিতে বেড়াতে যায় মুঙ্গেরে। 'সেইখানে শমীন্দ্রের কলেরা হয়; কবি টেলিগ্রাফ পাইয়া কলিকাতা হইতে মুঙ্গেরে চলিয়া গেলেন।' রবীন্দ্রনাথই এই সময়ের এক চিঠিতে লিখেছেন, 'যে সংবাদ শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। ভোলা মুঙ্গেরে তাহার মামার বাড়িতে গিয়াছিল, শমীও আগ্রহ করিয়া সেখানে বেড়াইতে গেল, তাহার পরে আর ফিরিল না।'

অনেকের মুখেই শুনেছি, শমীন্দ্র তার পিতার সবচেয়ে আদরের সন্তান ছিলেন। প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেন, সে 'আকৃতিতে প্রকৃতিতে পিতার অনুরূপ ছিল।'

'ঠিক পাঁচ বৎসর পূর্বে ঐ দিনে কলিকাতায় শমীন্দ্রের মায়ের মৃত্যু হয়।'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

কয়েক বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পুত্রের স্মরণে যে কবিতা লেখেন তাতে আছে,

'বিজু যখন চলে গেল মরণপারের দেশে
বাপের বাহু বাঁধন কেটে।
মনে হল, আমার ঘরের সকাল যেন মরেছে বুক ফেটে।'

আবার অকালমৃত্যু! শুধু ভগবান জানেন তাঁর ভূমণ্ডল ব্যবস্থায়, ত্রিলোক-নিয়ন্ত্রণে 'ইন হিজ স্কীম অব্ থিংস'-এর কি প্রয়োজন?[২] শমী আমাদের পুত্র নয়, কিন্তু এ কবিতাটি পড়ে কার না 'বুক ফাটে'? এ কবিতাটি আমি জীবনে মাত্র একবার পড়েছি। দ্বিতীয়বার পড়তে পারিনি।

এর পর দশ বছর কাটেনি। সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান, বড় মেয়ে মাধুরীলতার হল ক্ষয়রোগ। প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, আমিও শুনেছি, মাধুরীর স্বামীর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির সদ্ভাব ছিল না (যদিও তাঁর পিতার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল বলেই এ বিয়ে হয়। কবি বিহারী চক্রবর্তী ছিলেন কাদম্বরী দেবীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কবি)। রবীন্দ্রনাথ দুপুরবেলা মেয়েকে দেখতে যেতেন বন্ধ গাড়িতে করে। জামাই তখন আদালতে। সমস্ত দুপুর মেয়েকে গল্প শোনাতেন। হয়তো বা কবিতা পড়তেন। বোধ হয় তারই দু'একটি 'পলাতকা' (নামকরণ অবশ্য পরে হয়) বইয়ে স্থান পেয়েছে।

একদিন দুপুরে বাড়ির সামনে পৌঁছতেই বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। কবি কোচম্যানকে গাড়ি ঘোরাতে হুকুম দিলেন। বাড়িতে প্রবেশ করলেন না। আমি শুনেছি, এই মেয়ে নাকি বড় উৎসুক আগ্রহে পিতার লেখার জন্য প্রতীক্ষা করতেন। ভাগলপুরে, কলকাতায়।

বহু বহু বৎসর পর এঁর সখী ঔপন্যাসিকা অনুরূপা দেবী লেখেন, (উভয়ের শ্বশুরবাড়ি ভাগলপুর—বোধ হয় সেই সূত্রে পরিচয় ও সখ্য) মেয়ের স্মরণে কবির চোখ দিয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। বোধ হয় 'পলাতকা'র 'মুক্তি' কবিতায় এ মেয়ের কিছুটা বর্ণনা পাওয়া যায়।

* * *

পূর্বেই বলেছি, মাধুরীলতার রোগশয্যায় কবি তাঁকে গল্প বলতেন। এবং শেষের দিকে বোধ হয় বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছিলেন যে এ মেয়েও বাঁচবে না। তখন তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন, তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যা, এঁরা সব তাঁর মায়ার বন্ধন কেটে সময় হবার বহু পূর্বেই পালিয়ে যাচ্ছেন—এঁরা সব 'পলাতকা'। তাই মাধুরীলতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই বেরল 'পলাতকা', এ বইয়ের উপর মাধুরী, রেণুকা, শমী

---

২. রবীন্দ্রনাথও পুত্রহারা-মাতা তাঁর কন্যার দিকে তাকিয়ে শুধিয়েছেন, 'তুমি স্থির সীমাহীন নৈরাশ্যের তীরে / নির্বাক অপার নির্বাসনে। / অশ্রুহীন তোমার নয়নে/অবিরাম প্রশ্ন জাগে যেন—/ কেন, ওগো কেন!' দুর্ভাগিনী, বীথিকা, পৃঃ ৩০৯।

তিনজনের ছাপ স্পষ্ট রয়েছে। আরো হয়তো কয়েকজনের ছাপ রয়েছে, কিন্তু তাঁরা হয়তো তাঁর পরিবারের কেউ নয় তাই তাঁদের ঠিক চেনা যায় না।

'পলাতকা'র সর্বশেষের কবিতাটিতে আছে,—কবিতাটির নাম 'শেষ প্রতিষ্ঠা'—

"এই কথা সদা শুনি, "গেছে চলে, গেছে চলে"।
তবু রাখি বলে
বোলো না "সে নাই"।

*　　*　　*

আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
সে সমুদ্রে "আছে" "নাই" পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।"

এই কবিতাটি কবির সর্ব পলাতকার উদ্দেশে লেখা। কিন্তু প্রশ্ন, 'আছে' ও 'নাই' দুটোই একসঙ্গে অস্তিত্ব রাখে কি প্রকারে? কবি এর উত্তর দিলেন—অবশ্য সে উত্তরে সবাই সন্তুষ্ট হবেন কি না জানিনে—তাঁর জীবনের শেষ শোকের সময়।

'পলাতকা'র সব ক'টি পালিয়ে যাবার পর কবি রইলেন, পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও কন্যা মীরা। এই মীরাদি'র একটি পুত্র ও কন্যা। এ নাতিটিকে রবীন্দ্রনাথ যে কী রকম গভীর ভালোবাসা দিয়ে ডুবিয়ে রেখেছিলেন সে কথা ঐ সময়ের আশ্রমবাসী সবাই জানে। একটু ব্যক্তিগত কথা বলি—নীতু যদিও আমার চেয়ে বছর নয়েকের ছোট ছিল তবু হস্টেলে সে প্রায়ই আমার ঘরে আসতো। ভারী প্রিয়দর্শন ছিল সে। মাঝে মাঝে ফিনফিনে ধুতি-কুর্তা পরে এলে মানাতো চমৎকার—আমরা শুধাতুম, কে সাজিয়ে দিল রে?

সে উত্তর না দিয়ে শুধু মিট্ মিট্ করে হাসতো। চট্টগ্রামের জীতেন হোড় বলতো, 'নিশ্চয়ই দাদামশাই।' আমি বলতুম, 'মা'। 'আশা করি, এ লেখাটি মীরাদি বা তাঁর মেয়ে 'বুড়ির' চোখে পড়বে না—তাঁদের শোক জাগাতে আমার কতখানি অনিচ্ছা সে কথা অন্তর্যামী জানেন।) সেই নীতু গেল ইয়োরোপে। ক্ষয়রোগে মারা গেল ১৯/২০ বছর বয়সে। এই শেষ শোকের বর্ণনা দিতে কারোরই ইচ্ছা হবে না। কবির বয়েস তখন ৭১। একে নিজের শোক, তার উপর কন্যা—পুত্রহারা মাতার শোক।

শুধু একটি সামান্য ঘটনার উল্লেখ করি—শ্রীযুক্ত নির্মলকুমারী মহলানবিশের 'বাইশে শ্রাবণ' থেকে নেওয়া।

রবীন্দ্রনাথ তখন থাকতেন বরানগরে মহলানবিশদের সঙ্গে। বন্ধু এন্ডরুজ সায়েবের কাছ থেকে চিঠি পেলেন, নীতুর শরীর আগের চেয়ে একটু ভালো।

পরদিন সকালবেলা খবরের কাগজে রয়টারের টেলিগ্রামে দেখলাম, 'ছ'দিন (দু'দিন?) আগে ৭ই আগস্ট জার্মানীতে নীতুর মৃত্যু হয়েছে।'

এ খবরটা রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাঙা যায় কি প্রকারে?

'শেষে স্থির হল খড়দায় রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে টেলিফোন করে আনিয়ে আমরা চারজনে একসঙ্গে কবির কাছে গেলে কথাটা বলা হবে। প্রতিমাদিরা এলে সবাই মিলে কবির ঘরে গিয়ে বসা হল। রথীন্দ্রনাথকে কবি প্রশ্ন করলেন, "নীতুর খবর পেয়েছিস, সে এখন ভাল আছে না?" রথীবাবু বললেন, "না, খবর ভালো না।" কবি প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। বললেন, "ভালো না? কাল এন্ডরুজও আমাকে লিখেছেন যে, নীতু অনেকটা ভাল আছে। হয়তো কিছু দিন পরেই ওকে দেশে নিয়ে আসতে পারা যাবে।" রথীবাবু এবারে চেষ্টা করে গলা চড়িয়ে বললেন, "না, খবর ভাল নয়।'[৩] আজকের কাগজে বেরিয়েছে।" কবি শুনেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে রথীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। একটু পরেই শান্তভাবে সহজ গলায় বললেন, "বৌমা আজই শান্তিনিকেতনে চলে যান, সেখানে বুড়ি একা রয়েছে। আমি আজ না গিয়ে কাল যাবো, তুই আমার সঙ্গে যাস।"

নীতুর মা জর্মনি গিয়েছিলেন পুত্রের অসুস্থতার খবর পেয়ে। তিনি যেদিন বোম্বাই পৌঁছবেন, তার কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বোম্বাইয়ের ঠিকানায় চিঠি লেখেন। তাতে সেই 'আছে' ও 'নাই'-য়ের উত্তর আছে। তাতে এক জায়গায় তিনি লেখেন, 'যে রাত্রে শমী গিয়েছিল,[৪] সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও পিছনে যেন না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা শুনলুম, তখন অনেকদিন ধরে বার বার করে বলেছি, আর তো আমার কোনো কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি, সেখানে তার কল্যাণ হোক্। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালোবাসা হয়তো বা পৌঁছয়—নইলে ভালোবাসা এখনও টিঁকে থাকে কেন?

এই সেই মূল কথা। সে নেই কিন্তু আমার ভালোবাসার মধ্যে সে 'আছে'। বার বার নমস্কার করি গুরুকে, গুরুদেবকে। বার বার দূর দৃষ্টের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে

---

৩. এর আগের দিন রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্তা মহলানবিশকেও বলেন, 'কাল এণ্ডরুজের চিঠি পেয়ে অবধি নীতুর জন্য মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, যদিও তিনি লিখেছেন, ও এখন একটু ভালোর দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। সাহেব লিখেছেন, নিতুকে হয়তো শীগ্‌গিরই দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। তা হলে ভাবছি তাকে একটা কোনো ভালো জায়গায় অনেকদিন ধরে রেখে দেবো। ভাওয়ালি কি কোনো পাহাড়ে বেশ কিছুদিন থাকলেই সেরে উঠবে।' পৃঃ ২৮

৪. এর মৃত্যুর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এবং আরো বলছি মাতা ও পুত্র যান একই দিনে, এবং আশ্চর্য, দাদামশাই ও নাতী যান একই দিনে। (২২ শ্রাবণ)

তিনি কাতর হয়েছেন, কিন্তু কখনো পরাজয় স্বীকার করেননি।

এবং 'উল্টোরথে'র পাঠক-পাঠিকাদের উপদেশ দি, প্রিয়বিয়োগ—এমন কি প্রিয়বিচ্ছেদ—হলে তাঁরা যেন উপরে বর্ণিত এই চিঠিখানা পড়েন। এ চিঠি মুক্তপুরুষের লেখা চিঠি নয়। কারণ গীতায় আছে মুক্তপুরুষ 'দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন'। রবীন্দ্রনাথ দুঃখে আমাদের মতই কাতর হতেন—হয়তো বা আরো বেশী; কারণ তাঁর দিলের দরদ, হৃদয়ের স্পর্শকাতরতা ছিল আমাদের চেয়ে লক্ষগুণ বেশী—কিন্তু তিনি পরাজয় মানতেন না। আমরা পরাজয় মেনে নিই। এ-চিঠি যদি একজনকেও পরাজয় স্বীকৃতি থেকে নিষ্কৃতি দেয় তবে অন্যলোকে রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হবেন।

সহৃদয় পাঠক, তুমি সিনেমা দেখতে যাও। সেখানে যদি কোনো ছবিতে তোমার হীরোর জীবনে পর পর এতগুলো শোকাবহ ঘটনা ঘটতো তবে তুমি বলতে, 'এ যে বড্ড বাড়াবাড়ি। এ যে অত্যন্ত অবাস্তব, আন্‌রিয়ালিস্টিক।'

তাই বটে, যা জীবনে বাস্তব তা হয়ে যায় সিনেমায় অবাস্তব! আশ্চর্য, আমার কাছে আবার সিনেমাটা অত্যন্ত অবাস্তব ঠেকে।

তাই সিনেমাওলাদের কাছেই রবীন্দ্র জীবনের সব চেয়ে নিষ্ঠুর অধ্যায় তুলে ধরলুম। নইলে 'রবীন্দ্রনাথের শোক ও কাব্যে তার প্রতিচ্ছবি' এ জাতীয় ডক্টরেট থিসিস লেখবার বয়েস আমার গেছে। আর তাই এ 'রম্যরচনা'টি আরম্ভ করেছি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। কারণ আমার জীবন আর তোমাদের পাঁচজনের জীবনে লেশমাত্র পার্থক্য নেই। তফাৎ যদি থাকে, তবে শুধু এইটুকু যে তোমরা মনোবেদনা গুছিয়ে বলতে পার না ব'লে গুমরে গুমরে মরো বেশী। কিন্তু তোমাদের এই বলে সান্ত্বনা জানাই, যতদিন তোমার প্রিয়জন তোমার প্রতি সহৃদয় ততদিন তোমার না বলা সত্ত্বেও সে তোমার হৃদয়ের সব কথাই বোঝে। আর যেদিন তার হৃদয় বিমুখ হয়ে যায়, সেদিন যতই গুছিয়ে বলো না কেন, সে শুনবে না। কাজেই না-বলতে-পারাটা তোমাকে গুছিয়ে বলতে-পারার বিড়ম্বনা থেকে অন্তত বাঁচাবে।।

— শেষ —

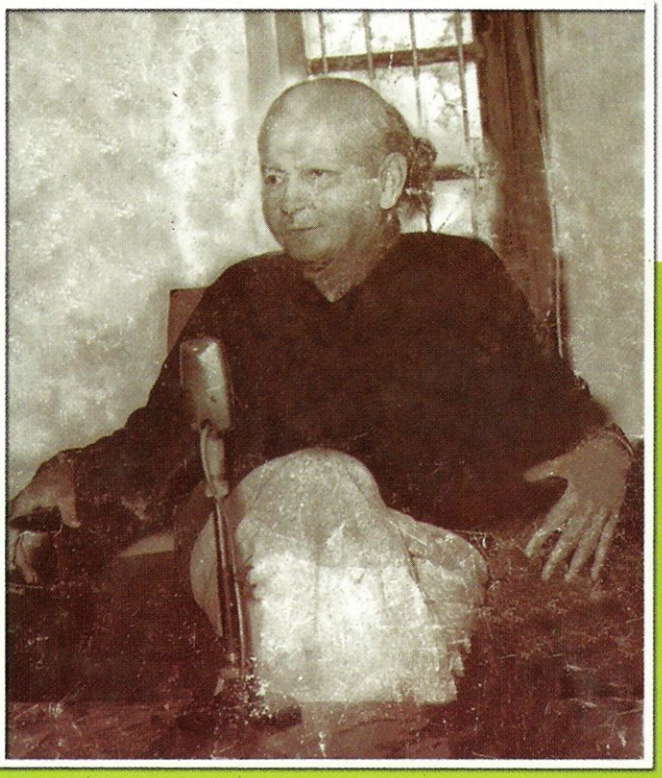

“

যতদিন তোমার প্রিয়জন তোমার প্রতি সহৃদয়
ততদিন তোমার না বলা সত্ত্বেও
সে তোমার হৃদয়ের সব কথাই বোঝে।
আর যেদিন তার হৃদয় বিমুখ হয়ে যায়,
সেদিন যতই গুছিয়ে বলো না কেন,
সে শুনবে না।

”